কলিকাতা ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাঠ্যতালিকাভুক্ত

চরিত্র-সংগ্রহ

বাঙ্গালা জীবন-চরিত ও আত্ম-চরিত হইতে সংকলিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

এম্‌ এ, পি-আর্‌-এস্‌ (কলিকাতা), ডি-লিট্‌ (লণ্ডন), এফ্‌-আর্‌-এ-এস-বি

কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

নিবেদন

মিত্রঘোষ সঙ্ঘের অন্যতম স্বত্বাধিকারী প্রিয়বর শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সনির্বন্ধ আগ্রহ ও যত্নে "চরিত্র-সংগ্রহ" সংকলিত ও টিপ্পনী-যুক্ত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। যাহাতে কতকগুলি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির চরিত্র আমাদের বিদ্যালয়-সমূহের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের সমক্ষে ধরিয়া দিতে পারা যায়, এবং সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলি চরিত্র-চিত্রণাত্মক রচনা বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ হিসাবেও ছাত্রদের পড়ানো যায়, এই উভয় উদ্দেশ্য লইয়া "চরিত্র-সংগ্রহ" গ্রন্থখানির সংকলন করিয়াছি।

একদিকে আদর্শ জীবন বা কৃতী জীবনের সহিত পরিচয়, অন্যদিকে ভাষা-শিক্ষা—এক সঙ্গে 'রথ দেখা ও কলা বেচা'—'এক পন্থ, দৈ কাজ' —কতদূর সম্ভব হইয়াছে, জানি না। তবে এই পুস্তকের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে, বাঙ্গালা ভাষায় রচিত আধুনিক যুগের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ জীবন-কথা এবং আত্মচরিত গ্রন্থ হইতে ছাত্রদের উপযোগী পাঠ সঞ্চয়ন করা হইয়াছে। দুইখানি লক্ষণীয় জীবন-চরিত লইয়া আধুনিক বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের আরম্ভ; খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে রচিত রামরাম বসুর "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" ও রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের "মহারাজকৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্রম্" হইতে আরম্ভ করিয়া, বিংশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত, বাঙ্গালা গদ্যের স্বল্প একটু দিগ্‌দর্শন-ও এই পুস্তক পাঠে হইতে পারিবে।

যে-সকল কৃতী অথবা পুণ্য-চরিত ব্যক্তির চরিত্র-কথা ইহাতে সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই বঙ্গ-জননীর সন্তান; প্রস্তুত পুস্তকের জন্য বাঙ্গালা দেশের বাহিরের মহাপুরুষগণের জীবনীর

আশ্রয় লওয়া হয় নাই। চয়ন করিবার কালে বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্যের এবং চিত্তাকর্ষকতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছি।

এই বাঙ্গালা-গদ্য-সংগ্রহ পুস্তকে বিভিন্ন পাঠের অন্তে যে টীকা দেওয়া হইয়াছে, ছাত্রদিগকে কেবল আলোচ্য বিষয়-বস্তু বুঝাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে সেগুলি দেওয়া হয় নাই,—তাহাদের সাধারণ জ্ঞান ও সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি বাড়াইয়া দিবার চেষ্টায়-ও দেওয়া হইয়াছে; ভাষা ও ব্যাকরণ, ইতিহাস ও সামাজিক কথা প্রভৃতি নানা বিষয় লইয়া টিপ্পনীগুলি রচিত হইয়াছে। বাঙ্গালী ছাত্রদের মানসিক উৎকর্ষ এবং মাতৃভাষার জ্ঞান বর্ধনে, তাহাদের গ্রহণ-শক্তি ও প্রকাশ-শক্তির পরিপোষণে, যদি এই ক্ষুদ্র সংকলনটি যৎসামান্য সহায়তা করে তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

পরিশেষে, যে সকল গ্রন্থকার ও গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী আমাদিগকে এই পুস্তকে রচনা-বিশেষ উদ্ধৃত করিতে অনুমতি দিয়া, এই পুস্তক-প্রণয়ন ও ইহার প্রকাশ সম্ভবপর করিয়াছেন, তাঁহাদের সৌজন্যপূর্ণ অনুগ্রহের জন্য আমি নিজের ও আমার প্রকাশকের তরফ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭॥

"সুধর্মা"
১৬, হিন্দুস্থান পার্ক,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

চরিত্র-সংগ্রহ

রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র

[রামরাম বসু]

রামরাম বসুর "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" খ্রীষ্টীয় ১৮০১ সালে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পাদ্রি উইলিয়াম কেরি ১৮০১ সালে কলিকাতায় ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজে বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যক্ষ, এবং কেরির অধীনে রামরাম বসু বাঙ্গালা অধ্যাপনার জন্য সরকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হন। ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল যে, যে-সকল ইংরেজ কর্মচারী ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে এদেশে শাসন করিবার জন্য আসিবেন, ঐ কলেজে তাঁহাদিগকে এ-দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব থাকায় কলেজের কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করিয়া উপযোগী বাঙ্গালা পুস্তক রচনায় পণ্ডিতদিগকে উৎসাহিত করেন। উইলিয়াম কেরি রামরাম বসুকে দিয়া "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" লেখান। জীবন-চরিত্র-বিষয়ক এই বইখানি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক গদ্য বই, এবং ইহা প্রথম বাঙ্গালা মুদ্রিত গদ্য-গ্রন্থ। এখন হইতে কিছু কম ১৫০ বৎসর পূর্বে ইহা লিখিত হয়; তখন বাঙ্গালা ভাষা এখনকার মত উন্নত অবস্থায় আসে নাই, গদ্যের নিদর্শন-ও বিশেষ কিছু ছিল না, সেইজন্য ইহার ভাষা আজকালকার বাঙ্গালা গদ্যের তুলনায় আড়ষ্ট ও কঠিন লাগিবে। উদ্ধৃত অংশে মূল পুস্তকের ভাষা ও বানান কিছু-কিছু পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দৈবক্রমে দেখ, একদিবস মহারাজা [বিক্রমাদিত্য] স্নান করিয়া সিংহাসনের উপর গাত্র-মোচন[১] করিতেছিলেন। একটা চিল্ল[২] পক্ষী তীরেতে বিদ্ধ হইয়া শূন্য হইতে অকস্মাৎ মহারাজার সম্মুখে

পড়িল। ইহাতে রাজা প্রথমতঃ তটস্থ হইয়া চমকিত ছিলেন। পশ্চাৎ জানিলেন—তীরে বিদ্ধ চিল্ল পক্ষী। লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ চিল্লকে কে তীর মারিয়াছে?" তাহারা তত্ত্ব করিয়া কহিল, "মহারাজ, কুমার বাহাদুর[৩] তীর মারিয়াছেন এ চিল্লকে।" তাহাকে সেই স্থানে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র, তুমি এ চিল্লকে তীর মারিলে?" স্বীকার[৬] করিলে, রাজা বসন্তরায়কেও ঐ খানে ডাকাইয়া সে চিল্ল দেখাইলেন, এবং কহিলেন, "তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র ইহা মারিয়াছেন।" ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা বসন্তরায় কুমার বাহাদুরের মুখ চুম্বন করিয়া পরম আদরে তাহাকে সম্মান করিলেন, এবং ব্যাখ্যা[৫] করিয়া মহারাজের নিকট নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! কুমার বাহাদুর সর্ব বিদ্যাতেই নিপুণ, ইহার তুল্য গুণজ্ঞ বালক আমি দেখি নাই। এ আশ্চর্য ক্ষমতাপন্ন, ইহার অনেক দৈব শক্তি, দেবতা ইহার প্রতি প্রসন্ন।" এই এই মতে অনেক প্রশংসা করিতেছিলেন।

কিঞ্চিৎ পরে মহারাজা বালককে আপন স্থানে বিদায় করিয়া দিয়া ভ্রাতা বসন্তরায়কে সঙ্গে করিয়া পূজার অট্টালিকায় নিভৃত স্থানে গতি করিলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন—"এই যে আমার বালক, ইহাকে তুমি কি জ্ঞান কর?" তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "মহারাজ, ইহার লক্ষণ দর্শনে বুঝা যায়, এ অতি উন্নত হইবে, দৈবভাগ্য ইহার অধিক, ইহা জানা যায়। এ একটা অতি বড় মানুষ হইবে।" মহারাজা কহিলেন, "সে প্রমাণ হইতে পারে; আমিও বুঝিতে পারি, তাহা ভাবিয়া আমরা ইহাকে ছোট জ্ঞান করিব না। কিন্তু এ আমার বংশে মহা অসুর অবতার হইয়াছে—ইহার কোষ্ঠীতে বলে, এ পিতৃদ্রোহী হইবে। তাহা হইলে, তুমি

কি আমাকে মারিবে? আমার জীবন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু আমার নাম ইহা হইতে লোপ পাইবে; ও তোমার সংহার-কর্তা হইবে, ইহার আর সন্দেহ করিও না। অতএব আমি বলি, এখন সাবধান হও, ইহাকে মারিয়া ফেলিলে সকলের আপদ যায়; এ কথা অল্প জ্ঞান করিবে না, এই মত কর, নতুবা ইহার কার্যের ফলে যথেষ্ট দুঃখ ঘটিবে।"

রাজা বসন্তরায় ইহা শ্রবণ করিয়া শোকেতে তাপিত হইয়া ও রোদনের দ্বারা দুই চক্ষু রক্তিম৬ করিয়া পুটাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! এ কি আজ্ঞা করেন! মহাশয়ের কুমার, তাহাতে অতিশয় বিচক্ষণ বালক, ইহার প্রাণবধ৭ করা কোন মতেই হইতে পারে না; এবং আমার বড়ই প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র, ইহার কোন দুর্ঘটনা৮ হইলে আমারও জীবন-সংশয় হইবে।" রাজা বসন্তরায়ের এইপ্রকার কাতর৯ উক্তিতে মহারাজও রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,—দুই ভ্রাতাই রোদন করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিৎ পরে মহারাজ বলিলেন, "শুন, আমি কিছু এ বালকের জন্য খিদ্যমান১০ নহি; জানিলাম, নিতান্তই এ তোমার অন্তক হইবে। তোমার অন্তক, কুলের কলঙ্ক, ইহার স্নেহেতে তুমি ডুবিলে; কিন্তু এই হইবে দুর্যোধনের মত। কালক্রমে এ সমস্তই বিদিত হইবে ইহাই ভাবিয়া আমি কাঁদি।" রাজা বসন্তরায় স্নেহ-ক্রমে মহারাজার কথায় গৌরব করিলেন না। মহারাজা অদৃষ্ট মানিয়া ধৈর্য অবলম্বন করিলেন। ইহাতে রাজা বসন্তরায় হর্ষচিত্ত হইলেন।

তৎপরে কয়েক বৎসর এই মতে গত হইয়াছে। আর এক দিবস মহারাজা, রাজা বসন্তরায়ের সহিত নিভৃতে বৈঠক করিয়া মন্ত্রণা স্থির করিলেন। কহিলেন, "আমি যাহা কহি তাহা শুন, এবং মনে

অবহেলা করিও না। তোমার প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র এখন প্রায় যুবা হইল। দেখিতে পাই, তোমার সহিত বিষয়-কার্য সম্পর্কে কথাবার্তা হয়। এখন কি হইবে? যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। উহাকে আর প্রাণে বধ করিতে পার না, এবং উচিত-ও নহে। কিন্তু এখানে থাকিলে অতি ত্বরায় অঘটন ঘটিবে[১১]। অতএব কহি শুন। দিল্লিতে আমাদের সদর-তাহুত উকিলে[১২] কার্য ভাল করিয়া করে না। কুমার বাহাদুর ক্ষমতাপন্ন, রাজকার্যে তৎপর, এবং বিষয়েতে তাহার খুবই অভিনিবেশ; অতএব ইহাকে দরবার-করণের ছলে দিল্লিতে পাঠাও। তাহা হইলে দূরে থাকিবে। ইহাতে যদি কিছু কাল তোমার হিংসা না করে; নতবা তোমার শেষ দশার অতি সান্নিধ্য জানিও।”

রাজা বসন্তরায় ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার বাহাদুরের বিচ্ছেদ অন্তঃকরণবর্তী করিয়া কাতর হইলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজের আজ্ঞা স্বীকার-ও করিলেন। দুই ভ্রাতা একত্রায় কুমার বাহাদুরকে আনাইলেন। মহারাজা আজ্ঞা করিলেন, “শুন, আমাদের সদর-তাহুত উকিলেরা কাজ করিতেছে; কিন্তু আমার চিত্ত সর্বদা অস্বস্তি-যুক্ত[১৩] থাকে, চিত্তের উদ্বেগ মিটে না। এখন আমাদের খরচ-পত্র স্বচ্ছন্দ-মত নহে, উকিলেরা খরচপত্রের বাহুল্য করে। আমাদের একজন কেহ হিন্দুস্থানে[১৪] থাকিলে সাহস[১৫]-ও হয় এবং খরচ-পত্রের এতটা বাহুল্য-ও হয় না; অতএব সেখানে একজন কাহার-ও যাওয়া আবশ্যক। সেইজন্য, ছোট ভ্রাতা বিদেশে গেলে এখানকার কার্য তোমাকে দিয়া নির্বাহিত হয় না, অত দূরে তাঁহার বিদেশ-যাত্রা কোন ক্রমে সম্ভবে না। তুমি এখানে থাকিলে ভাল; কিন্তু তুমি না থাকিলে রাজকার্যের আটক-ও হয় না। শুনা যাইতেছে, সেখানে আমাদের

অনেক শত্রুপক্ষের লোক বিপক্ষতা করিতে উদ্যত। এ সময়ে আমরা কেহ তথায় না থাকিলে, উপদ্রব হইবার বাধা হইবে না, এবং সেখানেও একজন ক্ষমতাপন্ন লোক চাই। আর কাহাকেও দিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। অতএব তুমি শুভক্ষণে দিল্লিতে যাত্রা কর, আর ব্যাজ করা অনুচিত।"

রাজা প্রতাপাদিত্য আপনি বড় সাহসী লোক। পিতৃ-আজ্ঞা স্বীকার করিলেন, কিন্তু মনে মনে ধারণা করিলেন, রাজা বসন্তরায় চাতুরী[১৬] করিয়া তাঁহাকে বিদেশে পাঠাইলেন। ইহাতে তিনি প্রকাশ্যে কিছু করিলেন এমন নহে, কিন্তু সর্পবৎ হইয়া থাকিলেন[১৭]॥

বিক্রমাদিত্য রায় ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্ত রায় বাঙ্গালা দেশের শেষ পাঠান বাদশাহ দাউদের অধীনে কর্মচারী ছিলেন। মোগল সম্রাট্ আকবরের সেনাপতি তোড়ল মল্লের নিকট দাউদের পতন ঘটিলে ও বাঙ্গালা দেশ মোগল-অধীনে আসিলে বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার ভ্রাতা দক্ষিণ-বঙ্গে যশোহর-নগর স্থাপন করিয়া দিল্লির সম্রাটের অধীনে জমীদারী করিতে থাকেন। বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিখ্যাত প্রতাপাদিত্য রায়। প্রতাপাদিত্য এখন বাঙ্গালা দেশের অন্যতম স্বাধীনতা-কামী বীর-পুরুষ রূপে সম্মানিত। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের 'মানসিংহ' খণ্ডে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে অষ্টাদশ শতকের মধ্য ভাগে প্রচলিত কতকগুলি কাহিনী কাব্যাকারে প্রচারিত হয়। তাহার পর রামরাম বসুর "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" পুস্তকে ইঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত কিংবদন্তীর সংগ্রহ করা হয়। এই গ্রন্থে রামরাম বসু নিজের কল্পনা-ও প্রয়োগ করিয়াছেন—এবং তিনি কতটুকু লোক-প্রচলিত প্রবাদের আধারে লিখিয়াছেন ও কতটুকু নিজের কল্পনা চালাইয়াছেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। (সম্প্রতি "বহারিস্তান্ অল্-ঘয়্বী" নামক সমসাময়িক ফারসী গ্রন্থ হইতে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক তথ্য জানা গিয়াছে; এই বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ ম. ই. বরা কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।)

রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে লিখিত আছে যে প্রতাপের জন্মের পরে

জ্যোতিষীরা তাঁহার জন্মপত্রীতে স্থির করিলেন যে, 'তিনি সর্ব বিষয়েতেই উত্তম, কিন্তু পিতৃদ্রোহী' হইবেন। বিক্রমাদিত্য এই উক্তিতে আস্থাবান্ ছিলেন এবং তদনুসারে নিজ পুত্র হওয়া সত্ত্বেও প্রতাপকে বধ করিতে ইচ্ছুক হন। উদ্ধৃত অংশে এই সমস্ত কথা আছে।

১ গাত্র-মোচন—'গা-মোছন' বা 'গা-মোছা' এই বাঙ্গালা শব্দের সংস্কৃত 'শুষ্কীকরণ'। 'মোছন' বাঙ্গালা 'মুছ্' ধাতু হইতে গঠিত শব্দ, ভুল করিয়া ইহাকে 'মোচন' এই সংস্কৃত রূপ দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গলা 'মুছ্' ধাতুর মূল অজ্ঞাত, ইহা সংস্কৃত 'প্রোঞ্ছ্' ('প্র'+উঞ্ছ্') ধাতু হইতে জাত 'পোঁছ' বা 'পুঁছ্' ধাতুর বিকার-জাত হইতে পারে। 'গাত্র-মোচন' এই শব্দ 'পরিষ্কার করা বা জল শুখানো' অর্থে সাধু বা চলিত বাঙ্গালায় অব্যবহার্য।

২ চিল্ল পক্ষী—চিল। পুরাতন বাঙ্গালা গদ্যে প্রায় প্রত্যেক চলতি বাঙ্গালা শব্দের এইপ্রকার একটা শুদ্ধ সংস্কৃত রূপ দিবার চেষ্টা হইত।

৩ বাহাদুর—ফারসী হইতে গৃহীত শব্দ, অর্থ 'সাহসী'; সম্মান-সূচক পদবীতে ব্যবহৃত হয়। মূলে শব্দটী সংস্কৃত 'ভগধর' (অর্থাৎ ভাগ্যবান্) শব্দ হইতে জাত; 'ভগধর' শব্দ মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী তুর্কীদের দ্বারা গৃহীত হইয়া 'বগদুর্' রূপ ধারণ করে, পরে তুর্কীরা পারস্য জয় করিয়া সে-দেশে রাজা হইয়া বসিলে, এই শব্দ ফারসী ভাষায় 'বাহাদুর' রূপে গৃহীত হয়; ইহা ভারতবর্ষে আসিয়া বাঙ্গালায় 'বাহাদুর' হইয়া গিয়াছে।

৪ খাঁকার—মূলে আছে 'খৈকার'। তুলনীয়, চলিত বাঙ্গালার ভুল প্রয়োগ 'নিরাকার' স্থলে 'নৈরাকার', 'নিরাশ' স্থলে 'নৈরাশ'।

৫ ব্যাখ্যা করিয়া—বিশেষ করিয়া, অলঙ্কার দিয়া, বাড়াইয়া। 'ব্যাখ্যা করা' বা 'ব্যাখ্যান করা' কিন্তু আজকাল বাঙ্গালা দেশের কোনও কোনও অঞ্চলে 'নিন্দা করা' অর্থে প্রযুক্ত হয়।

৬ রোদনের দ্বারা দুই চক্ষু রক্তিম করিয়া—মূলে আছে 'দুই চক্ষু আরক্তিমাতে রুজ্যমান হইয়া।'

৭ ইহার প্রাণবধ করা—মূলে আছে, 'ইহাকে নষ্ট করা'।

৮ দুর্ঘটনা—মূলে আছে 'বিঘটিত'

৯ কাতর—মূলে 'কাতর্য্যতা'।

১০ খিদ্যমান—মূলে 'ক্ষিদ্যমান'। বাঙ্গালায় সংস্কৃত 'ক্ষ' (অর্থাৎ 'ক্‌ষ')-র উচ্চারণ 'খ্য' বলিয়া এই ভুল হইয়াছিল। এখানে পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনে প্রমাদ।

১১ অঘটন ঘটিবে—মূলে অন্যরূপ আছে। ('অতি ত্বরায় প্রত্যক্ষ হয়'।)

১২ সদর-তাহুত উকিল—ফারসী হইতে গৃহীত (মূলে আরবী) বাক্যাংশ—বশ্যতা বা আনুগত্য (তাহুত—তাওৎ—আরবী ত্বা'অৎ) জানাইবার জন্য সদরে (—আরবী স্বদর) বা রাজধানীতে বিদ্যমান প্রতিনিধি (আরবী বকীল—প্রতিনিধি)। পূর্বে মোগল আমলে বাদশাহের অধীনে ছোট-বড় রাজা-জমীদার রাজধানীতে নবাব বা বাদশাহের দরবারে নিজ নিজ উকীল বা প্রতিনিধি রাখিতেন।

১৩ অস্বস্তি-যুক্ত—মূলে 'ওসোয়মান'; সংস্কৃত 'অবিশ্বাসবান্' শব্দের পশ্চিমা বিকার হইতে এই শব্দ আসিয়া থাকিতে পারে।

১৪। হিন্দুস্থান—মূলে 'হেন্দোস্থান' (—ফারসী হেন্দোস্তান বা হিন্দুস্তান)—উত্তর ভারতবর্ষ, রাজধানী দিল্লি-আগরার আশ-পাশের দেশ।

১৫ সাহস—মূলে আরবী শব্দ 'হেম্মত'।

১৬ চাতুরী—মূলে 'চাতুর্য্য'।

১৭ সর্পবৎ হইয়া থাকিলেন—ভবিষ্যতে সময় পাইয়া দংশন করে, বিপদ দেখিলে মাথা নত করিয়া লুক্কায়িত থাকে, সর্পের মত এইরূপ আচরণ করিতে মনস্থ করিলেন।

ভবানন্দ মজুমদারের জমিদারী-প্রাপ্তি

[রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়]

রামরাম বসুর ন্যায় রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ও কলিকাতার ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের একজন পণ্ডিত ছিলেন। রামরাম বসু প্রতাপাদিত্যের বংশের ব্যক্তি ছিলেন, তেমনি রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়-ও নদীয়া-কৃষ্ণনগরের রাজবংশের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত "মহারাজকৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্রম্" নামে বাঙ্গালা জীবনী-গ্রন্থ ১৮০৫ সালে পাদরি উইলিয়াম কেরির উৎসাহে মুদ্রিত হয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালার ইতিহাসে এবং তখনকার বাঙ্গালা সাহিত্যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। "অন্নদামঙ্গল" কাব্যের রচয়িতা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ইঁহার সভাকবি ছিলেন। নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ রায় মজুমদার আকবর ও জাহাঙ্গীর বাদশাহ-দ্বয়ের সমসাময়িক ছিলেন। বিদ্রোহিদমনে মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহকে সহায়তা করিয়া ইনি বাদশাহের অনুগ্রহ লাভ করেন ও নবদ্বীপ জেলার বাগোয়ান পরগণা বাদশাহের নিকট হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হন। উদ্ধৃত অংশে সেই বিষয়ের অবতারণা আছে; ইহার ভাষার প্রাচীনত্ব দুই এক স্থলে পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চাৎ রাজা মানসিংহ বর্ধমান হইতে গমন করিয়া বিবেচনা করিলেন যে, ভবানন্দ রায় মজুমদারের[১] বাটী দেখিয়া যাইব। রায় মজুমদারকে কহিলেন, "আমি তোমার বাটী হইয়া যাইব।" রায় মজুমদার "যে আজ্ঞা" বলিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন; রাজা মানসিংহ বাগুয়ান পরগণায়[২] উপস্থিত হইয়া ভবানন্দ রায়ের বাটীতে উপনীত হইলেন। রায় মজুমদার নানা জাতীয় ভেটের[৩] সামগ্রী রাজার গোচরে আনিলেন। রায় মজুমদারের আহ্লাদ এবং সামগ্রীর

আয়োজন দেখিয়া রাজা মানসিংহ অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে অতিশয় ঝড়বৃষ্টি উপস্থিত হইল। রাজা মানসিংহের সঙ্গে নব লক্ষ[৪] সৈন্য, খাদ্যসামগ্রীর কারণ মহা ব্যস্ত হইল। রায় মজুমদার যাবতীয় সৈন্যের আহার পরগণা হইতে এবং নিজালয় হইতে দিলেন। এই প্রকার সপ্তাহ ধরিয়া হাতী ঘোটক পদাতিক প্রভৃতি সকলেই কোন ব্যামোহ[৫] পাইল না। ইহাতে রাজা মানসিংহ ভবানন্দ রায়ের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "যদি ঈশ্বর আমাকে জয়ী করিয়া আনেন, তবে তোমার উপকারের প্রত্যুপকার করিব।" পশ্চাৎ যশোহর গমন করিয়া, রাজা প্রতাপাদিত্যকে শাসিত করিয়া, কিছুকাল গৌণে[৬] ঢাকায় প্রস্থান করিলেন।

ভবানন্দ রায় মজুমদার, রাজা মানসিংহের সহিত ঢাকায় গমন করিলেন। একদিন রাজা মানসিংহ তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি আমাকে অনেক অনেক সাহায্য করিয়াছ, অতএব তোমার কোন বাসনা থাকে আমাকে কহ, আমি তাহা পূর্ণ করিব।" ইহা শুনিয়া রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন, "যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তবে বাগুয়ান পরগণা আমার জমিদারী আজ্ঞা হয়।" রাজা মানসিংহ স্বীকার করিয়া কহিলেন, "ঢাকায় উপস্থিত হইয়া অগ্রে তোমার বাসনা পূর্ণ করিব।" ভবানন্দ রায় মজুমদারের অন্তঃকরণে যথেষ্ট আহ্লাদ হইল, তিনি বিবেচনা করিলেন, বুঝি কুল-লক্ষ্মীর কৃপা হয়।

এক দিবস রাজা মানসিংহের সহিত ভবানন্দ রায় জাহাঙ্গীর শাহ বাদশাহের নিকট গমন করিলেন[৭]। বাদশাহের নিকট রাজা গমন এবং আগমন পর্যন্ত বিস্তারিত সংবাদ নিবেদন করিলেন। বাদশাহের নিকট ভবানন্দ মজুমদারের বিস্তর বিস্তর প্রশংসা করিলে, বাদশাহ আজ্ঞা করিলেন, "তাঁহাকে আমার নিকটে আন।" রাজা মানসিংহ

অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া আহ্বান করিলেন। রায় মজুমদার বিস্তর বিস্তর নমস্কার করিয়া করপুটে সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বাদশাহ ভবানন্দ মজুমদারকে দেখিয়া তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "উপযুক্ত মনুষ্য বটে।" পশ্চাৎ রাজা মানসিংহকে নানা প্রকার রাজপ্রসাদ-সামগ্রী দিয়া আজ্ঞা করিলেন, "তোমার কোন বাসনা থাকে আমাকে কহ, আমি তাহা পূর্ণ করিব।" তখন রাজা মানসিংহ নিবেদন করিলেন, "রাজা প্রতাপাদিত্যকে শাসিত করণের মূল ভবানন্দ মজুমদার। যদি আজ্ঞা হয়, তবে মজুমদারকে রাজপ্রসাদ কিছু দিউন।" বাদশাহ হাস্য করিয়া কহিলেন, "উহার নিবেদন কি?" তখন রাজা মানসিংহ করপুটে কহিলেন, "বাঙ্গালার মধ্যে বাগুয়ান নামে এক পরগণা আছে, সেই পরগণা ইহার জমিদারী হউক।" বাদশাহ হাস্য করিয়া কহিলেন, "জমিদারীর লিপি করিয়া দেহ। আজ্ঞা পাইয়া রাজা মানসিংহ বাগুয়ান পরগণার জমিদারীর লিপি বাদশাহের স্বাক্ষর করিয়া মজুমদারকে দিয়া সম্ভ্রান্ত করিলেন। রায় মজুমদার জমিদারীর লিপি লইয়া বাদশাহের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া রাজা মানসিংহের বাটীতে গেলেন। রাজা মানসিংহ কিঞ্চিৎ গৌণে রাজ-দরবার হইতে বিদায় লইয়া বাটীতে আসিয়া দেখেন, ভবানন্দ মজুমদার বসিয়া রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কার্যে এখন এখানে আসিয়াছ?" তাহাতে মজুমদার কহিলেন, "মহারাজ, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, কিছুকালের জন্য বিদায় করুন।" ইহাতে রাজা মানসিংহ কহিলেন, "মজুমদার, নিজ বাটীতে যাইবে? মজুমদার নিবেদন করিলেন, "যেমন আজ্ঞা হয়।" রাজা মানসিংহ বহুবিধ রাজপ্রসাদ দিয়া যথেষ্ট তুষ্ট করিয়া মজুমদারকে বাটীতে বিদায় করিলেন।

ভবানন্দ মজুমদার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মনের আনন্দে শুভ লগ্নে তরণি-যোগে বাটী প্রস্থান করিলেন।

এই জীবন-চরিত, জন-শ্রুতি অবলম্বনে ও অংশতঃ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের "অন্নদামঙ্গল" কাব্য অনুসরণে এবং লেখকের স্বকপোল-কল্পনা অনুসারে রচিত—ইহার ঐতিহাসিকতা বিশেষ কিছুই নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যের নিদর্শন হিসাবেই রামরাম বসুর বইয়ের এবং এই বইয়ের মূল্য।

১ মজুমদার—আরবী 'মজ-মূ'অ (=সংগ্রহ, সংগ্রহ-পুস্তক) + ফারসী 'দার' (=ধারক)—হিসাবের কাগজ-পত্র যে রাখে, record-keeper, মোগল আমলে বিশেষ রাজকর্মচারীর পদবী। 'রায়' শব্দ সংস্কৃত 'রাজা' হইতে—সম্ভ্রান্ত বংশের পরিচায়ক উপাধি।

২ বাগুয়ান পরগণা—গাঙ্গিনী বা জলাঙ্গী নদীর তীরে নদীয়া জেলার মধ্যে অবস্থিত। পরগণা—সংস্কৃত 'প্রগণ' শব্দ হইতে; এদেশের মধ্য-যুগে প্রদেশের বিভাগ অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হইত। মুসলমান রাজত্ব-কালে উত্তর-ভারতের রাজভাষা ফারসী ছিল, ফারসীতে এই শব্দ 'পরগনহ্' বা 'পরগনা' রূপ ধারণ করে। তাহা হইতে বাঙ্গালা 'পরগণা'।

৩ ভেট—মিলন, দর্শন; রাজা বা সম্মাননীয় ব্যক্তির দর্শন উপলক্ষে প্রদত্ত উপহার। দ্বিতীয় অর্থে শব্দটী বাঙ্গালায় এখনও প্রচলিত আছে।

৪ নব লক্ষ—'বহু-সংখ্যক' অর্থে 'নব লক্ষ, নৌ লাখ' উত্তর-ভারতের সর্বত্র প্রচলিত। তুলনীয়, হিন্দী 'নৌলাখিয়া হার'=নয় লাখ টাকা দামের হার।

৫ ব্যামোহ=মোহ, চিত্তবিভ্রম; কষ্ট। এই শব্দের বিকৃত রূপ 'ব্যামো' কলিকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষায় 'রোগ' অর্থে এখনও প্রযুক্ত হয়।

৬ গৌণে—বিলম্বে। শব্দটী প্রায় অপ্রচলিত। ইহার বিকৃত রূপ 'গোঁওনে, গোম্নে' কলিকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষায় এখনও শুনা যায়।

৭ জাহাঙ্গীর বাদশাহ তখন ঢাকায় ছিলেন না, তিনি আগরাতেই ছিলেন। "অন্নদামঙ্গল"-মতে, ভবানন্দ মজুমদার রাজা মানসিংহের অনুচর-রূপে আগরায় গিয়া জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

৮ সম্ভ্রান্ত—সম্—ভ্রম্ ধাতু+ত প্রত্যয়। মৌলিক অর্থ—বিশেষ রূপে ভ্রমণ করিয়াছে যে। বিভিন্ন অর্থে এই শব্দ প্রযুক্ত হয়; ১। ভীত বা সন্ত্রস্ত; ২। ত্বরান্বিত, ব্যস্ত; ৩। মান্য, মর্যাদা-সম্পন্ন, সম্মানিত (এখানে এই অর্থে); ৪। কুলীন, উচ্চ-বংশ-জাত; ৫। আদরণীয়। আধুনিক বাঙ্গালায় বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হয়—'উচ্চবংশজাত' এই অর্থে।

কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত

[ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত]

বাঙ্গালা ভাষার বিখ্যাত কবি ও সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১১-১৮৫৯) কর্তৃক রচিত এই জীবন-চরিতখানি বাঙ্গালা ১২৬২ সালের আষাঢ় মাসে (=ইংরেজী ১৮৫৫ সালের জুন মাসে) প্রকাশিত হয়। এই বইখানিতে বাঙ্গালা ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ কবির জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিবার প্রথম সার্থক প্রয়াস দৃষ্ট হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নানা স্থানে ঘুরিয়া কবির সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই বই লেখেন। এ বিষয়ে তিনি বাঙ্গালীদের মধ্যে 'প্রথম পথ-প্রদর্শক' হইয়াছিলেন। এই পুস্তক-মধ্যে ভারতচন্দ্রের রচিত বহু ক্ষুদ্র কবিতার সংগ্রহও আছে, এবং ভারতচন্দ্রের কবিতার কোন কোন অংশের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার কবিত্বশক্তির বিচারের চেষ্টাও আছে। নিম্নে প্রদত্ত অংশে বানান ও স্থানে স্থানে শব্দ আধুনিক বাঙ্গালার উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে।

৺নরেন্দ্রনারায়ণ রায়[১] মহাশয় জেলা বর্ধমানের অন্তঃপাতী ভুরশুট[২] পরগণার মধ্যস্থিত পেঁড়ো[৩] নামক স্থানে বাস করিতেন। তিনি অতি সুবিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী ছিলেন, সর্ব-সাধারণে তাঁহাদিগকে সম্মান-পূর্বক রাজা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইনি ভরদ্বাজ গোত্রে[৪] মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন, বিষয়-বিভবের প্রাধান্যের জন্য

'রায়' এবং 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার বাটীর চতুর্দ্দিকে গড়-বন্দী ছিল, এ কারণ সেই স্থান 'পেঁড়োর গড়' নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চারি পুত্র—জ্যেষ্ঠ চতুর্ভুজ রায়, মধ্যম অর্জুন রায়, তৃতীয় দয়ারাম রায়, এবং সর্বকনিষ্ঠ ভারতচন্দ্র রায়। এই বিশ্ব-বিখ্যাত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর মহাশয় ১৬৩৪ শকে[৫] শুভক্ষণে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন।

এমত জনরব যে, অধিকার-ভুক্ত ভূমি-সংক্রান্ত সীমা-সম্বন্ধীয় কোন এক বিবাদ-সূত্রে, নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্তিচন্দ্র রায় বাহাদুরের জননী শ্রীমতী মহারাণী বিষ্ণুকুমারীকে কটু বাক্য প্রয়োগ করেন। ঐ সময়ে মহারাজ কীর্তিচন্দ্র অতিশয় শিশু ছিলেন। তাঁহার মাতা মহারাণী সেই দুর্বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া, আলমচন্দ্র ও ক্ষেত্রচন্দ্র নামক আপনার দুইজন রাজপুত সেনাপতিকে কহিলেন, "হয় তোমরা এই ক্রোড়স্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে এখনি বিনাশ কর, নয় এই রাত্রির মধ্যেই ভুরশুট অধিকার করিয়া আমার হস্তে প্রদান কর ইহা না হইলে আমি কোন মতেই জল-গ্রহণ করিব না, প্রাণ পরিত্যাগ করিব।" এই আজ্ঞা শিরোধার্য করতঃ[৬] উক্ত সেনাপতিদ্বয় দশ সহস্র সৈন্য লইয়া সেই রজনীতেই ভবানীপুরের গড় এবং পেঁড়োর গড় বলদ্বারা অধিকার করিয়া লইল। পরদিবস প্রাতে রাণী বিষ্ণুকুমারী পেঁড়োর গড়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ভূপতি নরেন্দ্র রায় ও তাঁহার পুত্রগণ এবং কর্মচারী পুরুষ মাত্রে কেহই নাই, সকলেই পলায়ন করিয়াছেন, কেবল কতক-গুলি স্ত্রীলোক-মাত্র অতিশয় ভীতা ও কাতরা হইয়া 'হা! হা!' শব্দে রোদন করিতেছেন। মহারাণী সেই কুলাঙ্গনাগণকে অভয় বাক্যে

প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনা করতঃ কহিলেন, "তোমাদিগের কোন ভয় নাই, স্থির হও, স্থির হও ; কল্য একাদশী গিয়াছে, আমি উপবাস করিয়া রহিয়াছি, আমাকে শালগ্রামের[৭] চরণামৃত আনিয়া দেহ, তবে আমি জল-গ্রহণ করিতে পারি।" এই বাক্যে পূজক ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ অমনি তাঁহার সম্মুখে 'লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা'[৮] আনয়ন-পূর্বক স্নান করাইয়া চরণামৃত প্রদান করিলেন। রাণী অগ্রে তাহা গ্রহণ করিয়া, পরে জল পান করিলেন। অনন্তর শালগ্রাম এবং অন্যান্য ঠাকুরের সেবার নিমিত্ত কিয়দংশ ভূমি দান করিলেন, আর ভবানীপুরের কালীর ভোগ-রাগের[৯] জন্য প্রতিদিন এক টাকা নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু যে সকল অর্থ ও দ্রব্যাদি লইয়াছিলেন তাহার কিছুই পরিত্যাগ করিলেন না, শুদ্ধ গড়ে গৃহ, পুষ্করিণী ও উদ্যানাদি পুনঃপ্রদান-পূর্বক বর্ধমানে পুনর্গমন করিলেন।

এতদ্ঘটনায় নরেন্দ্র রায় এককালেই নিঃস্ব হইলেন, সর্বস্বই গেল; কোনরূপে কায়-ক্লেশে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কবিবর ভারতচন্দ্র পলায়ন করতঃ মণ্ডলঘাট পরগণার[১০] অধীন গাজী-পুরের সান্নিধ্যে নওয়াপাড়া নামক গ্রামে আপনার মাতুলালয়ে বাস করতঃ তাজপুর গ্রামে সংক্ষিপ্তসার[১১] ব্যাকরণ এবং অভিধান[১২] পাঠ করিতে লাগিলেন। চতুর্দশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে এই উভয় গ্রন্থে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগত হইয়া ঐ মণ্ডলঘাট পরগণার তাজপুরের সান্নিধ্যে সারদা নামক গ্রামের কেশরকুণি[১৩] আচার্যদিগের একটি কন্যাকে বিবাহ করিলেন। সেই বিবাহের পর, তাঁহার অগ্রজ সহোদরেরা অতিশয় ভর্ৎসনাপূর্বক কহিলেন, "ভারত! তুমি আমাদের সকলের কনিষ্ঠ হইয়া এমন অনিষ্টকর কার্য কেন করিলে? সংস্কৃত পড়াতে কি ফলোদয় হইবে[১৪]? তোমার এ বিদ্যার গৌরব কে করিবে?

শিষ্য নাই ও যজমান নাই যে, তাহাদিগের দ্বারা সম্মাদৃত হইবে ও প্রতিপালিত হইবে।" জগদীশ্বরেচ্ছায় এই তিরস্কার তাঁহার পক্ষে পুরস্কার অপেক্ষাও অধিক কল্যাণকর হইল। কারণ তিনি তচ্ছ্রবণে অতিশয় অভিমান-পরবশ হইয়া, জেলা হুগলীর অন্তঃপাতী বাঁশবেড়িয়ার পশ্চিমে দেবানন্দপুর-গ্রাম নিবাসী কায়স্থ-কুলোদ্ভব মান্যবর ৺রামচন্দ্র মুন্‌শী মহাশয়ের ভবনে আগমন-পূর্বক পারস্য-ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। মুন্‌শী-বাবুরা তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহ-পূর্বক বাসা দিয়া, সিধা[১৫] দিয়া, সুনিয়মে সদুপদেশ করিতে লাগিলেন। এই কালে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না, এবং রীতিমত কোন বিষয়েই বর্ণনা করেন না। সময়-বিশেষে কেবল মনে মনে তাহার আন্দোলন মাত্র করিয়া থাকেন। নচেৎ প্রতিনিয়তই শুদ্ধ বিদ্যাভ্যাসে পরিশ্রম করেন, অপর কোন ব্যাপারের আমোদে-প্রমোদে কালক্ষয় করেন না। দিবসে একবার মাত্র রন্ধন করিয়া সেই অন্ন দুইবেলা আহার করেন। প্রায় কোন দিবস ব্যঞ্জন পাক করেন না—একটা বেগুন-পোড়ার অর্ধভাগ এবেলা এবং অর্ধভাগ ওবেলা আহার করিয়া তাহাতেই তৃপ্ত হইয়া থাকেন।

উক্ত মুন্‌শী-বাবুদিগের বাটীতে একদিবস সত্যনারায়ণের[১৬] পূজার শিন্নি[১৭] এবং কথা হইবে, তাহার সমুদায় অনুষ্ঠান ও আয়োজন হইয়াছে। কর্তাটী কহিলেন, "ভারত, তোমার সংস্কৃত বোধ আছে, বাক্‌পটুতা উত্তম; অতএব তোমাকেই সত্য-নারায়ণের পুঁথি পাঠ করিতে হইবেক।" গুণাকর ইহাতে সম্মত হইলে, মুন্‌শী পুঁথি আনয়নের নিমিত্ত একজনের প্রতি আদেশ করিলেন। তচ্ছ্রবণে রায় কহিলেন, "মহাশয়! পুঁথি আনাইবার আবশ্যকতা নাই—আমার নিকটেই পুস্তক আছে,

পূজা আরম্ভ হউক, আমি বাসা হইতে পুঁথি আনিয়া এখনি পাঠ করিব।” এই বলিয়া বাসায় গিয়া, তদ্দণ্ডেই অতি সরল সাধু ভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতায় পুঁথি রচিয়া, শীঘ্রই সভাস্থ হইয়া সকলের নিকট তাহা পাঠ করিলেন। যাঁহারা সেই কবিতা শ্রবণ করিলেন তাঁহারা ভাবেতেই মোহিত হইয়া ‘সাধু সাধু’ ও ‘ধন্য ধন্য’ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। গ্রন্থের সর্বশেষে ভারতের নামের ভণিতা[১৮] এবং সবিশেষ পরিচয় বর্ণিত হওয়াতে সকলে আরও অধিক আশ্চর্য জ্ঞান করিলেন।

ভারতচন্দ্র রায় পারস্য-ভাষায় বিশেষরূপে কৃতবিদ্য হইয়া, অনুমান বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বাটী আসিয়া পিতা মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার অগ্রজগণ দেখিলেন, তিনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার ন্যায় সদ্বিদ্বান্ ও কীর্তি-কুশল হইতে পারেন নাই। অনুজের এতদ্রূপ বিদ্যা ও বিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্তে তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, “ভাই হে! সম্প্রতি পিতাঠাকুর বর্ধমানেশ্বরের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ভূমি ইজারা লইয়াছেন। জগদীশ্বরের কৃপায় এবং কর্তার আশীর্বাদে তুমি সর্বতোভাবে যোগ্য এবং কৃতী হইয়াছ; অতএব এই সময়ে তুমি আমাদিগের এই বিষয়ের ‘মোক্তার’-স্বরূপ হইয়া বর্ধমানে গমন কর, রাজাকে রাজস্ব দিতে যেন বিলম্ব না হয়, এবং রাজদ্বারে যেন কোনরূপ গোলমাল উপস্থিত না হয; তুমি উপস্থিত মতে যখন যেরূপ পত্র লিখিবে, আমরা তদনুরূপ কার্য করিব। ভাই! তাহা হইলেই আমাদিগের অন্ন-বস্ত্রের আর কোনরূপ ক্লেশ থাকিবে না।” সেই আজ্ঞানুসারে ভারতচন্দ্র বর্ধমানে গমন করতঃ কিছুদিন অবস্থান-পূর্বক কার্য পরিচালন করেন। কিন্তু এক সময়ে তাঁহার সহোদরেরা যথা-নিয়মে নির্দিষ্ট কালে কর-প্রেরণে অক্ষম হইলেন। ইহাতে

রাজ-দরবারে বিবিধ প্রকার গোলযোগ হওয়াতে, বর্দ্ধমানাধিপতি সেই ইজারাটী খাস-ভুক্ত করিয়া লইলেন, এবং ভারত তদ্বিষয়ে আপত্তি উপস্থিত করাতে দুর্ভাগ্য-বশতঃ রাজকর্মচারিগণের চক্রান্তে পড়িয়া কারারুদ্ধ হইলেন। কিন্তু কারাগারের কঠোর ক্লেশ তাঁহাকে অধিক কাল ভোগ করিতে হয় নাই। কারারক্ষকের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রণয় ছিল; অতিশয় কাতর হইয়া বিনয-বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, "ও মহাশয়! অমুক অমুক স্থানে খাজনা বাকী আছে, আপনারা লোক পাঠাইয়া আদায় করিয়া লউন, আমাকে এরূপ বদ্ধ রাখিয়া ব্রহ্মহত্যা করিলে কি ফলোদয় হইবে?" এতদ্রূপ বিনয়-বচনে প্রসন্ন হইয়া কারাধ্যক্ষ কহিলেন, "আমি এই দণ্ডেই তোমাকে গোপনে-গোপনে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারি; কিন্তু তুমি কোন্ ভাবে কোন্ স্থানে প্রস্থান করিয়া নিস্তার পাইবে, সে বিষয়ের কিছু উপায় স্থির করিয়াছ? এই রাজার অধিকার অনেক দূর পর্য্যন্ত, ইহার মধ্যে যেখানে তুমি থাকিবে সেইখানেই বিপদ ঘটিতে পারে; রাজা ও রাজকর্মচারীরা জানিতে পারিলে ভবিষ্যতে বিস্তর দুরবস্থা করিবেন।" ভারত উত্তর করিলেন, "আমাকে এই যাতনা-যুক্ত কারভুক্ত দায় হইতে মুক্ত করিলে, আমি আর ক্ষণকালের জন্য এ অধিকারের ত্রি-সীমানায় বাস করিব না। জলেশ্বর পার হইয়া মারহাট্টার অধিকারে[১৯] গিয়া নিঃশ্বাস ফেলিব।" কারা-পালক অতিশয় দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া রাত্রিকালে অতি প্রচ্ছন্ন-ভাবে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিলেন।

ভারতচন্দ্র রঘুনাথ নামক একটী নাপিত-ভৃত্য সঙ্গে লইয়া, মহারাষ্ট্রীয় অধিকারের প্রধান রাজধানী কটকে আসিয়া শিবভট্ট নামক দয়াশীল সুবেদারের[২০] আশ্রয় লইলেন, এবং আপনার সমুদয় অবস্থা নিবেদন

করিয়া শ্রীশ্রী৺পুরুষোত্তম-ধামে[২১] কিছুদিন বাস-করণের প্রার্থনা করিলেন। সুবেদার তাঁহার প্রতি প্রীতিচিত্তে অনুকূল হইয়া, কর্মচারী, মঠ-ধারী ও পাণ্ডাদিগের উপর এমত আজ্ঞা ঘোষণা করিলেন যে, "ভারতচন্দ্র রায় ও তাঁহার ভৃত্য যে-পর্যন্ত শ্রীক্ষেত্রে[২২] অধিবাস করিবেন, সে-পর্যন্ত যেন কেহ ইঁহার নিকট কোনরূপ কর গ্রহণ না করে, ইনি বিনা করে তীর্থবাসী হইবেন; যখন যে মঠে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন সেই মঠে মান-পূর্বক স্থান পাইবেন; এবং ইঁহাদিগের আহারের নিমিত্ত প্রতিদিন এক-একটী 'বলরামী আটুকে'[২৩] প্রদান করিবে, আর বিশেষ-রূপে সম্মান করিবে।"

ভারত পুরুষোত্তমে গিয়া রাজপ্রসাদে প্রসাদ-ভোগ করতঃ, শ্রীশ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্যের মঠে বাস-পূর্বক শ্রীভাগবত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের গ্রন্থ সকল পাঠ করেন, সর্বদাই বৈষ্ণবদিগের সহিত আলাপ করিয়া সুখী হয়েন। অতঃপর তিনি বেশ-পরিবর্তন করিয়া উদাসীনের ন্যায় গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন, তাঁহার ভৃত্যটীও সেই প্রকার আকার-প্রকার ও ভাব-ভঙ্গী ধারণ করিয়া চেলা সাজিল, প্রভুটী 'মুনে-গোসাঁই' হইলেন, দাসটী 'বাসুদেব'[২৪] হইল।

এক দিবস বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবন-ধাম দর্শনের প্রার্থনা করিয়া, ভারতের নিকট তদ্বিশেষ প্রকাশ করাতে, ভারত তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী হইতে অত্যন্ত ইচ্ছাকুল হইলেন। পরে সকলে একত্র হইয়া শ্রীক্ষেত্র হইতে যাত্রা করতঃ পদব্রজে জিলা হুগলীর অন্তঃপাতী খানাকুল-কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথাকার শ্রীশ্রী৺গোপীনাথজীর শ্রীমন্দিরে দর্শনার্থ গমন করিয়া দেখিলেন, কীর্তন-কারী গায়কেরা 'মনোহরশাহী'[২৫] কীর্তন করণের অনুষ্ঠান করিতেছেন। সেই দেবমন্দিরে বৈষ্ণবদিগের সহিত একত্রে প্রসাদ পাইয়া কীর্তন

শুনিতে বসিলেন। কৃষ্ণলীলারসামৃত পান-পূর্ব্বক তৎকালে গুণাকর কবিবর অতিশয় মুগ্ধ ও আর্দ্র হইয়া প্রেমাশ্রু-পাতন করিতে লাগিলেন।

১ ৺নরেন্দ্রনারায়ণ রায়='ঈশ্বর' নরেন্দ্রনারায়ণ রায়, এইরূপ পাঠ করিতে হইবে। মৃত ব্যক্তির ও দেবতা এবং দেব-বিগ্রহের নামের পূর্বে '৺' চিহ্ন দেওয়া হয়। '৺'—পরমাত্মার প্রতীক 'ওঁ' অক্ষরের সংক্ষিপ্ত রূপ। মৃত ব্যক্তি ঈশ্বরে বিলীন হইয়া যান, অথবা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেন, এই বিশ্বাসে, এবং দেবতারা ঈশ্বরেরই কল্পনাভেদ মাত্র, এই বিচারে, ঈশ্বর-বাচক 'ওঁ' বা সংক্ষেপে '৺' চিহ্ন তাঁহাদের নামের সঙ্গে যুক্ত করিবার রীতি বাঙ্গালায় বিদ্যমান।

২ ভুরশুট ও ৩ পেঁড়ো—পশ্চিম-বাঙ্গালার দুইটী প্রসিদ্ধ স্থান। ভুরশুট তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে-ও বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের স্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। উহার প্রাচীন নাম 'ভুরিশ্রেষ্ঠী'। 'পেঁড়ো' নামটী 'পাণ্ডুয়া' বা 'পাঁড়ুয়া' শব্দ হইতে উদ্ভূত; মুসলমান আমলেও এই স্থানের প্রাধান্য ছিল।

৪ ভরদ্বাজ গোত্র—এক এক ঋষির বংশকে 'গোত্র' বলে। 'গোত্র' শব্দের মূল অর্থ, 'গোহাল'; তাহা হইতে 'বাটী' বা 'আবাস-গৃহ', পরে 'পরিবার, বংশ'। ভরদ্বাজ ঋষি হইতে জাত ব্রাহ্মণ-বংশ ভরদ্বাজ-গোত্র।

৫ ১৬৩৪ শক=১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ। ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই বর্ষ-গণনা আরম্ভ হয়, সম্ভবতঃ প্রাচীন ভারতবর্ষের বিদেশাগত শক-জাতীয় কুষাণ-বংশীয় কোনও রাজার সময় হইতে। শকাব্দ এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা দেশে সেদিন পর্যন্ত শকাব্দ হিন্দুদের মধ্যে সমস্ত কার্যে ব্যবহৃত হইত; বিগত উনবিংশ শতকের মধ্য-ভাগ পর্যন্ত বহু পুস্তকে কেবল শকাব্দ-ই দেওয়া হইয়াছে। এখন বাঙ্গালা সন, শকাব্দকে অনেকটা অপ্রচলিত করিয়া দিয়াছে। উত্তর-ভারতে হিন্দুদের মধ্যে 'সংবৎ' অব্দ চলে, ইহার আরম্ভ খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫৭ হইতে, ইহাও বাঙ্গালা দেশে কিছু কিছু চলিত। (এখন বাঙ্গালা সন ১৩৪৭ সাল, ইংরেজী বা খ্রীষ্টাব্দ ১৯৪০, এবং শকাব্দ ১৮৬২, সংবৎ ১৯৯৭।) বাঙ্গালা সন একটী মিশ্র অব্দ; মুসলমান আরবগণ (এবং তাঁহাদের অনুকরণে অন্য দেশের মুসলমানগণ) ইতিহাস ইত্যাদিতে 'হিজরী' অব্দ ব্যবহার করেন, এই হিজরী, ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ জুলাই মাস হইতে আরম্ভ

হয়। হিজরী ৯৬৩ —খ্রীষ্টাব্দ ১৫৫৬-তে দিল্লীর সম্রাট আকবর বাদশাহ নিয়ম করিলেন অতঃপর রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য চান্দ্র মাস-যুক্ত হিজরী অব্দকে, সৌর-মাস-যুক্ত 'ফসলী' অব্দে পরিণত করা হইবে। হিজরী হইতে পরিবর্তিত উত্তর-ভারতের এই ফসলী অব্দই বাঙ্গালা দেশে বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা সাল বা সনে পরিণত হইয়াছে। ৩৫৪ (৩৫৫) দিনে সম্পূর্ণ চান্দ্রমাসের বৎসর, সৌর মাসের ৩৬৫ দিনের বৎসর হইতে দশ দিন করিয়া কম; তদনুসারে হিজরী বাঙ্গালা সন হইতে বৎসরে সপ্তাহের অধিক দিন করিয়া আগাইয়া যাইতেছে। ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ৯৬৩ হিজরী, এবং ৯৬৩ বাঙ্গালা সন, কিন্তু এখন ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ১৩৫৯ হিজরী এবং ১৩৪৭ বাঙ্গালা সন—হিজরী বারো বৎসর আগাইয়া গিয়াছে।

৬ করতঃ—এই অসমাপিকা ক্রিয়াটি এখন বাঙ্গালায় অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে। অর্থ—'করিয়া'। শতৃ-প্রত্যয়ের রূপ 'করন্ত', তাহা হইতে 'করত', শেষ অক্ষর ত-কে অ-কারান্ত করিয়া দেখাইবার জন্য বিসর্গের ব্যবহার করা হইয়াছে।

৭ শালগ্রাম—ammonite নামক সামুদ্রিক fossil বা জীবাশ্ম, কাল-রঙের গোল নুড়ীর আকারের; নেপাল ও মিথিলায় প্রবাহিত গণ্ডকী নদীতে পাওয়া যায়। ইহার ভিতরে চক্রাকার চিহ্ন থাকায়, বিশেষ ভাবে বিষ্ণুর প্রতীক বলিয়া ইহাকে অবলম্বন করিয়া হিন্দুরা বিষ্ণুর পূজা করেন। গণ্ডকী নদীর তীরে 'শালগ্রাম' নামক গ্রামে এই জীবাশ্ম মিলে ব'লিয়া এই নাম।

৮ লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা—বিশেষ নামের শালগ্রাম শিলা।

৯ ভোগ-রাগ—দেবমূর্তির পূজা এবং পুষ্প বস্ত্র অলঙ্কার দ্বারা শোভা সম্পাদন।

১০ মণ্ডলঘাট—পশ্চিম বঙ্গের একটি বিখ্যাত স্থান—অধুনা হাওড়া জেলায় অবস্থিত।

১১ সংক্ষিপ্ত-সার—ক্রমদীশ্বর-রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণ, খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকে প্রণীত। বঙ্গদেশে সংস্কৃতের প্রাচীন ব্যাকরণ পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' (খ্রীঃ-পূঃ ৫ম শতক?) তাদৃশ পঠিত হইত না—ইহার পরিবর্তে 'কাতন্ত্র' বা 'কলাপ', 'মুগ্ধবোধ', 'সুপদ্ম' ও 'সংক্ষিপ্ত-সার' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিই প্রচলিত ছিল।

১২ অভিধান—সম্ভবতঃ, অমরসিংহ-রচিত 'অমরকোষ' নামে সংস্কৃত অভিধান।

১৩ কেশরকুণি—কেশরকোণা গ্রামে যাঁহাদের আদি বাস ছিল।

১৪ তখনকার দিনে ফারসী ছিল রাজভাষা, ফারসী পড়িলেই রাজ-সরকারে চাকরী পাওয়া যাইত। ভারতচন্দ্র অর্থকরী ভাষা ফারসী না পড়িয়া সংস্কৃত পড়ায় তাঁহার অগ্রজগণ রুষ্ট হইয়াছিলেন।

১৫ সিধা—হিন্দী 'সীধা'—স্বয়ং পাক করিয়া খাইবার জন্য যে কাঁচা চাউল, দাল, আটা, শাক-তরকারী, ঘী, লবণ ইত্যাদি দেওয়া হয়।

১৬ সত্য-নারায়ণ পূজার শিন্নি—মুসলমান আমলে হিন্দু ও মুসলমান উপাসনার অনুষ্ঠানের সমন্বয় করিবার চেষ্টায় সত্য-নারায়ণ পূজার উদ্ভব। হিন্দুর উপাস্য রাম বা নারায়ণ, এবং মুসলমানের উপাস্য রহিম বা দয়াময় আল্লাহ্, এই দুই যে এক ইহার প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু-পূজার সহিত, মুসলমান পীরের দরগায় 'শীরনী' অর্থাৎ মিষ্টান্নাদি নিবেদন করিবার রীতির সহিত মিলাইয়া, এই পূজা-পদ্ধতি স্থিরীকৃত হয়। পূজা-অন্তে সত্য-নারায়ণ বা সত্য-পীরের মাহাত্ম্য-বিষয়ক 'কথা' পাঠ করা হয়।

১৭ শিন্নি—ফারসী 'শীরীন্'—মিষ্টান্ন, ও 'শীর্'—ক্ষীর, দুগ্ধ—এই উভয় শব্দের মিলনে বাঙ্গালায় 'শিন্নি'—আটা, দুধ, গুড় বা চিনি মিলাইয়া নৈবেদ্য, সত্য-নারায়ণ পূজার প্রধান অঙ্গ।

১৮ ভণিতা—বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষায় প্রাচীন ধরণে লেখা কবিতার শেষে কবির যে নাম থাকে, তাহাকে 'ভণিতা' বলে। 'ভণয়ে বিদ্যাপতি', 'চণ্ডীদাস ভণে' প্রভৃতি বাক্যে এই নাম দেওয়া হয়। তুলসীদাসের পূর্বী-হিন্দীতে কবিতাকে 'ভনিতী' বলা হইয়াছে। আরবী ও ফারসী ভাষায় কাব্য ও কবিতাতে এই রীতি আছে, আরবী-ফারসীর দেখাদেখি উর্দুতেও ইহা অনুকৃত হইয়াছে। কবি কখন কখন কাব্যের জন্য একটি বিশেষ নাম বা ছদ্মনাম (pen-name) ব্যবহার করেন—এইরূপ pen-name-কে আরবী ফারসী ও উর্দুতে 'তখল্লুস' বলে।

১৯ মারহাট্টার অধিকার—তখন উড়িষ্যা নাগপুরের 'ভোঁসলে'-উপাধি-যুক্ত মহারাষ্ট্র-রাজার অধীন ছিল। জলেশ্বর বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সীমায় ছিল।

২০ সুবেদার—'সুবে' বা 'সূবহ্' অর্থাৎ প্রদেশের শাসনকর্তা।

২১ শ্রীশ্রী৺পুরুষোত্তম-ধাম—পুরী-তীর্থ। নারায়ণের এক নাম 'পুরুষোত্তম', এই হেতু এই বৈষ্ণব-তীর্থের উক্ত নাম।

২২ শ্রীক্ষেত্র—পুরী-তীর্থের আর একটী নাম।

২৩ বলমালী আটুকে—বলরামের জন্য বিশেষ দৈনিক ভোগ বা নৈবেদ্যের অন্ন-ব্যঞ্জনাদি। 'আটুকে' বা 'আটেকিয়া'—পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে ও অন্যত্র দেবতার ভোগের জন্য ভক্ত রাজা-রাজড়ারা ও অন্য অর্থশালী যাত্রীরা কিছু অর্থ দিয়া 'আটুকে বাঁধিয়া' রাখিতেন, অর্থাৎ কিছু টাকা ভোগের জন্য 'আটক' অর্থাৎ নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন। এই টাকায় পুরোহিতগণ ভোগের ব্যবস্থা করেন, তাহা ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে দান করা হয়, অথবা বিক্রয় করা হয়।

২৪ বাসুদেব—চেলা বা ভক্তের নাম-স্বরূপ এই নাম সম্ভবতঃ এক সময়ে বিশেষ প্রচলিত ছিল।

২৫ মনোহরশাহী—কীর্তন-গানের রীতিবিশেষ।

আত্মজীবনী

[রাসসুন্দরী দেবী]

রাসসুন্দরীর আত্মজীবনী ৺রায় বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় নূতন করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের সমক্ষে উপস্থাপিত করেন ("বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়" দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৭৮৫, খ্রীষ্টাব্দ ১৯১৪)। রাসসুন্দরী ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং তাঁহার আত্মজীবনী ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে প্রথম প্রকাশিত হয়। কিছুকাল পূর্বে এই বইয়ের একটি দ্বিতীয় মুদ্রণ-ও প্রকাশিত হয়। সরল, সুন্দর এবং অনাড়ম্বর ভাষায় এই সহৃদয়া মহিলা বিশেষ অমায়িকতার সহিত নিজ জীবনের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ঘটনা সকল লিখিয়া, নিষ্কপটতা এবং বর্ণনা-ভঙ্গীর গুণে নিজ-জীবন-কথা-বিষয়ক এই রচনায় সত্যকার রস-সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং এই রচনাকে যথার্থ সাহিত্য-পদে উন্নীত করিয়াছেন। রাসসুন্দরীর চরিত্রের নানাবিধ সদ্‌গুণ—তাঁহার শিক্ষানুরাগ, তাঁহার হিন্দু-গৃহিণী-সুলভ আত্মত্যাগ ও সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি—অতি সুন্দরভাবে এই আত্মচরিতখানিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। উদ্ধৃত অংশে তাঁহার শৈশবের কথা আছে।

চারি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত আমার শরীরের অবস্থা এবং মনের ভাব কি প্রকার ছিল তাহা আমি কিছুই জানি না—সে সমুদায় আমার মা

জানেন ; পরে আমি যখন ছয় সাত বছরের ছিলাম, তখনকার কথা আমার কিছু-কিছু মনে আছে। যাহা আমার মনে আছে, তাহাই লিখিতেছি। তখন আমি প্রতিবাসিনী বালিকাদের সঙ্গে ধূলা-খেলা করিতাম। ঐ সকল বালিকা বিনা অপরাধেই আমাকে মারিত। আমার মনে এত ভয় ছিল যে, আমি মার খাইয়াও বড় করিয়া কাঁদিতাম না, কেবল দুই চক্ষের জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইত। আমার যদি অতিশয় বেদনা হইত, সে জন্যও কতক কাঁদিতাম ; কিন্তু আমার কাঁদার বিশেষ কারণ এই যে, আমাকে মারিয়াছে, আমাদের বাটীর সকলে শুনিলে উহাকে গালি দিবেন[১]। আর একটী কথা মনে পড়ায় আমি কাঁদিতাম। এক দিবস আমার মা আমাকে বলিয়াছিলেন, তুমি কোনখানে যাইও না। তখন আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মা, যাবো না কেন ? তখন আমার মা বলিলেন, আজ বড় ছেলে-ধরা আসিয়াছে, সে ছেলে পাইলে ছালার মধ্যে পূরিয়া লইয়া যায়। মার ঐ কথা শুনিয়া আমার মনে এত ভয় হইল যে, আমার এক কালে মুখ শুখাইয়া গেল। আমার ঐ-সকল ভয়ের লক্ষণ দেখিয়া আমার মা তাড়াতাড়ি আসিয়া আমাকে কোলে লইয়া এই বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, যাঠ[২], তোমার ভয় নাই ; যে-সকল ছেলে দুষ্টামি করে, এবং ছেলে-পিলেকে[৩] মারে, সে-সকল ছেলেকে ছেলে-ধরায় লইয়া যায়। তোমার ভয় কি, তোমাকে লইয়া যাইবে না।

মার ঐ কথা আমার মনে মনেই থাকিল। যখন কোন ছেলে আমাকে মারিত, তখন মার ঐ কথা আমার মনে পড়িত। মা বলিয়াছেন, যে-ছেলে ছেলে-পিলেকে মারে তাহাকে ছেলে-ধরায় ধরিয়া লইয়া যায়। অতএব যখন কোন ছেলে আমাকে মারিত, তখন ভয়ে আমি বড় করিয়া

কাঁদিতাম না—উহাকে ছেলে-ধরায় ধরিয়া লইয়া যাইবে, কেবল এই ভয়ে দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িত, আমাকে মারিয়াছে, এই কথাও কাহারও নিকট বলিতাম না। আমি কাঁদিলে কেহ শুনিবে, এই ভয়ে মরিতাম। সকলে জানিত, আমাকে মারিলে আমি কাহারও নিকট বলিব না। আমি সকল বালিকাকে ভয় করিতাম, এ জন্য গোপনে-গোপনে সকলেই বিনা অপরাধে আমাকে মারিত।

একদিবস আমার সঙ্গিনী একটী বালিকা আমাকে গোপনে বলিল, তোমার মায়ের কাছে গিয়া জলপান চাহিয়া আন, আমরা দুইজনে গঙ্গাস্নানে যাই। শুনিয়া আমি ভারী আহ্লাদিত হইয়া মায়ের নিকট গিয়া বলিলাম, মা, আমি গঙ্গাস্নানে যাইব। মা হাসিয়া বলিলেন, গঙ্গা-স্নানে যাইবে—কি চাও? আমি বলিলাম, একটা বোঁচকা চাই। গঙ্গাস্নানের অর্থ আমি বিশেষ কিছুই জানি না—এই মাত্র জানি, পথে বসিয়া জলপান খায়, আর একটা বোঁচকা মাথায় করিয়া পথে হাঁটিয়া যায়। আমার মা ঐ সকল অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া একখানি কাপড়ে কিছু জলপান ও দুটী আম বাঁধিয়া একটি পুঁটলি করিয়া আনিয়া দিলেন। তখন ঐ পুঁটলি দেখিয়া আমার মনে যে কি পর্যন্ত আহ্লাদ হইল, তাহা আমি বলিতে পারি না; আমার মনে হইল, আমি যেন কত অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইলাম—আমার আনন্দের আর সীমা থাকিল না। এখন তাহার শতগুণের বেশী আহ্লাদের দিন ছিল তাহা বলা যায় না। তখন আমি ঐ পুঁটলি লইয়া সেই বালিকার সঙ্গে ‘গঙ্গাস্নানে’ চলিলাম। পরে এক পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া জলপান খুলিলাম। তখন আমার সঙ্গিনী বালিকা আমাকে বলিল, দেখ, তুমি যেন আমার মা, আমি যেন তোমার ছেলে; তুমি আমাকে কোলে লইয়া খাওয়াইয়া দাও। তখন আমি বলিলাম, তবে তুমি

আমার কোলের কাছে বৈস। তখন সে আমার কোলের কাছে বসিল। আমি বলিলাম, আচ্ছা, তবে খাও। এই বলিয়া ঐ সকল জলপান উহাকে খাওয়াইয়া দিলাম। পরে সে বলিল, আঁচাইয়া দাও। তখন আমি ভারী বিপদে পড়িলাম। কি করিব ভাবিতে লাগিলাম। আমি জলে নামিয়াও জল আনিতে পারিলাম না। অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কোন মতেই কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। আমার সঙ্গিনী ঐ অপরাধে আমাকে একটা চড় মারিল। আমি মার খাইয়া ভয়ে কাঁদিতে লাগিলাম। আমার দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। আমি অমনি দুই হাত দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলাম, আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, আমাকে মারিতে কেহ বুঝি দেখিল, এই ভয়ে আমি চারিদিকে তাকাইতে লাগিলাম।

ঐ সময়ে আমার খেলার সঙ্গিনী আর একটি বালিকা সেই স্থানে ছিল। সে উহাকে বলিল, তুমি কেমন মেয়ে, উহার সকল জলপান খাইলে, আম দুটাও খাইলে, আবার উহাকে মারিয়া কাঁদাইতেছ? আমি গিয়া উহার মায়ের কাছে বলিয়া দিই। এই বলিয়া সে আমাদের বাটীতে গিয়া সকলের নিকট বলিয়া পুনর্বার আমাদের নিকট আসিয়া বলিল, আমি তোমার মায়ের কাছে সকল কথা বলিয়া দিয়াছি, দেখ এখনি কি করে। এ কথা শুনিয়া আমার ভারী ভয় হইল, আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তখন আমার গঙ্গাস্নানের সঙ্গিনী বালিকা বলিল, উনি একটি সোহাগের আরশী[৪], কিছু না বলিতেই কাঁদিয়া উঠেন। এই বলিয়া আমার মুখে আর একটা ঠোকনা মারিল। তখন আমার অত্যন্ত ভয় হইল। আমি চক্ষের জল মুছিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, আমি সোহাগের আরশী হইয়াছি, না জানি আমার কি হইল। তখন আমার এই ভয়-ই হইতে লাগিল, আজ আমাকে ছেলে-ধরা

ধরিয়া লইয়া যাইবে, উহাকেও বুঝি লইয়া যাইবে। এই ভয়ে আমি আমাদের বাড়ীতে না গিয়া, ঐ গঙ্গাস্নানের সঙ্গিনীর বাড়ীতে গেলাম। তখন উহার মা আমার মুখের দিকে চাহিয়া উহাকে বলিল, উহার মুখ লাল হইয়াছে কেন? তুমি বুঝি উহাকে কাঁদাইয়াছ? এই বলিয়া তাহার মা তাহাকে গালি দিল। সে তাহার মায়ের কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। পরে তাহার মা গেলে আমাকে বলিল, দেখ, আমার মা আমাকে গালি দিল, আমি তো তোমার মত কাঁদিলাম না। তুমি যেমন আহ্লাদে' মেয়ে হইয়াছ! তুমি বুঝি তোমার মায়ের কাছে গিয়া সকল কথা বলিয়া দিবে? তখন আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, না, আমি মায়ের কাছে গিয়া কিছুই বলিব না। ইহা বলিয়া আমি বিষণ্ণ বদনে সেই স্থানে বসিয়া থাকিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমাদের বাটী হইতে একজন লোক আসিয়া আমাকে বাটী লইয়া গেল। আমি বাটী গিয়া দেখিলাম, সকলেই আমার ঐ সকল কথা বলিয়া হাসিতেছে। আমাকে দেখিয়া, গঙ্গাস্নান হয়েছে? বলিয়া আরো হাসিতে লাগিল। তখন আমার খুড়া, দাদা ও অন্যান্য সকলেও বলিতে লাগিলেন, আর এ-সকল মেয়েদের সঙ্গে উহাকে খেলিতে দেওয়া হইবে না। কল্য উহাকে বাহির-বাটীতেই রাখা যাইবে।

তখন সে একদিন ছিল; এখনকার মত মেয়ে-ছেলেরা লেখাপড়া শিখিত না। বাঙ্গালা স্কুল আমাদের বাটীতেই ছিল। আমাদের গ্রামের সকল ছেলে আমাদের বাটীতেই লেখাপড়া করিত। একজন মেম-সাহেব ছিলেন, তিনি সকলকে শিখাইতেন। পরদিবস প্রাতে আমার খুড়া আমাকে কাল রঙ্গের একটা ঘাঘরা পরাইয়া একখানা উড়ানী গায়ে দিয়া সেই স্কুলে মেম-সাহেবের কাছে বসাইয়া রাখিলেন। আমাকে যেখানে বসাইয়া রাখিতেন, আমি সেইখানেই বসিয়া থাকিতাম, ভয়ে

আমি আর কোন দিকে নড়িতাম না। তখন আমার বয়ঃক্রম আট বৎসর। তখন আমার শরীরের অবস্থা কি প্রকার ছিল তাহা আমি বলিতে পারি না। সকলে যাহা বলিত তাহা শুনিয়াছি, তাহাই বলিতেছি—

বর্ণ-টী আছিল মম অত্যন্ত উজ্জ্বল।
উপযুক্ত তারি ছিল গঠন সকল।
সেই পরিমাণে ছিল হস্তপদগুলি।
বলিত সকলে মোরে সোনার পুতুলি।

আমি কাহারো সঙ্গে কথা কহিতাম না। আমার মুখে পরিষ্কৃত হইয়া কথা বাহির হইত না। যে দুই-একটী কথা বাহির হইত তাহাও আধো-আধো, তাহা শুনিয়া সকলে হাস্য করিত। আমাকে যদি কেহ বড় করিয়া ডাকিত, তাহা হইলেই আমার কান্না উপস্থিত হইত। বড় কথা শুনিলেই আমার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইত। এ জন্য আমার সঙ্গে কেহ বড় করিয়া কথা কহিত না। আমি সকল দিবস সেই স্কুলেই থাকিতাম। মেয়ে-ছেলের মত আমাকে বাটীর মধ্যে রাখা হইত না। তখন ছেলেরা ক খ চৌত্রিশং অক্ষর মাটিতে লিখিত, পরে এক নড়ি হাতে লইয়া ঐ-সকল কথা উচ্চৈঃস্বরে পড়িত। আমি সকল সময়েই থাকিতাম। অমি মনে-মনে ঐ সকল পড়াই শিখিলাম। সে কালে পারসী পড়ার প্রাদুর্ভাব ছিল। আমি মনে মনে তাহাও খানিক শিখিলাম। আমি যে ঐ সকল পড়া মনে মনে শিখিয়াছি, তাহা আর কেহ জানিত না। আমাকে পরিজনেরা সমস্ত দিন বাহিরে রাখিতেন, কেবল স্নানের সময় বাড়ীর মধ্যে আনিয়া, স্নানাহারের পরেই আবার বাহিরে রাখিয়া আসিতেন, আর সন্ধ্যার পূর্বে বাটীর মধ্যে আনিতেন। এই প্রকারে সকল দিবস আমি স্কুলে মেম-সাহেবের

কাছেই আসিয়া থাকিতাম। তখন আমার মনের অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। ভয়ে যেন আমার মন এক কালে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। যদিও মনের কখন একটু অঙ্কুর হইয়া উঠিত, অমনি ভয় আসিয়া চাপা দিয়া রাখিত।

১ গালি দিবেন—আজকালকার ভাষায় 'বকিবেন', 'ধমকাইবেন', বা 'ভর্ৎসনা করিবেন' বলিবে।

২ ষাঠ্—শিশুদের রক্ষয়িত্রী ষষ্ঠী-দেবী (ষষ্ঠী—ষট্ঠী—ষাঠি—ষাঠ্)। শিশুদের অমঙ্গল-আশঙ্কা দূর করিবার ইচ্ছায় প্রাচীনরা 'ষাঠ্, ষাঠ্, ষাঠ' বলিয়া ষষ্ঠী দেবীর আবাহন করিতেন।

৩ ছেলে-পিলে—পুরাতন বাঙ্গালা 'ছালিয়া-পিল্যা' বা 'ছাওয়ালিয়া-পিলা'। 'ছাওয়ালিয়া' আসিয়াছে সংস্কৃত 'শাবক, শাব' শব্দ হইতে (শাব+আল+ইয়া প্রত্যয় —শাবালিয়া, ছাওয়ালিয়া); 'পিলা' সম্ভবতঃ অনার্য, দ্রাবিড় শব্দ (তুলনীয়, তামিল 'পিল্লৈ'—সন্তান)। বাঙ্গালা ও অন্য ভারতীয় ভাষায় এরূপ বহু সমস্ত-পদ আছে, যেগুলির দুইটী উপাদান একার্থক বা সমার্থক, কিন্তু দুইটী বিভিন্ন ভাষা হইতে গৃহীত। এইরূপ পদকে Translation Compound বা 'অনুবাদাত্মক সমাস' বলা যায়। যেমন, 'ধন-দৌলত' (সংস্কৃত ও ফারসী), 'বাক্স-পেঁড়া' (ইংরেজী ও ভারতীয়; সংস্কৃত 'পেটক' হইতে 'পেঁড়া')। এইরূপ 'অনুবাদাত্মক সমাস' দ্বারা ভারতে একাধিক ভাষার অবস্থান, অথবা ভারতের 'বহুভাষিত্ব' (Polyglottism) প্রমাণিত হয়।

৪ সোহাগের আরশী—'সোহাগ' (সংস্কৃত 'সৌভাগ্য', প্রাকৃত 'সোহাগ্গ', তাহা হইতে বাঙ্গালা শব্দ) অর্থে 'স্বামীর ভালবাসা'। 'সোহাগের আরশী'—বিবাহের সময়ে স্ত্রী-আচারে বরকে একখানি আরশী দেখানো হয়, বধূর প্রতি বরের প্রীতি অটুট থাকিবে এই উদ্দেশ্যে; লক্ষণায়—'আদরের বস্তু'।

৫ ক খ চৌত্রিশ অক্ষর—চৌত্রিশ ব্যঞ্জন বর্ণ। এই চৌত্রিশ ব্যঞ্জন বর্ণকে পূর্বে 'চৌতিশা' বলিত।

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক লিখিত আত্মজীবনী "বিদ্যাসাগর-চরিত" ১৮৪৮ সংবৎ আশ্বিন মাসে অর্থাৎ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম রচনা "বেতাল-পঞ্চবিংশতি" প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইহা তাঁহার রচিত শেষ গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পুস্তকে তাঁহার পূর্বপুরুষগণের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চরিত্র চিত্রণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাতে তাঁহার পিতার ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্ব অতি সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

গর মহাশয় বাঙ্গালায় কমা বা পাদচ্ছেদের ব্যবহার অত্যন্ত বেশী রকম করিতেন। নিম্নে মুদ্রিত নিবন্ধটীতে তাহা আধুনিক বাঙ্গালার রীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া কিছু কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রামজয় তর্কভূষণ দেশত্যাগী[১] হইলেন; [তাঁহার পত্নী] দুর্গাদেবী পুত্র-কন্যা লইয়া বনমালিপুরের[২] বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই দুর্গাদেবীর লাঞ্ছনা-ভোগ ও তদীয় পুত্রকন্যাদের উপর কর্তৃপক্ষের অযত্ন ও অনাদর এতদূর পর্যন্ত হইয়া উঠিল যে, দুর্গাদেবীকে পুত্রদ্বয়[৩] ও কন্যাচতুষ্টয় লইয়া পিত্রালয়ে যাইতে হইল। তদীয় ভ্রাতৃশ্বশুর[৩] প্রভৃতির আচরণের পরিচয় পাইয়া তাঁহার পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি সাতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং তাঁহার ও তাঁহার পুত্রকন্যাদের উপর যথোচিত স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবস সমাদরে অতিবাহিত হইল। দুর্গাদেবীর পিতা উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়

অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। এজন্য সংসারের কর্তৃত্ব তদীয় পুত্র রামসুন্দর বিদ্যাভূষণের হস্তে ছিল। সুতরাং তিনিই বাটীর প্রকৃত কর্তা ও তাঁহার গৃহিণীই বাটীর প্রকৃত কর্ত্রী। দেশাচার অনুসারে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ও তাঁহার সহধর্মিণী তৎকালে সাক্ষিগোপাল-স্বরূপ ছিলেন; কোনও বিষয়ে তাঁহাদের কর্তৃত্ব খাটিত না, সাংসারিক সমস্ত ব্যাপার রামসুন্দর ও তাঁহার গৃহিণীর অভিপ্রায় অনুসারেই সম্পাদিত হইত।

কিছু দিনের মধ্যেই পুত্র-কন্যা লইয়া পিত্রালয়ে কালযাপন করা দুর্গাদেবীর পক্ষে বিলক্ষণ অসুখের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃভার্যা তাঁহার উপর অতিশয় বিরূপ; অনিয়ত কালের জন্য সাতজনের ভরণ-পোষণের ভার বহনে তাঁহারা কোনও মতে সম্মত নহেন। তাঁহারা দুর্গাদেবী ও তদীয় পুত্র-কন্যাদিগকে গলগ্রহ বোধ করিতে লাগিলেন। রামসুন্দরের বনিতা কথায়-কথায় দুর্গাদেবীর অবমাননা করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত, দুর্গাদেবী স্বীয় পিতা তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের গোচর করিতেন। তিনি সাংসারিক বিষয়ে বার্ধক্য-নিবন্ধন ঔদাসীন্য অথবা কর্তৃত্ব-বিরহ-বশতঃ, কোনও প্রতিবিধান করিতে পারিতেন না। অবশেষে দুর্গাদেবীকে পুত্র-কন্যা লইয়া পিত্রালয় হইতে বহির্গত হইতে হইল। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় সাতিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলেন, এবং স্বীয় বাটীর অনতিদূরে এক কুটীর নির্মিত করিয়া দিলেন। দুর্গাদেবী পুত্র-কন্যা লইয়া, সেই কুটীরে অবস্থিতি ও অতিকষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় টেকুয়া[১] ও চরখায়[২] সূতা[৩] কাটিয়া সেই সূতা বেচিয়া অনেক নিঃসহায় নিরুপায় স্ত্রীলোক আপনাদের গুজরান[৪] করিতেন। দুর্গাদেবী সেই বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তিনি একাকিনী হইলে,

অবিলম্বে বৃত্তি দ্বারা অবলীলাক্রমে দিনপাত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাদৃশ স্বল্প আয়ের দ্বারা নিজের দুই পুত্রের ও চারি কন্যার ভরণ-পোষণ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার পিতা সময়ে-সময়ে যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন; তথাপি তাঁহাদের আহারাদি সর্ব বিষয়ে ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। এই সময়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম ১৪।১৫ বৎসর। তিনি মাতৃদেবীর অনুমতি লইয়া উপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।

সভারাম বাচস্পতি নামে আমাদের এক সন্নিহিত জ্ঞাতি কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কার, সুপ্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নের নিকট অধ্যয়ন করেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য ছিলেন; তাঁহার অনুগ্রহে ও সহায়তায় কলিকাতায় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন[৮] হয়েন। ঠাকুরদাস এই সন্নিহিত জ্ঞাতির আবাসে উপস্থিত হইয়া আত্মপরিচয় দিলেন, এবং কি জন্য আসিয়াছেন, অশ্রুপূর্ণ-লোচনে তাহা ব্যক্ত করিয়া, আশ্রয়-প্রার্থনা করিলেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সময় ভাল, অকাতরে অন্নব্যয় করিতেন; এমন স্থলে, দুর্দশাপন্ন আসন্ন[৯] জ্ঞাতি-সন্তানকে অন্ন দেওয়া দুরূহ ব্যাপার নহে। তিনি সাতিশয় দয়া ও সবিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন-পূর্বক, ঠাকুরদাসকে আশ্রয় প্রদান করিলেন।

ঠাকুরদাস প্রথমতঃ বনমালিপুরে, তৎপরে বীরসিংহে, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ[১০] পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে রীতি-মত সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন করিবেন, প্রথমতঃ এই ব্যবস্থা স্থির হইয়াছিল; এবং তিনিও তাদৃশ অধ্যয়ন-বিষয়ে সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সংস্কৃত-পাঠে নিযুক্ত হইলে তাহা সম্পন্ন হয় না। তিনি সংস্কৃত

পড়িবার জন্য সবিশেষ ব্যগ্র ছিলেন, যথার্থ বটে, এবং সর্বদাই মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিতেন, যত কষ্ট যত অসুবিধা হউক না কেন, সংস্কৃত-পাঠে প্রাণপণে যত্ন করিব ; কিন্তু জননীকে ও ভাই-ভগিনীগুলিকে কি অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছেন, যখন তাহা মনে হইত, তখন সে ব্যগ্রতা ও সে প্রতিজ্ঞা তদীয় অন্তঃকরণ হইতে একেবারে অপসারিত হইত। যাহা হউক, অনেক বিবেচনার পর অবশেষে ইহাই অবধারিত হইল, যাহাতে তিনি শীঘ্র উপার্জন-ক্ষম হন, সেরূপ পড়া-শুনা করাই কর্তব্য।

এই সময়ে, মোটামুটি ইংরেজী[১১] জানিলে, সওদাগর[১২] সাহেব-দিগের হৌসে[১৩] অনায়াসে কর্ম হইত। এজন্য সংস্কৃত না পড়িয়া, ইংরেজী পড়াই তাঁহার পক্ষে পরামর্শ-সিদ্ধ স্থির হইল। কিন্তু সে সময়ে ইংরেজী পড়া সহজ ব্যাপার ছিল না। তখন এখনকার মত প্রতি পল্লীতে ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল না। তাদৃশ বিদ্যালয় থাকিলেও, তাঁহার ন্যায় নিরুপায় দীন বালকের তথায় অধ্যয়নের সুবিধা ঘটিত না। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পরিচিত এক ব্যক্তি কার্যোপযোগী ইংরেজী জানিতেন। তাঁহার অনুরোধে ঐ ব্যক্তি ঠাকুরদাসকে ইংরেজী পড়াইতে সম্মত হইলেন। তিনি বিষয়-কর্ম করিতেন ; সুতরাং, দিবা-ভাগে তাঁহার পড়াইবার অবকাশ ছিল না। এজন্য তিনি ঠাকুরদাসকে সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকটে যাইতে বলিয়া দিলেন। তদনুসারে ঠাকুরদাস প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তাঁহার নিকটে গিয়া ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে সন্ধ্যার পরেই উপরিলোকের[১৪] আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত। ঠাকুরদাস ইংরেজী পড়ার অনুরোধে সে সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না ; যখন আসিতেন,

তখন আর আহার পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না, সুতরাং তাঁহাকে রাত্রিতে অনাহারে থাকিতে হইত। এইরূপে নক্তন্তন[১৫] আহারে বঞ্চিত হইয়া তিনি দিন-দিন শীর্ণ ও দুর্বল হইতে লাগিলেন। একদিন তাঁহার শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এমন শীর্ণ ও দুর্বল হইতেছ কেন? তিনি, কি কারণে তাঁহার সেরূপ অবস্থা ঘটিতেছে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার পরিচয় দিলেন। ঐ সময়ে সেই স্থানে ঐ শিক্ষকের আত্মীয় শূদ্র-জাতীয় এক দয়ালু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সবিশেষ অবগত হইয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং ঠাকুরদাসকে বলিলেন, যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে আর তোমার ওরূপ স্থানে থাকা কোনও মতে চলিতেছে না। যদি তুমি রাঁধিয়া খাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমায় আমার বাসায় রাখিতে পারি। এই সদয় প্রস্তাব শুনিয়া ঠাকুরদাস যার-পর-নাই[১৬] আহ্লাদিত হইলেন, এবং পরদিন অবধি তাঁহার বাসায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই সদাশয় দয়ালু মহাশয়ের দয়া ও সৌজন্য যেরূপ ছিল, আয় সেরূপ ছিল না। তিনি দালালি করিয়া সামান্য-রূপ উপার্জন করিতেন। যাহা হউক, এই ব্যক্তির আশ্রয়ে আসিয়া, ঠাকুরদাসের নির্বিঘ্নে দুই বেলা আহার ও ইংরেজী পড়া চলিতে লাগিল। কিছুদিন পরে ঠাকুরদাসের দুর্ভাগ্য-ক্রমে তদীয় আশ্রয়-দাতার আয় বিলক্ষণ খর্ব হইয়া গেল; সুতরাং তাঁহার নিজের ও তাঁহার আশ্রিত ঠাকুরদাসের অতি কষ্ট উপস্থিত হইল। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে বহির্গত হইতেন, এবং কিছু হস্তগত হইলে, কোনও দিন দেড় প্রহরের[১৭], কোনও দিন দুই প্রহরের, কোনও দিন আড়াই প্রহরের সময়, বাসায় আসিতেন; যাহা আনিতেন, তাহা দ্বারা কোনও দিন বা কষ্টে, কোনও দিন বা সচ্ছন্দে, নিজের ও ঠাকুরদাসের আহার সম্পন্ন হইত। কোনও

কোনও দিন তিনি দিবা-ভাগে বাসায় আসিতেন না। সেই-সেই দিন ঠাকুরদাসকে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিতে হইত।

ঠাকুরদাসের সামান্ত-রূপ একখানি পিতলের থালা ও একটি ছোট ঘটী ছিল; থালাখানিতে ভাত ও ঘটীতে জল খাইতেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, এক পয়সায় শাল-পাত কিনিয়া রাখিলে ১০।১২ দিন ভাত খাওয়া চলিবেক; সুতরাং থালা না থাকিলে কাজ আটকাইবেক না; অতএব থালাখানি বেচিয়া ফেলি; বেচিয়া যাহা পাইব, তাহা আপনার হাতে রাখিব। যে দিন দিনের বেলায় আহারের যোগাড় না হইবেক, এক পয়সার কিছু কিনিয়া খাইব। এই স্থির করিয়া তিনি সেই থালাখানি নূতন-বাজারে কাঁসারীদের দোকানে বেচিতে গেলেন। কাঁসারীরা বলিল, আমরা অজানিত লোকের নিকট পুরাণ[১৮] বাসন[১৯] কিনিতে পারিব না। পুরাণ বাসন কিনিয়া কখনও-কখনও বড় ফেসাদে পড়িতে হয়, অতএব তোমার থালা লইব না। এইরূপে কোনও দোকানদার সেই থালা কিনিতে সম্মত হইল না। ঠাকুরদাস বড় আশা করিয়া থালা বেচিতে গিয়াছিলেন, এক্ষণে সে আশা বিসর্জন দিয়া, বিষণ্ণ মনে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন মধ্যাহ্ন-সময়ে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া ঠাকুরদাস বাসা হইতে বহির্গত হইলেন, এবং অন্তমনস্ক হইয়া ক্ষুধার যাতনা ভুলিবার অভিপ্রায়ে পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া তিনি অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল পাইলেন। ক্ষুধার যাতনা ভুলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, বড়বাজার হইতে ঠনঠনিয়া[২১] পর্যন্ত গিয়া এত ক্লান্ত ও ক্ষুধায় তৃষ্ণায় এত অভিভূত হইলেন যে, আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই, তিনি এক দোকানের

সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন, এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি-মুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন? ঠাকুরদাস তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি সাদর ও সস্নেহ বাক্যে ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন, এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু[২২] জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস যেরূপ ব্যগ্র হইয়া মুড়কিগুলি খাইলেন, তাহা এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই? তিনি বলিলেন, না, মা, আজ আমি এখন পর্যন্ত কিছুই খাই নাই। তখন সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর, জল খাইও না, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া নিকটবর্তী গোয়ালার দোকান হইতে সত্বর দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার[২৩] করাইলেন। পরে তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যে দিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।

পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়-বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক পুরুষ হইলে ঠাকুরদাসের উপর কখনই এরূপ দয়া প্রকাশ ও বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেন না। যাহা হউক, যে যে দিন দিবাভাগে আহারের যোগাড় না হইত, ঠাকুরদাস সেই সেই দিন ঐ দয়াময়ীর আশ্বাসবাক্য অনুসারে তাঁহার দোকানে গিয়া পেট ভরিয়া ফলার করিয়া আসিতেন।

ঠাকুরদাস মধ্যে মধ্যে আশ্রয়-দাতাকে বলিতেন, যাহাতে আমি কোনও স্থানে নিযুক্ত হইয়া মাসিক কিছু-কিছু পাইতে পারি, আপনি দয়া করিয়া তাহার কোন উপায় করিয়া দেন। আমি ধর্ম-প্রমাণ[২০] বলিতেছি, যাঁহার নিকট নিযুক্ত হইব প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব, এবং প্রাণান্তে অধর্মাচরণ করিব না; আমার উপকার করিয়া আপনাকে কদাচ লজ্জিত হইতে বা কখনও কোনও কথা শুনিতে হইবেক না। জননী ও ভাই-ভগিনীগুলির কথা যখন মনে হয়, তখন আর ক্ষণ-কালের জন্যও বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। এই বলিতে বলিতে চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত।

কিছুদিন পরে ঠাকুরদাস আশ্রয়-দাতার সহায়তায় মাসিক দুই টাকা বেতনে কোনও স্থানে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ম পাইয়া তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। পূর্ব আশ্রয়-দাতার আশ্রয়ে থাকিয়া, আহারের ক্লেশ সহ্য করিয়াও বেতনের দুইটী টাকা যথানিয়মে জননীর নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ও যার-পর-নাই পরিশ্রমী ছিলেন, এবং কখনও কোনও ওজর না করিয়া সকল কর্ম সুন্দর রূপে সম্পন্ন করিতেন; এজন্য ঠাকুরদাস যখন যাঁহার নিকট কর্ম করিতেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন।

দুই তিন বৎসর পরেই, ঠাকুরদাস মাসিক পাঁচ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জননীর ও ভাইভগিনীগুলির অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে কষ্ট দূর হইল। এই সময়, পিতামহ-দেবও দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ বনমালিপুরে গিয়াছিলেন; তথায় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা দেখিতে না পাইয়া বীরসিংহে আসিয়া পরিবার-বর্গের সহিত মিলিত হইলেন। সাত আট বৎসরের পর তাঁহার সমাগম লাভে সকলেই আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইলেন। শ্বশুরালয়ে বা

শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে বাস করা তিনি অবমাননা জ্ঞান করিতেন, এজন্য কিছু দিন পরেই পরিবার[২৫] লইয়া বনমালিপুরে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গাদেবীর মুখে ভ্রাতাদের আচরণের পরিচয় পাইয়া, সে উদ্যম হইতে বিরত হইলেন, এবং নিতান্ত অনিচ্ছা-পূর্বক বীরসিংহে অবস্থিতি বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। এইরূপে বীরসিংহ গ্রামে আমাদের বাস হইয়াছিল।

বীরসিংহে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসকে দেখিবার জন্য কলিকাতা প্রস্থান করিলেন। ঠাকুরদাসের আশ্রয়-দাতার মুখে তদীয় কষ্ট-সহিষ্ণুতা প্রভৃতির প্রভূত পরিচয় পাইয়া, তিনি যথেষ্ট আশীর্বাদ ও সবিশেষ সন্তোষ-প্রকাশ করিলেন। বড়-বাজারে দয়ে'-হাটায় উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ ভাগবতচরণ সিংহ নামে এক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এই ব্যক্তির সহিত তর্কভূষণ মহাশয়ের বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। সিংহ মহাশয় অতিশয় দয়াশীল ও সদাশয় মানুষ ছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের মুখে তদীয় দেশত্যাগ অবধি যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রস্তাব করিলেন, আপনি অতঃপর ঠাকুরদাসকে আমার বাটীতে রাখুন, আমি তাহার আহার প্রভৃতির ভার লইতেছি; যখন স্বয়ং পাক করিয়া খাইতে পারে, তখন আর তাহার কোন অংশে অসুবিধা ঘটিবেক না।

এই প্রস্তাব শুনিয়া তর্কভূষণ মহাশয় সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং ঠাকুরদাসকে সিংহ মহাশয়ের আশ্রয়ে রাখিয়া, বীরসিংহে প্রতিগমন করিলেন। এই অবধি ঠাকুরদাসের আহার-ক্লেশের অবসান হইল। যথা-সময়ে আবশ্যক-মত দুই বেলা আহার পাইয়া, তিনি পুনর্জন্ম জ্ঞান করিলেন। এই শুভ ঘটনা দ্বারা তাঁহার যে কেবল আহারের ক্লেশ দূর হইল, এরূপ নহে; সিংহ মহাশয়ের সহায়তায়

মাসিক আট টাকা বেতনে এক স্থানে নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরদাসের আট টাকা মাহিয়ানা[২৩] হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া তদীয় জননী দুর্গাদেবীর আহ্লাদের সীমা রহিল না।

১ দেশত্যাগী—পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া ভ্রাতাদের সহিত মনান্তর হওয়ায় রামজয় তর্কভূষণ বাটী হইতে চলিয়া যান; দীর্ঘ আট বৎসর পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হন।

২ বনমালিপুর—শব্দটি 'বনমালী'; 'বনমালিপুর'—এখানে দীর্ঘ-ঈ না হইয়া হ্রস্ব-ই হইল কেন?

৩ ভ্রাতৃশ্বশুর—ভাশুর, স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

৪ টেকুয়া (বা টাকুয়া)—পশ্চিম বঙ্গে 'টেকো', পূর্ব বঙ্গে 'টাউক্যা'—সূতা কাটিবার যন্ত্র। সংস্কৃত 'তর্কু' হইতে 'টক্কু', তাহা হইতে 'টাকু', আ-প্রত্যয় যোগে 'টাকুয়া'। (গুজরাটী 'তক্‌লী' শব্দ এখন মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে এই খাঁটী বাঙ্গালা শব্দটীকে বাঙ্গালা ভাষাতে সীমাবদ্ধ করিয়া দিতেছে।)

৫ চরখা—ফারসী শব্দ। (সংস্কৃত 'অরঘট্ট', প্রাচীন ভারতে 'চরখা' অর্থে ব্যবহৃত হইত—'অরঘট্ট' হইতে হিন্দী ও উড়িয়া 'রহটা', মারহাট্টী 'রহেট' শব্দদ্বয় এখনও প্রচলিত আছে)।

৬ সুতা—মূলে আছে 'সুত'। 'সূত্র' হইতে 'সুত্‌', তাহাতে 'আ' প্রত্যয় যোগে 'সুতা'—স্বরসঙ্গতি অনুসারে কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণ-বিকৃতির জন্য 'সুতো', এই 'সুতো' শব্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় অ-কারান্ত করিয়া 'সুত' রূপে লিখিয়াছেন।

৭ গুজরান—ফারসী শব্দ—দিন-যাপন।

৮ প্রতিপন্ন—উচ্চ-অবস্থা-যুক্ত।

৯ আসন্ন—নিকট।

১০ সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ—পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২০ টিপ্পনী।

১১ ইংরেজী—মূল গ্রন্থে বিদ্যাসাগর মহাশয় বানান করিয়াছেন, 'ইঙ্গরেজী'। English শব্দের ফরাসী প্রতিরূপ Anglais 'আঁগ্লে', আরবীতে 'ইংকিলিস'; আজকাল 'ইংরেজ' রূপে লিখিত হয়। 'ইংরাজ-রাজ' এই অনুপ্রাসের খাতিরে

আবার এই শব্দকে বহুশঃ 'ইংরাজ' রূপে ('আ-কার'-যুক্ত করিয়া) বাঙ্গালায় লেখা হয়।

১২ সওদাগর—বণিক্। ফারসী শব্দ।

১৩ হৌস—হাউস, house ইংরেজ বণিকদের কুঠী বা আপিস। 'হৌস'—এই উচ্চারণ দ্রষ্টব্য; শতাধিক বর্ষ পূর্বে শব্দটী ইংরেজীতেই 'হাউস' না হইয়া 'হৌস' রূপে উচ্চারিত হইত। তুলনীয়—Town Hall='টৌন হাল' (এখন 'টাউন হল')।

১৪ উপরিলোক—পরিবার-বহির্ভূত বাহিরের লোক।

১৫ নক্তন্তন—রাত্রিকালের। নক্তম্=রাত্রি+বিশেষণার্থে তন-প্রত্যয়। 'অদ্য-তন, পুরা-তন, সনা-তন' প্রভৃতি শব্দেও এই 'তন' প্রত্যয়।

১৬ যার-পর-নাই—এই বাক্যাংশের সংস্কৃতরূপ 'যৎপরোনাস্তি'-ও বাঙ্গালায় চলে।

১৭ প্রহর—চার প্রহরে পুরা দিন বা রাত্রি। এক প্রহর তিন ঘণ্টায়। সূর্যোদয় (ভোর ছয়টা) হইতে নয়টা পর্যন্ত প্রথম প্রহর; বারোটা পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রহর (বা 'দ্বিপ্রহর')—চলিত কথায় 'দুপহর, দুপর, দুপুর'।

১৮ পুরাণ—শব্দটীর ঠিক বানান হওয়া উচিত 'পুরানো'। সংস্কৃত 'পুরাতনক', প্রাকৃত 'পুরাঅণঅ'—ভাষা (বাঙ্গালা) 'পুরাণঅ, পুরানো'। সংস্কৃতের 'পুরাণ' শব্দে ধর্ম্মগ্রন্থ-বিশেষ বুঝায়, সে শব্দ এই শব্দ হইতে পৃথক্।

১৯ বাসন—ইউরোপীয় শব্দ—পুরাতন ইংরেজীতে bason, আধুনিক ইংরেজী basin, অর্থ 'পাত্র'। পোর্তুগীস bason-এর মারফৎ বাঙ্গালায় আসিয়াছে।

২০ ফেসাদ—ফারসী 'ফসাদ' শব্দ; অর্থ—ঝঞ্ঝাট।

২১ ঠন্‌ঠনিয়া—কলিকাতা নগরীর এক বিখ্যাত পল্লী—এখানকার হ্যারিসন-রাস্তা হইতে আরম্ভ করিয়া কর্ণওআলিস-সড়ক ধরিয়া শঙ্কর-ঘোষের প্রতিষ্ঠিত কালী-মন্দির ('কালীতলা') পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি ছিল।

২২ শুধু—'শুদ্ধ'-শব্দজ=কেবল বা মাত্র।

২৩ ফলার—'ফলাহার' হইতে—ফলমূল ও সামান্য মিষ্টান্নাদির সহিত জলপান, তাহা হইতে 'গুরু-ভোজন,' নিমন্ত্রণ। বাঙ্গালা শব্দে মধ্যস্থিত হ-কার প্রায়ই

অনুচ্চারিত হয়, সেজন্য এই সংক্ষিপ্ত রূপ। তুলনীয়—'গৃহিণী—গিরিহিণী—গিন্নী'। পুরোহিত—পুরোইত—পুরুত'; ইত্যাদি।

২৪ ধর্ম-প্রমাণ—ধর্মকে প্রমাণ করিয়া বা ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মানিয়া।

২৫ পরিবার—মূল অর্থ, পরিজন, পোষ্য—যাহারা কোনও গৃহস্থকে চারিদিকে ঘিরিয়া থাকে (পরিব্রিয়তে এভিঃ—ইতি পরিবারঃ); family বা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা অর্থে ব্যবহৃত হয়, এবং বহুশঃ কেবল 'পত্নী' অর্থেও প্রযুক্ত হয়।

২৬ 'মাহিয়ানা'—মাসিক বেতন। ফারসী 'মাহ্' শব্দের অর্থ 'মাস', তাহা হইতে 'মাহিয়ানা'—মাস-সম্বন্ধীয়। চলিত ভাষায় 'মাইনে' (হ-কারের লোপ, স্বর-সংকোচ ও স্বর-সঙ্গতি)।

রঘুনাথ শিরোমণি

[শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন]

এই ক্ষুদ্র জীবন-কথাটী (ও ইহার পরেরটী—"তারানাথ তর্কবাচস্পতি") ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্তৃক রচিত "চরিতমালা" হইতে গৃহীত (সন ১৩০১ সালে প্রকাশিত ২য় সংস্করণ)। বিদ্যাসাগর মহাশয় কতকগুলি ইউরোপীয় পণ্ডিতের জীবন-কাহিনী লইয়া "চরিতাবলী" নামে একখানি বই ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। তাহাতে শম্ভুচন্দ্র স্বদেশীয় মনস্বীদের জীবন-চরিতের সহিত—বিশেষতঃ এমন মনস্বীদের জীবন-কথার সহিত যাঁহারা দুঃখকষ্টের মধ্যে মানুষ হইয়াছিলেন—বাঙ্গালী ছেলেদের পরিচিত করাইয়া দিবার সাধু উদ্দেশ্যে এই অতি উপযোগী বইখানি লেখেন।

রঘুনাথ শিরোমণি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন—খ্রীষ্টীয় পনেরো ও ষোলো শতকের ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও প্রতিভা বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের গৌরবের বস্তু। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুনাথ বাঙ্গালা দেশে নবদ্বীপে নব্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া মিথিলার প্রতিপত্তি খর্ব করেন ও বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করেন। রঘুনাথের শৈশবের ও যৌবনের বুদ্ধিমত্তার কথা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে প্রচলিত থাকিবার যোগ্য।

রঘুনাথ তিন বৎসর বয়সে পিতৃহীন। ইঁহার পিতা অত্যন্ত দুঃখী ছিলেন, সুতরাং মৃত্যুর পর তিনি পরিবার-প্রতিপালনের জন্য কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। রঘুনাথের জননী, সন্তান-প্রতিপালনের কোনও উপায় না পাইয়া, ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার চলিয়া উঠিল না। তখন তিনি টোলের[১] ছাত্রদের 'পেটেলী' অর্থাৎ দাসী-বৃত্তি করিতে লাগিলেন। ইহাতে রঘুনাথ ও রঘুনাথের জননীর অতিকষ্টে দিনপাত হইতে লাগিল।

রঘুনাথের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন একদিন তাঁহার মাতা আগুন আনিতে তাঁহাকে টোলে পাঠাইয়া দেন। টোলের একটী ছাত্র রাঁধিতেছিল। রঘুনাথ আগুন চাহিলে, সে হাতায় করিয়া আগুন লইয়া রঘুনাথকে বলিল, "ধর।" রঘুনাথ আগুন লইবার পাত্র লইয়া যান নাই। সুতরাং পড়ুয়া "ধর" বলাতে তিনি বিপদে পড়িলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ এক অঞ্জলি ধূলি লইয়া হাত পাতিলেন। ছাত্র রঘুনাথের ধূলিপূর্ণ হস্তোপরি আগুন দিল। রঘুনাথ আগুন লইয়া চলিয়া গেলেন।

ঐ টোলের অধ্যাপকের নাম বাসুদেব সার্বভৌম। তিনি বঙ্গদেশে সর্বপ্রথমে ন্যায়-শাস্ত্রের প্রচার করেন। বাসুদেব দাঁড়াইয়া রঘুনাথের এইরূপ উপস্থিত-বুদ্ধি দেখিলেন; দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন। অধ্যাপক রঘুনাথের জননীর নিকট গিয়া তাঁহার পুত্রটীকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সার্বভৌম পুত্রের ভরণ-পোষণ করিবেন এবং তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষা দিবেন, এই আশায় রঘুনাথের জননী পুত্রকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। বাসুদেবও রঘুনাথকে অতিযত্নে বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগিলেন।

রঘুনাথের বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে তাঁহার

অল্পদিনেই সম্যক্ বুৎপত্তি লাভ হইল। তিনি "ক", "খ" পড়িতে আরম্ভ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "খ" আগে না হইয়া "ক" আগে হইল কেন? সুতরাং বর্ণমালা-শিক্ষা আরম্ভ করিবার সময়েই তাঁহাকে কি রীতিতে বর্ণমালার অক্ষরগুলি সাজানো হইয়াছে প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাকরণ-শাস্ত্রের কতকগুলি বিচার, অধ্যাপককে বুঝাইয়া দিতে হইল। বাঙ্গালা বর্ণমালায় দুইটী "ন", দুইটী "ব", দুইটী "য", তিনটী "শ" কেন আছে, রঘুনাথের হাতে-খড়ির সময়েই বাসুদেবকে সে-সকল কথা বুঝাইয়া দিতে হইয়াছিল। যাঁহাকে "ক", "খ" পড়াইতে গিয়াই বর্ণের উচ্চারণ-স্থান প্রভৃতি ব্যাকরণের কঠিন কঠিন বিষয় বুঝাইয়া দিতে হয়, ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভে তাঁহার বড় বেশী বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা নাই।

রঘুনাথ ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্মৃতির[৩] কিয়দংশ পড়িয়াই ন্যায়-শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং অল্পদিনের মধ্যে প্রচলিত অনেক গ্রন্থের দোষ দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। সার্বভৌম, ছাত্রটী তাঁহার অপেক্ষা বড় পণ্ডিত হইয়াছেন বুঝিয়া, পাঠ-সমাপ্তির জন্য তাঁহাকে মিথিলায়[৪] পাঠাইয়া দিলেন। তৎকালে মিথিলাই বিদ্যাচর্চার প্রধান স্থান ছিল, এজন্য মিথিলার পণ্ডিতেরাই ছাত্রদিগকে উপাধি-দান[৫] করিতে পারিতেন। আর কেহ উপাধি দিলে তাহা গ্রাহ্য হইত না।

রঘুনাথ মিথিলায় যাইবার সময় মনে-মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, তিনি প্রত্যাগমন করিয়া বঙ্গদেশেই ছাত্রদিগকে উপাধি দিতে আরম্ভ করিবেন। তৎকালে মিথিলার পক্ষধর মিশ্র প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সহস্রাধিক ছাত্রকে পাঠ দিতেন। রঘুনাথ পক্ষধর মিশ্রের টোলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। রঘুনাথের এক চোখ কাণা ছিল। এজন্য অন্যান্য ছাত্রেরা সর্বদা তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিত। যাহা হউক, তিনি অল্পদিনের

মধ্যেই পক্ষধর মিশ্রের প্রধান প্রধান ছাত্রদিগকে বিচারে পরাস্ত করিলেন; এবং তদনন্তর স্বীয় অধ্যাপকের সহিত-ই তাঁহার বিচার চলিতে লাগিল। পক্ষধর ছাত্রের বুদ্ধির প্রাখর্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি পূর্ণচন্দ্রের কিরণ হইতে কিছু নির্মল বস্তু জগতে থাকে, তবে সে রঘুনাথের বুদ্ধি। তিনি বিচারে আপনার পরাজয় স্বীকার করিয়া, রঘুনাথকে 'তার্কিক-শিরোমণি' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। রঘুনাথের নিকট মিথিলার সর্বপ্রধান পণ্ডিত পরাজয় স্বীকার করায়, তদবধি নবদ্বীপ হইতেই উপাধি-দানের সূত্রপাত হইল। বঙ্গদেশের ছাত্রেরা অন্য অন্য স্থানে অধ্যয়ন করিয়া পাঠ-সমাপন ও উপাধি-গ্রহণার্থ নবদ্বীপে আসিতে লাগিলেন। অদ্যাপি নবদ্বীপের এই সম্মান বজায় আছে। কিন্তু এই সমস্ত মহাসম্মানের মূল সেই ভিখারিণীর পুত্র রঘুনাথ।

রঘুনাথ মিথিলা হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিয়া টোল খুলিয়া দিলেন। তাঁহার এক কাঠা জমীও ছিল না, এবং ঘর করিবার একটী পয়সাও ছিল না। সুতরাং হরিঘোষ নামক এক গোয়ালার গোয়াল-ঘরে তাঁহাকে প্রথমে অধ্যাপনা আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। অল্পদিনের মধ্যেই তথায় এত ছাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল যে, তাহাদের কলরবে হাট বসিয়াছে বলিয়া বোধ হইত। এই জন্যই, যে বাড়ীতে অনেক লোক বাস করে, আজিও লোকে তাহাকে 'হরিঘোষের গোহাল' বলে।

রঘুনাথ ন্যায়-শাস্ত্রের যে-সকল টীকা ও গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা পূর্ববর্তী সমস্ত ন্যায়-গ্রন্থের টীকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়ায়, এখন তাহাই প্রচলিত আছে। তিনি সর্ব-শুদ্ধ ত্রিশখানি বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। তৎপরবর্তী গ্রন্থকারেরা রঘুনাথের গ্রন্থের টীকা লিখিয়া আপনা-দিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া গিয়াছেন।

নবদ্বীপ এক সময়ে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, কিন্তু এখন সে রাজধানীর চিহ্ন-ও নাই ; এখন সর্বদেশীয় পণ্ডিতবর্গের মধ্যে নবদ্বীপ কেবল ন্যায়-চর্চার প্রধান স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই ন্যায়-চর্চার প্রধান প্রবর্তক রঘুনাথ।

যখন মনে হয়, এই রঘুনাথের মাতা, ভিক্ষা করিয়া পুত্রকে খাওয়াইতেন এবং দাস-বৃত্তি করিতেন, তখন বিদ্যাশিক্ষার যে কত গুণ, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। দেখ, বিদ্যাশিক্ষা করাতেই, একজন ভিখারিণীর পুত্র, বঙ্গদেশের সর্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া জগতে চির-স্মরণীয় হইয়াছেন। যতদিন ন্যায়-শাস্ত্রের চর্চা থাকিবে, ততদিন কেহই তাঁহার নাম বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

১ টোল—প্রাচীন রীতিতে পরিচালিত সংস্কৃত বিদ্যালয়। ছাত্ররা টোলে বিনা বেতনে পাঠ করে ও বিনা ব্যয়ে বাসস্থান ও আহার পায়। ধনী লোকেরা বৃত্তি ও দান দিয়া অধ্যাপকদিগকে এই বিদ্যা-দান ও অন্নদান-কার্যে সাহায্য করেন। 'টোল' শব্দের অর্থ 'টোলা', টুলী, বা পল্লী—'যেখানে বহুলোক সমবেত হয়' ; বিশেষ অর্থে 'ছাত্র-বহুল বিদ্যালয়'। অন্য নাম—'চতুষ্পাঠী' বা 'চৌবাড়ী'।

২ পেটেলী—'পাটিয়ালী' শব্দ হইতে। যে 'পাট' করে অর্থাৎ গৃহ-মার্জন, জল-আহরণ প্রভৃতি নির্দিষ্ট কার্য সমাধা করে ; 'পাটিয়াল' বা 'পেটেল' অর্থাৎ কৃতকর্মা ব্যক্তি, ভৃত্য ; স্ত্রীলিঙ্গে, 'পাটিয়ালী—পেটেলী'।

৩ স্মৃতি—হিন্দু জাতির সাংসারিক, সামাজিক ও ধার্মিক জীবন পরিচালিত করিবার জন্য রচিত শাস্ত্রগ্রন্থগুলিকে 'স্মৃতি' বলে।

৪ মিথিলা—গঙ্গার উত্তরে বিহার প্রদেশের যে অংশ অবস্থিত তাহার নাম 'মিথিলা'। এই অঞ্চলের ভাষার নাম 'মৈথিলী'। বিদ্যাপতি কবি মিথিলার লোক ছিলেন। সংস্কৃত-চর্চার জন্য প্রাচীনকাল হইতে মিথিলার পণ্ডিতদের খ্যাতি আছে।

৫ উপাধি—এখনকার বি-এ, এম্-এ ডিগ্রির মত, প্রাচীনকালে পাঠ সাঙ্গ হইলে অধ্যাপকেরা কৃতী ছাত্রদের 'বিদ্যারত্ন, বিদ্যাসাগর, তর্করত্ন, সার্বভৌম' প্রভৃতি উপাধি দিতেন। এ উপাধি পণ্ডিতদিগকে সমাজে প্রতিষ্ঠাপন্ন করিত।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি

[শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন]

তারানাথ তর্কবাচস্পতি বিগত যুগের বাঙ্গালা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী ছিলেন। একদিকে তাঁহার পাণ্ডিত্য যেমন অসাধারণ ছিল, অন্যদিকে তাঁহার বিষয়-বুদ্ধি এবং কৃতকারিতা-ও ছিল অনন্য-সুলভ। পাণ্ডিত্য ও কর্মশক্তির এইরূপ সমাবেশ প্রায় একত্র দেখা যায় না। ইঁহাকে পাণ্ডিত্যে ও কর্মশক্তিতে অতিমানব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান। তাঁহার পূর্ব-পুরুষেরা শাস্ত্র-চর্চা করিয়া বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতামহ বর্ধমান-রাজের আগ্রহাতিশয়ে কালনা গ্রামে বাস করেন। এই স্থানেই ইংরেজী ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে তারানাথের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। তিনি সাত বৎসর বয়সে সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন, এবং দিনরাত পরিশ্রম করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই বাঙ্গালা দেশে তৎকাল-প্রচলিত ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তদনন্তর তিনি সংস্কৃত কালেজে' প্রবিষ্ট হন। কালেজে কি শিক্ষক, কি ছাত্র, সকলে তাঁহার উৎসাহ, অধ্যবসায় ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হন। তিনি সংস্কৃত কালেজে ছয় বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া, তত্রত্য সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "তর্ক-বাচস্পতি" এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন; অনন্তর তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

সেই সময়ে তিনি বর্ধমানের সদর-আমিনী[২] পদের নিয়োগ-পত্র পাইয়াছিলেন; কিন্তু চাকরী না করিয়া বেদান্তাদি শাস্ত্র পাঠের জন্য কাশী যাত্রা করিলেন। কাশীতেও তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তথায় তিনি পাঠ সমাপন করিয়া, স্বদেশ-প্রত্যাগমন-পূর্বক কালনা গ্রামে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন।

অন্যান্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ন্যায় তর্কবাচস্পতি বিদায়[৩] গ্রহণ করিতেন না। নিজে ব্যবসায় করিয়া যে উপস্বত্ব পাইতেন, তাহা হইতেই আপনার সংসারের খরচ এবং ছাত্রদের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিতেন। এই-সকল ব্যবসায়ে তাঁহাকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইত। তিনি নেপাল হইতে শাল-কাষ্ঠ আনাইয়া ব্যবসায় করিতেন। ধান্য ক্রয় করিয়া এবং তাহা হইতে চাউল প্রস্তুত করাইয়া ব্যবসায় করিতেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার কাপড়ের ও সূতার ব্যবসায় ছিল এবং বিস্তৃত চাষের কার্য-ও ছিল। এই সকল ব্যবসায় ক্রমে বিলক্ষণ বিস্তৃত হইয়া উঠে। তিনি সকল ব্যবসায়ের কার্যই ভাল-রূপে বুঝিতেন, এবং নিজেই সমস্ত কার্য পরিদর্শন করিতেন। তৎকালের ভদ্রলোকেরা যে সকল কার্য শিক্ষা করা আবশ্যক মনে করিতেন, সে সমস্তই বাচস্পতি ভাল-রূপে জানিতেন। তিনি জমিদারী সেরেস্তার কার্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিতেন। তিনি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের বাটীতে শ্রাদ্ধাদি কার্যে অধ্যক্ষতা করিতেন, এবং তাঁহার অধ্যক্ষতায় সকল কার্য-ই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত।

তারানাথ কালনায় কিছুকাল অধ্যাপনা করেন; পরে সংস্কৃত কালেজের ব্যাকরণ-শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগ্রহে ঐ কার্য করিতে স্বীকার করেন। তাঁহার ঐ কার্য গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, কলিকাতায় তাঁহার

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিশেষ সুবিধা হইবে। কার্য-গ্রহণের পরে তাঁহাকে কালনা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে হইল। অতএব তিনি পুরাতন ব্যবসায়গুলি পরিত্যাগ করিয়া, অপরাপর বিস্তৃত ব্যবসায় আরম্ভ করেন, এবং শাল, স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতির ব্যবসায়ে প্রথমতঃ বিলক্ষণ লাভবান্ হইয়াছিলেন।

তাঁহাকে কালেজে পড়াইতে হইত, এজন্য সকল সময় তিনি আপন ব্যবসায়ের পর্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন না। সুতরাং উত্তম-রূপে তত্ত্বা-বধানের অভাবে প্রায় এক লক্ষ টাকা মূল্যের শাল কীট-দষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। ইহাই তাঁহার ব্যবসায়ের অবনতির সূত্রপাত। এই কারণে কয়েক বৎসর মধ্যে তাঁহাকে লক্ষাধিক টাকা ঋণ-গ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। আর ঐ টাকার জন্য তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। ঋণগ্রস্ত হওয়াতেই তারানাথ সর্বপ্রথম প্রতিগ্রহ[৫] করিতে আরম্ভ করেন। ভট্টাচার্য-বিদায় এবং অন্যান্য দান গ্রহণ করায়, তাঁহার আয় কিছু বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ঋণ শোধ হয় নাই। তাঁহার ঋণ-পরিশোধের কোনও উপায় ছিল না।

তর্কবাচস্পতির এই বিপদের সংবাদ পাইয়া সংস্কৃত কালেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাউয়েল[৬] সাহেব মহোদয়, তাঁহাকে প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক সকল মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিবার পরামর্শ দেন। ইতিপূর্বে তিনি যে-সকল পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া উক্ত সাহেব মহোদয়ের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে, তর্কবাচস্পতির ন্যায় সর্ব-শাস্ত্র-বিশারদ অসাধারণ মেধাবী এবং ব্যবসায়-পটু পণ্ডিত যদি এই কার্যের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি যথেষ্ট লাভবান্ হইতে পারিবেন, এতদ্ভিন্ন জগতের-ও বিশেষ উপকার হইবে।

তর্কবাচস্পতি তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য করিয়া অল্পকাল মধ্যেই

আপনার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া উঠেন। তাঁহার মুদ্রাঙ্কিত পুস্তক জগতের সর্বত্রই আদৃত হইয়াছে, এবং কি এশিয়া, কি ইউরোপ, কি আমেরিকা, সর্বত্রই তাঁহার পুস্তক সমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে।

তর্কবাচস্পতির প্রধান কীর্তি, তৎপ্রণীত "বাচস্পত্য" অভিধান। এই সুবিস্তৃত সংস্কৃত অভিধান প্রণয়নে তাঁহাকে আঠার বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয়। ইহার মুদ্রাঙ্কনে ৮০,০০০৲ টাকা ব্যয় হয়, এবং ১২ বৎসর কাল অতীত হয়। গ্রন্থখানি ৫৬০০ পত্রে সম্পূর্ণ। ইহাতে সকল শাস্ত্রের কথাই আছে। ইহা দ্বারা সংস্কৃত বিদ্যার্থিগণের যে কি পর্যন্ত উপকার হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। এই বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়নে তর্কবাচস্পতি কাহারও সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। ইতিপূর্বে যে সকল সংস্কৃত অভিধান মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে শব্দের ব্যুৎপত্তি-সাধন ছিল না; বাচস্পতি এই সংস্কৃত অভিধানে শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখিয়া দিয়াছেন। এই অভিধান-প্রণয়ন জন্য বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে এত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল যে গ্রন্থ-সমাপ্তির পরেই তাঁহার শরীর একান্ত অপটু হইয়া পড়ে, এবং উহার দুই বৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

তর্কবাচস্পতির অসাধারণ বিদ্যানুরাগ ও অধ্যবসায়, এদেশীয় লোকের অনুকরণীয়। সংস্কৃত বিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় তাঁহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়। তিনি যত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই পণ্ডিতগণের উৎসাহ-বর্ধনার্থ ব্যয় করিয়াছেন। তিনি বহুসংখ্যক বিদ্যার্থীকে তাঁহার নিজ বাটীতে রাখিয়া অকাতরে অন্ন ও বিদ্যা দান করিতেন। বঙ্গদেশীয় ছাত্র ব্যতীত সিংহল, কাশ্মীর, দ্রাবিড়[৭] ও কর্ণাট প্রভৃতি দূরদেশ হইতে ছাত্রগণ আসিয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। যখন সংস্কৃত কালেজের কর্ম হইতে পেন্‌শন্ লইয়া

অবসর গ্রহণ করেন, তখন তিনি আপন বাটীতে 'শ্রী সংস্কৃত কালেজ' নামক এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, তাহার সমস্ত কার্যের ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন।

তর্কবাচস্পতি এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করিতেন না। বৃদ্ধ বয়সেও পথ চলিবার সময় প্রুফ দেখিতে দেখিতে যাইতেন। তিনি একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। কলিকাতায়, কাশীতে অথবা পূর্ব-বঙ্গ দেশে কোনও পণ্ডিত-ই প্রায় তাঁহার ন্যায় বিচার-শক্তি-প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। এমন সময়ে জয়পুরের মহারাজ কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ পরিদর্শন সময়ে বাচস্পতির পাণ্ডিত্যে বিমুগ্ধ হন এবং প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে বাচস্পতি মহাশয় জয়পুরে গমন-পূর্বক তত্রত্য পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাজয় করিয়া শৈব-মত[৮] স্থাপন করিয়া প্রভূত অর্থ ও রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

১ সদর-আমিনী—রাজস্ব-সংক্রান্ত বিচারক (আরবী 'আমীন'—বিশ্বস্ত কর্মচারী, তত্ত্বাবধানকারী, ও 'সদর'—প্রধান)।

২ বিদায়—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অথবা অন্য ব্যক্তির বিদায়-কালে তাঁহার বিদ্যাবত্তার সম্মানের জন্য (অথবা পাথেয় প্রভৃতির জন্য) তাঁহাকে যে টাকা-পয়সা, তৈজস বা বস্ত্রাদি দেওয়া হইয়া থাকে।

৩ ব্যবসায়—শব্দটী সাধারণতঃ 'ব্যবসা'রূপে বাঙ্গালায় শোনা যায়—অনেকে এই সংক্ষিপ্ত রূপেই ইহা লিখিয়া থাকেন। শম্ভুচন্দ্রও তৎপুস্তকে অনেক স্থানে 'ব্যবসা' লিখিয়াছেন।

৪ কালেজ—ইংরেজী College শব্দ, আমরা এখন অ-কার দিয়া 'কলেজ' লিখি, আগে আ-কার দিয়া 'কালেজ' লিখিত। তদ্রূপ—Lord—'লর্ড', কিন্তু পুরাতন বাঙ্গালায় 'লার্ড, লাড, লাট'; Doctor—'ডক্টর', পুরাতন বাঙ্গালায় 'ডাক্তার'; Shaw—'শ',

পুরাতন বাঙ্গালা রূপ 'শা'। উহার কারণ, এখনকার ইংরেজীর দীর্ঘ অ-ধ্বনি শত বর্ষ পূর্বে আ ছিল—বাঙ্গালীর কানে 'আ' শুনাইত ; সেইজন্য এই আ-কার দিয়া বানান।

৫ প্রতিগ্রহ—কাহারও দান গ্রহণ করা। যে-সকল ব্রাহ্মণ কাহারও দান লইতেন না বা লন না, তাঁহাদিগকে 'অপ্রতিগ্রাহী' বলে।

৬ কাউএল—অধ্যাপক E. B. Cowell একজন বিখ্যাত সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত ছিলেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিল।

৭ দ্রাবিড়—তামিল দেশ ; কর্ণাট—কানাড়ী দেশ, মহীশূর ও তন্নিকটবর্তী স্থান, যেখানে কানাড়ী-ভাষী জাতি বাস করে।

৮ শৈব-মত—সাধারণতঃ ইহাকে 'অদ্বৈত-বেদান্ত' বলে। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ ; জীবাত্মার মুক্তির অর্থ, শিব বা পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাওয়া, জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নাশ করিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করা মুক্তির প্রকৃষ্ট উপায়—এই প্রকার মত।

বৌদ্ধ শীলভদ্র

[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

বর্ধমানে ১৩১৯ সালে (=১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে) অনুষ্ঠিত অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতি-রূপে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙ্গালা দেশের নানামুখী গৌরব-কাহিনীর অবতারণা করেন। তন্মধ্যে, তুর্কীদের দ্বারা বিজয়ের পূর্বে বাঙ্গালা দেশের কতকগুলি বৌদ্ধ আচার্য ও পণ্ডিতের কীর্তি-কথা বিশেষ গৌরব-বোধের সহিত উল্লেখ-যোগ্য। শীলভদ্র ইঁহাদের একজন ছিলেন ; তাঁহার জীবন-কথা সংক্ষেপে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালী পাঠককে শুনাইয়াছেন।

বিখ্যাত সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত, প্রত্নতাত্ত্বিক ও বঙ্গভাষার লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩২) কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক হন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের এবং বৌদ্ধ শাস্ত্র ও ধর্মের চর্চায় ইঁহার মূল্যবান্ অনুসন্ধান আছে। বাঙ্গালা ভাষার ইনি একজন রসজ্ঞ লেখক ছিলেন, সহজ ও সরল ভাষায় ইনি প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যা-বিষয়ে বহু নিবন্ধ লেখেন, এবং কতকগুলি উপাখ্যান এবং উপন্যাস-ও প্রণয়ন করেন।

"অভিধর্মকোষ"-ব্যাখ্যার মঙ্গলাচরণে লেখা আছে যে, গ্রন্থকার বসুবন্ধু[১] দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় বিরাজ করিতেন। একথা যদি ভারতবর্ষের পক্ষে সত্য হয়, তাহা হইলে সমস্ত এশিয়ার পক্ষে য়ুআন্-চুআং[২]যে দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় বিরাজ করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চীনে যত বৌদ্ধ পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন, য়ুআন্-চুআং তাঁহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়। তাঁহার-ই শিষ্য-প্রশিষ্য এক সময় জাপান, কোরিয়া, মোঙ্গোলিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিল। য়ুআন্-চুআং বৌদ্ধ ধর্ম ও যোগ শিখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি যাহা শিখিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার চেয়ে অনেক বেশী শিখিয়া যান। যাঁহার পদতলে বসিয়া তিনি এত শাস্ত্র শিখিয়াছিলেন, তিনি একজন বাঙ্গালী। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। তাঁহার নাম শীলভদ্র, সমতটের[৩] কোনও রাজার ছেলে। য়ুআন্-চুআং যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন তিনি নালন্দা[৪] বিহারের অধ্যক্ষ; বড় বড় রাজা, এমন কি সম্রাট্ হর্ষবর্ধন পর্যন্ত, তাঁহার নামে তটস্থ হইতেন, কিন্তু সে পদের গৌরব, মানুষের নহে। শীলভদ্রের পদের গৌরব অপেক্ষা বিদ্যার গৌরব অনেক বেশী ছিল। য়ুআন্-চুআং একজন বিচক্ষণ বহুদর্শী লোক ছিলেন। তিনি গুরুকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, নানা দেশে নানা গুরুর নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্রের ও বৌদ্ধ যোগের গ্রন্থ-সকল অধ্যয়ন করিয়া, তাঁহার যে-সকল সন্দেহ কিছুতেই মিটে নাই, শীলভদ্রের উপদেশে সেই সমস্ত সন্দেহ মিটিয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার যে-সমস্ত সংশয় দূর করিতে পারেন নাই, শীলভদ্র তাহা এক এক কথায় দূর করিয়া দিয়াছিলেন। শীলভদ্র মহাযান[৫] বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমস্ত গ্রন্থ-ই তাঁহার পড়া ছিল।

এ তো অনেক বৌদ্ধেরই থাকিতে পারে, বিশেষতঃ যাঁহারা বড় বড় মহাযান বিহারের কর্তা ছিলেন তাঁহাদের থাকাই তো উচিত; কিন্তু শীলভদ্রের ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল—তিনি ব্রাহ্মণের সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পাণিনি তাঁহার বেশ অভ্যাস ছিল, এবং সে সময় উহার যে সকল টীকা-টিপ্পনী হইয়াছিল, তাহাও তিনি পড়াইতেন। ব্রাহ্মণের আদি গ্রন্থ যে বেদ, তাহাও তিনি য়ুআন্-চুআংকে পড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মত সর্বশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত ভারতবর্ষেও আর দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনি মনের উদারতা ছিল; য়ুআন্-চুআং-এর পাণ্ডিত্য ও উৎসাহ দেখিয়া যখন নালন্দার সমস্ত পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে দেশে যাইতে দিবেন না স্থির করিলেন, তখন শীলভদ্র বলিয়া উঠিলেন, চীন একটী মহাদেশ, য়ুআন্-চুআং ঐখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিবেন, ইহাতে আমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়, সেখানে গেলে ইঁহার দ্বারা সদ্ধর্মের অনেক উন্নতি হইবে, এখানে বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না। আবার যখন কুমার-রাজ ভাস্করবর্মা য়ুআন্-চুআংকে কামরূপ যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং তিনি যাইতে রাজী হইলেন না, তখনও শীলভদ্র বলিলেন, কামরূপে বৌদ্ধ ধর্ম এখনও প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, সেখানে গেলে যদি বৌদ্ধ ধর্মের কিছুমাত্র বিস্তার হয়, তাহাও পরম লাভ। এই সমস্ত ঘটনায় শীলভদ্রের ধর্মানুরাগ, দূরদর্শিতা ও নীতি-কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার বাল্যকালের কথাও কিছু এখানে বলা আবশ্যক। পূর্বেই বলিয়াছি যে, তিনি সমতটের রাজার ছেলে, তিনি নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন, বাল্যকাল হইতে তাঁহার বিদ্যায় অনুরাগ ছিল, এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তিও খুব হইয়াছিল। তিনি বিদ্যার উন্নতির জন্য সমস্ত ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া

ত্রিশ বৎসর বয়সে নালন্দায় আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে বোধিসত্ত্ব ধর্মপাল তখন সর্বময় কর্তা। তিনি ধর্মপালের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন, এবং অল্পদিনের মধ্যে ধর্মপালের সমস্ত মত আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এই সময় দক্ষিণ হইতে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মগধের রাজার নিকট ধর্মপালের সহিত বিচার প্রার্থনা করেন। রাজা ধর্মপালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ধর্মপাল যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন। শীলভদ্র বলিলেন, আপনি কেন যাইবেন? তিনি বলিলেন, বৌদ্ধ ধর্মের আদিত্য অস্তমিত হইয়াছে, বিধর্মীরা চারিদিকে মেঘের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, উহাদিগকে দূর করিতে না পারিলে সদ্ধর্মের উন্নতি নাই। শীলভদ্র বলিলেন, আপনি থাকুন, আমি যাইতেছি। শীলভদ্রকে দেখিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হাসিয়া উঠিলেন—এই বালক আমার সহিত বিচার করিবে! কিন্তু শীলভদ্র অতি অল্পেই তাঁহাকে সম্পূর্ণ-রূপে পরাস্ত করিয়া দিলেন। তিনি শীলভদ্রের না যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিলেন, না বচনের উত্তর দিতে পারিলেন। লজ্জায় অধোবদন হইয়া তিনি সভা ত্যাগ করিয়া গেলেন। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে একটী নগর দান করিলেন। শীলভদ্র বলিলেন, আমি যখন কাষায় গ্রহণ করিয়াছি, তখন অর্থ লইয়া কি করিব? রাজা বলিলেন, বুদ্ধদেবের জ্ঞানজ্যোতি তো নির্বাণ হইয়া গিয়াছে, এখন যদি আমরা গুণের পূজা না করি, তবে ধর্ম-রক্ষা কিরূপে হইবে? আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না। তখন শীলভদ্র তাঁহার কথায় রাজী হইয়া নগরটী গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার রাজস্ব হইতে একটী প্রকাণ্ড সঙ্ঘারাম নির্মাণ করিয়া দিলেন। য়ুআন্-চুআং এক জায়গায় বলিতেছেন যে, শীলভদ্র বিদ্যা, বুদ্ধি ধর্মানুরাগ, নিষ্ঠা প্রভৃতিতে প্রাচীন বৌদ্ধগণকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন।

তিনি দশ-কুড়ি খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি যে-সকল টীকা-টিপ্পনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি পরিষ্কার, ও তাহার ভাষা অতি সরল।

য়ুআন্-চুআং-এর গুরু শীলভদ্র বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব-শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত অতি বিরল। ইহা বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় কিনা তাহা আপনারাই বিবেচনা করিবেন।

১ বসুবন্ধু—বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক ও চিন্তানেতা। গুপ্ত-বংশীয় সম্রাটদের আমলে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে জীবিত ছিলেন। "অভিধর্ম-কোষ" ইঁহার রচিত একখানি প্রধান গ্রন্থ। ইহার এক ব্যাখ্যা লেখেন যশোমিত্র।

২ য়ুআন্-চুআং—বিখ্যাত চীনা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজক, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইঁহার নাম উত্তর-চীনে Yuan Chuang 'য়ুআন্ চুআং' রূপে ও দক্ষিণ-চীনে Hiuen Tsang 'হিউএন্-ৎসাঙ' রূপে উচ্চারিত হয়, তজ্জন্য ইংরেজী ও বাঙ্গালাতে এই এক-ই ব্যক্তির নাম দুই বিভিন্ন রূপে মিলে।

৩ সমতট—দক্ষিণ ব-দ্বীপ (delta)।

৪ নালন্দা—বিহার প্রদেশের বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়—অধুনা এই বিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ বিহার-শরীফ নগরের দক্ষিণে ও রাজগির পাহাড়ের উত্তরে বড়গাঁও ও নালনগ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীনকালে এই বিদ্যামন্দিরে ভারতের বাহির হইতেও বিদ্যার্থীরা বৌদ্ধ ও ভারতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসিতেন।

৫ মহাযান—বৌদ্ধ ধর্মের দুইটী প্রধান শাখা—উত্তরে মহাযান (নেপাল, ভোট বা তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া, টংকিং ও আনাম-এ প্রচলিত) ও দক্ষিণে হীনযান (সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম ও কম্বোজে প্রচলিত)।

৬ সদ্‌ধর্ম (সদ্ধর্ম)—বৌদ্ধধর্মের একটী নাম।

৭ কামরূপে—বর্তমান আসামের পূর্ব অঞ্চল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমে কুমাররাজ ভাস্করবর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ রাজা কামরূপে রাজত্ব করিতেন। পুরাতন বাঙ্গালায় 'কামরূ', মধ্য-যুগের বাঙ্গালায় তাহা হইতে কাউঁর ('কাউঁর-কামাখ্যা')।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতিশ

[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান 'অতিশ' প্রাচীন বাঙ্গালার একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, এবং সেই সঙ্গে তিনি একজন কৃতকর্মা ধর্মনেতা-ও ছিলেন। ১৩০৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে ভোট-দেশ বা তিব্বতে আহূত হইয়া সেই দেশে গিয়া বৌদ্ধধর্ম-সংঘকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া দেন। তিব্বতীরা এখনও উঁহার স্মৃতির পূজা করে, উঁহাকে দেবতার সম্মান দেয়। উঁহার জীবন-কথার সহিত বাঙ্গালী-মাত্রেরই পরিচয় থাকা উচিত।

বাঙ্গালা দেশের আর এক গৌরব—দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তাঁহার নিবাস পূর্ব-বঙ্গে বিক্রমণীপুর[১]। তিনি ভিক্ষু হইয়া বিক্রমশীল[২] বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হন। সে সময়ে মঠের অধ্যক্ষ তাঁহাকে সুবর্ণ-দ্বীপে[৩] প্রেরণ করেন। তিনি সুবর্ণ-দ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কার করিয়া প্রসিদ্ধ হন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিলে, তিনি বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ হন। তখন নালন্দার চেয়ে-ও বিক্রমশীলের খ্যাতি-প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। অনেক বড় বড় লোক, অনেক বড় বড় পণ্ডিত, বিক্রমশীল হইতে লেখাপড়া শিখিয়া, শুধু ভারতবর্ষে নয়, তাহার বাহিরে-ও গিয়া, বিদ্যা ও ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বিক্রমশীল বিহারের রত্নাকর শান্তি একজন খুব তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি নৈয়ায়িক ছিলেন; প্রজ্ঞাকরমতি, জ্ঞানশ্রী ভিক্ষু প্রভৃতি বহু গ্রন্থকার ও পণ্ডিতের নাম বিক্রমশীলের মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। এইরূপ বিহারের অধ্যক্ষ হওয়া অনেক সৌভাগ্যের কথা। দীপঙ্কর অনেক সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্য যানাবলম্বীদিগের সহিত ঘোরতর বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন, ও তাহাতে জয়লাভ করিতেন।

এই সময়ে তিব্বত দেশে বৌদ্ধ ধর্ম লোপ পাইয়া আসে ও বোন্-পার[৪] দল খুব প্রবল হইয়া উঠে। তাহাতে ভয় পাইয়া তিব্বত দেশের রাজা, বিক্রমশীল বিহার হইতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। দীপঙ্কর দুই এক বার যাইতে অসম্মত হইলেও বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া পরিণামে তথায় যাইতে স্বীকার করেন। তিনি যাইতে স্বীকার করিলে, তিব্বতরাজ অনেক লোকজন দিয়া তাঁহাকে সসম্মানে আপন দেশে লইয়া যান। যাইবার সময় তিনি অনেকদিন নেপালে স্বয়ম্ভুক্ষেত্রে বাস করেন। তথা হইতে বরফের পাহাড় পার হইয়া তিনি তিব্বতের সীমানায় উপস্থিত হন। যিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া নিজ দেশে লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার রাজধানী পশ্চিম তিব্বতে ছিল। যে সকল বিহারে তিনি বাস করিয়াছিলেন, সে সকল বিহার এখনও লোকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করে। ফ্রাঙ্কে সাহেব যে আর্কিয়লজিকাল রিপোর্ট[৫] বাহির করিয়াছেন, তাহাতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতিশের কর্মক্ষেত্র সকল বেশ ভাল করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। অতিশ যখন তিব্বত দেশে যান তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭০ বৎসর। এইরূপ বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তিব্বতে গিয়া অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, এবং তখনকার অনেক লোককে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাহার পরে তিব্বতে নানা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদয় হইয়াছে। তিব্বতে যে কখনও বৌদ্ধ ধর্ম লোপ পাইবে এরূপ আশঙ্কা আর নাই। তিনি তিব্বতে মহাযান মতেরই প্রচার করেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, তিব্বতীরা বিশুদ্ধ মহাযান ধর্মের অধিকারী নয়; কেন না, এখনও তাহারা দৈত্য-দানবের পূজা করিত; তাই তিনি অনেক বজ্র-যান ও কালচক্র-যানের[৬] গ্রন্থ তর্জমা করিয়াছিলেন, ও অনেক পূজা-পদ্ধতি ও স্তোত্রাদি লিখিয়া-

ছিলেন; তাঞ্জুর কাটালগে' প্রতি পাতেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতিশের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। অনেকে মনে করেন তিব্বতীয়-দিগের যা কিছু বিদ্যা, সভ্যতা—এ সমুদায়ের মূল কারণ তিনিই। এরূপ লোককে যদি বাঙ্গালার গৌরব মনে না করি, তবে মনে করিব কাহাকে?

১ বিক্রমণীপুর—অধুনা ঢাকা জেলায় অবস্থিত 'বিক্রমপুর'-এর নামান্তর। পূর্ব বঙ্গের বিখ্যাত স্থান। রামপাল গ্রামে বিক্রমপুর নগরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।

২ বিক্রমশীল বিহার—নামান্তর 'বিক্রমশিলা' বিহার। বিহার প্রদেশের অন্যতম বৌদ্ধ জ্ঞান-কেন্দ্র হিসাবে ইহার নাম। বিক্রমশিলা কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা এখন ঠিক-মত জানা যায় না—তবে রাজগির ও নালন্দার মধ্যে 'শিলাও' গ্রাম বিক্রমশিলার স্থান হইতে পারে।

৩ সুবর্ণ-দ্বীপ—সুমাত্রা দ্বীপ। খ্রীষ্টাব্দ প্রথম সহস্রকে ভারতের সহিত 'দ্বীপময় ভারত' অর্থাৎ সুবর্ণ-দ্বীপ বা সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতির বিশেষ সংযোগ ছিল। ঐ সব স্থান, এবং মালয় উপদ্বীপ, শ্যাম, কম্বোজ ও চম্পা, তখন ধর্মে, সভ্যতায় ও জীবন-পদ্ধতিতে ভারতবর্ষের অংশ হইয়া গিয়াছিল। দীপঙ্কর সুবর্ণদ্বীপে একজন বিখ্যাত মহাযান পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন।

৪ বোন্‌-পা—ভোট বা তিব্বতীয়া খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে যে ধর্ম পালন করিত তাহার নাম ছিল 'Bon' 'বোন্‌'। নানাপ্রকার দৈত্য-দানব ভূত-প্রেত পূজা এবং মন্ত্র-জপ প্রভৃতি উহার মুখ্য স্বরূপ ছিল। এই ধর্মের অনেক আচার-অনুষ্ঠান তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। 'বোন্‌' ধর্ম যাহারা মানে তিব্বতী ভাষায় তাহাদের বলে 'বোন্‌-পা'।

৫ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ (Archaeological Department) নামক সরকারী কার্যবিভাগ হইতে জরমান মিশনারী পণ্ডিত Franke (ফ্রাঙ্কে) পশ্চিম-তিব্বত ভ্রমণ করিয়া দীপঙ্করের যাত্রাপথ ধরিয়া একটী 'রিপোর্ট' বা বিবরণী প্রকাশ করিয়া-

ছিলেন। সম্প্রতি Giuseppe Tucci (জুসেপ্পে তুচ্চি) নামে বিখ্যাত ইটালীয় পণ্ডিত-ও অনুরূপ অনুসন্ধান প্রকাশিত করিয়াছেন।

৬ বজ্র-যান ও কালচক্র-যান—বাঙ্গালা দেশে ও নেপালে প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের পরিণতি বা শেষ বিকাশ হয়, পূজা, মন্ত্র-জপ ও নানাপ্রকার অনুষ্ঠানমূলক এই দুই সম্প্রদায়ে। উত্তর-ভারত তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইবার কিছু পূর্বে বজ্র-যান ও কালচক্র-যান পূর্ব-ভারতের বৌদ্ধদের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং বাঙ্গালা দেশ হইতে নেপাল হইয়া তিব্বতেও প্রসৃত হয়।

৭ তিব্বতীরা সংস্কৃত, প্রাকৃত ইত্যাদি ভারতীয় ভাষা হইতে নিজেদের ভাষায় নিজেরা ও ভারতীয় পণ্ডিতদের সাহায্যে যে সকল বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুবাদ করে, সেগুলিকে তাহাদের ভাষায় বলিত Bstan-hgyur (আধুনিক উচ্চারণে Tan-jur) এবং এই সব শাস্ত্রের যে টীকা তাহারা নিজ ভাষায় লিখে তাহার নাম দেয় Bkah ghyur (বা Kan-jur)। এই 'তাঞ্জুর' ও 'কাঞ্জুর' লইয়াই বিরাট তিব্বতী বৌদ্ধ সাহিত্য। ফরাসী পণ্ডিত Cordier (কর্দিয়ে) 'তাঞ্জুর'-গ্রন্থাবলীর এক নির্ঘণ্ট বা তালিকা ('কাটালগ') ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত করেন। শাস্ত্রী মহাশয় এই তালিকার কথা বলিতেছেন।

শৈশব ও তাৎকালিক শিক্ষা

[রাজনারায়ণ বসু]

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬—১৯০০) উনবিংশ শতকের প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বিদ্বান্ লেখক এবং সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। শিক্ষকতা-কার্যে জীবনের বেশীর ভাগ ইনি অতিবাহিত করেন। জন্ম কলিকাতার নিকটে, মৃত্যু বৈদ্যনাথে। ইঁহার "সেকাল ও একালের কথা" এবং "আত্মচরিত" গ্রন্থদ্বয়ে বিগত শতকের বাঙ্গালী-সমাজের ইতিহাসের অনেক কথা জানা যায়। ১৩১৫ সালে (=১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত কিন্তু তাহার পূর্বে (বাঙ্গালা ১২৯৬ সালে) রচিত তাঁহার "আত্মচরিত" গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত অংশে তাঁহার শিক্ষাজীবনের কথা বলা হইয়াছে।

আমার শিক্ষা, "মা নিষাদ"[১] এবং চাণক্যশ্লোক[২], এবং "গাড—ঈশ্বর; লার্ড—ঈশ্বর, আই—আমি; ইউ—তুমি; কম্—আইস; গো—যাও"[৩]—এই সকল মুখস্থ করানো দ্বারা আরম্ভ হয়। পবিত্র বাল্মীকির পবিত্র রসনা হইতে যে অনুষ্টুপ্ ছন্দের[৪] প্রথম শ্লোক আপনা হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহাকে আশ্চর্য রসে আপ্লুত করিয়াছিল, তাহা সেকালে ছেলেকে মুখস্থ করাইয়া তাহার শিক্ষা আরম্ভ করানো হইত। আমার স্মরণ হয়, আমার জ্যেঠা মহাশয় মধুসূদন বসু, আমাকে তাঁহার হাঁটুর উপর বসাইয়া আমাকে "গাড—ঈশ্বর, লার্ড—ঈশ্বর" মুখস্থ করাইতেন। দুর্গানারায়ণ বসু, মধুসূদন বসুর পুত্র; ইনি এক্ষণে (বাঙ্গালা ১২৯৬ সালে) মেদিনীপুরে কাজ করিতেছেন। ইনি অতি সুরসিক ব্যক্তি, মেদিনীপুরে গিয়াছেন, অথচ দুর্গানারায়ণকে জানেন না, এমন লোক নাই। আমি যে গুরু মহাশয়ের কাছে পড়িতাম, তিনি বর্ধমানের একজন উগ্রক্ষত্রিয়[৫] ছিলেন, কিন্তু তিনি উগ্রস্বভাব ছিলেন না। কিন্তু আমি তাঁহাকে ভয়ানক পদার্থ বলিয়া দেখিতাম। তিনি যখন "রাজনারাণ" বলিয়া আমাকে ডাকিতেন, তখনই আমার আত্মাপুরুষ শুখাইয়া যাইত। সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে পিতাঠাকুর আমাকে শিক্ষার্থ কলিকাতায় আনেন। আনিয়া প্রথমে এক গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় আমাকে ভরতি করিয়া দেন, কিছুদিন পরে ইংরেজী শিখিবার জন্য শম্ভু মাষ্টারের[৬] স্কুলে ভরতি করিয়া দেন। এই স্কুল বৌবাজারের একটি ছোট অন্ধকার ঘরে হইত। ছাত্রের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। শম্ভু মাষ্টার অতি অল্পই ইংরেজী জানিতেন। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, ও তাঁহার নাসিকার উপর চন্দনের এক দীর্ঘ তিলক ধারণ করিতেন। তিনি অপরাহ্ণে স্কুলে আসিয়া পড়াইতেন। পূর্বাহ্ণে গ্রিক্ সাহেব আসিয়া

পড়াইতেন গ্রিফ. সাহেব শম্ভু মাষ্টারের অপেক্ষা ইংরেজী অল্প জানিতেন। কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়? একটা লাল মুখ থাকিলে যেমন স্কুলের গুমর বাড়ে, এমন আর কিছুতেই নহে। ভুল করিলে ইঁহারা 'ফেরূল' (ferule) দ্বারা ছাত্রের হাতে মারিতেন। অনেকদিন অবধি 'ফেরূল' শব্দের ব্যুৎপত্তি কি জানিতে পারি নাই; পরে একদিন লাটিন ভাষার অভিধান দেখিতে দেখিতে ferula শব্দ পাইলাম। উহা একটা কাঠের চাকতি, মস্ত বাঁটওয়ালা, উহা রোমানদিগের দ্বারা ও সেকালের ইংরেজদিগের দ্বারা ছাত্রকে দণ্ড দিবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

শম্ভু মাষ্টারের স্কুল হইতে হেয়ার সাহেবের[১] স্কুলে ভরতি হই। তখন হেয়ার সাহেবের স্কুলের নাম School Society's School ছিল। School Society দ্বারা সেকালে অনেক উপকার হইয়াছে। তাঁহাদিগের প্রকাশিত Reader-গুলি অতি উত্তম পুস্তক ছিল। স্কুলের প্রকৃত নাম School Society's School হইলে-ও, হেয়ার সাহেব উহার কর্তা ছিলেন। ইহাকে সাধারণ লোকে "হেয়ার সাহেবের স্কুল" বলিয়া জানিত। হেয়ার সাহেবের জীবন-বৃত্তান্ত সাধারণে অবগত আছেন। যাঁহারা অবগত নহেন, তাঁহাদিগকে প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রণীত Life of David Hare পড়িতে অনুরোধ করি।

যাহাতে স্কুলের বালকেরা পরিষ্কার থাকিতে যত্নবান্ হয়, তজ্জন্য হেয়ার সাহেব মধ্যে মধ্যে স্কুলের ছুটি হইবার সময়ে স্কুলের ফটকে একটা তোয়ালিয়া ও বেত হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। প্রত্যেক বালকের গা তোয়ালিয়া দ্বারা কষিয়া ক্ষণেক রগড়াইতেন। যদি ময়লা বাহির হইত, তাহা হইলে তাহাকে দুই-এক ঘা বেত কষাইয়া দিতেন। তিনি বালকদিগকে গা পরিষ্কার করিবার

জন্য সাবান দিতেন। প্রতি শনিবারে তাঁহাকে লেখা দেখাইতে হইত। তিনি লিখিবার বিষয় যে সকল উপদেশ দিতেন, সেই রূপে না লিখিলে-ও দুই এক ঘা বেত কষাইয়া দিতেন। তিনি একটী অক্ষর বড় ও একটী অক্ষর ছোট হইলে বড় রাগ করিতেন। আমার ভাগ্য-ক্রমে কখন তাঁহার নিকট হইতে আমি বেত খাই নাই। কিন্তু আমি তাঁহার বেত্র-চালনৈষণা নিবারণ করিবার জন্য, বেত খাইয়া একটী ছাত্রের আত্মহত্যার গল্প আমার তখনকার ইংরেজীতে লিখিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার ঐ গল্প হইতে তিনি উপদেশ লাভ করিবেন; কিন্তু করিলেন না। যখন আমি এই কার্য করি, তখন আমার বয়স এগার কি বার। এই কার্যের জন্য আমি নিজে বেত খাই নাই, এক্ষণে তাহা আমার পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করি।

আমার চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়ি। হেয়ার সাহেব আমাদিগের বক্তৃতা-শক্তি ও রচনা-শক্তি উন্নত করিবার অভিপ্রায়ে একটী Debating Club বা বিতর্ক-সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আমি তাহাতে Whether Science is preferable to Literature এই বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করি। যদ্যপি আমার Mathematics বা গণিত ভাল লাগিত না, তথাপি আমার প্রবন্ধে আমি তাহাকেই সাহিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা অর্পণ করিয়াছিলাম। আমি আমার প্রবন্ধে যেরূপ রচনা-শক্তি ও নিঃস্বার্থ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে হেয়ার সাহেব আমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, আমার উপর তাঁহার অতিশয় স্নেহ জন্মিয়াছিল। তিনি পিতার ন্যায় স্নেহপূর্বক আমাকে বলিতেন যে, "কত শীঘ্র তুমি বাড়িতেছ (How fast you are growing)!" একবার জর

হওয়াতে, আমি তাঁহাকে সংবাদ না দেওয়াতে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সংবাদ দিলে তিনি অবশ্য আমাকে ডাক্তার ও ঔষধ সঙ্গে লইয়া দেখিতে আসিতেন।

হেয়ার সাহেবের স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে যখন আমি পড়ি, তখন আমাদিগের তিনজন শিক্ষক ছিলেন। একজনের নাম দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর একজনের নাম উমাচরণ মিত্র, তৃতীয়ের নাম রাধা-মাধব দে। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা। ইনি পরে কলিকাতায় একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার হইয়াছিলেন। উমাচরণ মিত্র জনাই[৮] নিবাসী ছিলেন। রাধামাধবের বাটী কলিকাতার চাঁপাতলায় ছিল। উমাচরণ হেডমাষ্টার ছিলেন। দুর্গাচরণের নিকট আমরা যে কত উপকৃত, তাহা বলিতে পারি না। তিনিই আমাদিগের মনে জ্ঞানের ইচ্ছা এবং অনুসন্ধানের ইচ্ছার উদ্রেক করাইয়া দিয়াছিলেন; তিনিই আমাদিগের মনোমুকুলকে প্রথম প্রস্ফুটিত করেন। দোষের মধ্যে এই যে, তিনি আমাদিগের নিকট সংশয়-বাদ[৯] প্রচার করিতেন। পরকাল নাই, এবং মনুষ্য ঘটিকা-যন্ত্রের ন্যায়, এইরূপ উপদেশ দিতে দিতে, যদি উমাচরণ আসিতেন তাহা হইলে বলিতেন, Let us stop for a while, Umacharan is coming। উমাচরণ আস্তিক ছিলেন, তিনি সংশয়-বাদ ভাল-বাসিতেন না। উমাচরণ আমাদিগের নিকট Scott's Ivanhoe, Pope's Poems, Prior's Henry and Emma[১০] এবং ইংরেজী ভাষার অন্যান্য গদ্য পদ্য কাব্য উত্তমরূপে পাঠ এবং ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগের মনে ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দিয়া-ছিলেন। তিনি যেরূপ ঐ সকল কাব্য পড়িতেন, তাহা কখন ভুলিবার নহে। যে-সকল গদ্য পদ্য কাব্য তিনি আমাদিগের নিকট পড়িতেন,

তাহা ক্লাসের পাঠ্য পুস্তক ছাড়া একালের কোন শিক্ষক কি এরূপ ভাবে পড়িয়া থাকেন? আর পড়িবার জো নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালী দ্বারা তাঁহাদের হস্ত-পদ বাঁধা।

রাধামাধব আমাদিগকে গণিত শিখাইতেন। চিরকালই আমি গণিত-বিদ্বেষী। গণিতের পুস্তক দেখিলে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইত। এই রোগকে 'গণিতাতঙ্ক' রোগ বলা যাইতে পারে। উহা জলাতঙ্ক রোগের ন্যায়। গণিতের মধ্যে বীজগণিতের প্রতি আমার অনুরাগ ছিল। গণিতের প্রতি অমনোযোগ দ্বারা রাধামাধবের মনে কতই না কষ্ট দিয়াছি। এই রাধামাধব বাবুর সহিত পরে আমার মেদিনীপুরে দেখা হয়। তখন আমি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেড-মাষ্টার। তিনি Overseer P.W.D.[১১] পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন।

হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময় আমি হস্ত-যন্ত্রে মুদ্রিত একটী সংবাদ-পত্র[১২] প্রতি সোমবার বাহির করিতাম। উহা সমস্ত হাতে লিখিয়া বাহির করিতাম। সংবাদ-পত্রে যেমন সংবাদ, সম্পাদকীয় উক্তি ও প্রেরিত পত্র থাকিত, উহাতেও সেইরূপ দস্তুর-মোতাবেক থাকিত। এই কাগজ চালানোতে আমার সমাধ্যায়ীরা আমাকে সাহায্য করিত। ঐ সংবাদ-পত্রের নাম Club Magazine ছিল। উহার নাম আমাদিগের ক্লাবের নামে রাখিয়াছিলাম। নামটী পুরাতন ইংরেজী অক্ষরে[১৩] (Old English Characters-এ) কাগজের শিরোদেশে জাজ্বল্যমানরূপে লেখা হইত। এই কাগজ দেখিয়া দুর্গাচরণ বলিয়া-ছিলেন যে, উহা নেপোলিয়ানের বাল্যকালে তুষার-দুর্গ[১৪] নির্মাণের ন্যায়। কিন্তু আমি যেরূপ বড়লোক হইব আশা করিয়াছিলেন, তাহা আমি কিছুতেই হইতে পারি নাই। আমার স্মরণ হয়, হেয়ার

স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময় ইংরেজীতে একটি Satire বা শ্লেষাত্মক কবিতা রচনা করিয়া, তাহাতে আমার প্রধান প্রধান সঙ্গীদিগকে, বিশেষতঃ একজন সুবর্ণবণিক্-জাতীয় সঙ্গীকে বিদ্রূপ করিয়াছিলাম। এই কবিতা রচনার জন্য এখন আমার অনুতাপ হইতেছে। হেয়ার সাহেবের স্কুলে থাকিতে ক্লাসের পড়া ছাড়া আমার প্রথম অতিরিক্ত পাঠের বিষয় ছিল Robinson Crusoe। ঐ পুস্তকে উল্লিখিত ঘটনা সকল মনে এমনি বিদ্ধ হইয়াছিল যে সেগুলি আমার সম্মুখে যেন ঘটিতেছে দেখিতাম। কোথায় পড়িয়াছিলাম যে বিলাতের[১৫] একটী ছাত্র হোমারের ইলিয়াড পড়িবার সময় ঐ কাব্যে[১৬] বর্ণিত ঘটনা যথার্থ ই সম্মুখে ঘটিতে দেখিত। আমার ততদুর না হউক, অনেকটা সেইরূপ বটে। ধর্ম-বিষয়ে আমার মনকে যে পুস্তক খুলিয়া দেয়, তাহার নাম Travels of Cyrus by Chevalier Ramsay। উহা ফরাসিস্[১৭] ভাষা হইতে অতি সহজ ইংরেজীতে অনুবাদিত। বইটি কিন্তু মস্ত। যেখানে মিশর দেশের পুরোহিতেরা সাইরস[১৮] রাজাকে বুঝাইতেছে যে মিসরীয় পুরাণ কেবল রূপক[১৯] মাত্র, সেই স্থানে পড়িয়া আমার প্রতীতি হইল যে, হিন্দু ধর্মের পুরাণও ঐরূপ।

ইংরেজী ১৮৪০ সালে আমি হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে হিন্দু কলেজে ভরতি হই। তখন মধ্যে মধ্যে হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে বালকগণ হিন্দু কলেজে বিনা বেতনে ভরতি হইত। হেয়ার সাহেব বঙ্গদেশে 'ইংরেজী শিক্ষার পিতা'[২০] বলিয়া তাঁহার সম্মানার্থ কলেজের অধ্যাপকেরা ইহাদিগের নিকট হইতে বেতন লইতেন না। এই প্রকার বালকদিগকে হিন্দু কলেজের ছোকরারা "বড়ে"[২১] বলিত। কেন "বড়ে" বলিত, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। হেয়ার সাহেব

তাঁহার স্কুল হইতে তাহাদিগকে বড়ের মতন কলেজে চালিয়া দিতেন, এই জন্য; কিংবা বালকেরা দরিদ্র বলিয়া, তাহারা কলেজের বড়মানুষ ছাত্রদিগের কল্পনানুসারে, বড়ি ভাতে দিয়া ভাত খাইয়া তাহাদিগের বড়মানুষ সমাধ্যায়ী অপেক্ষা সকাল সকাল কলেজে আসিতে সমর্থ হইত, এই বলিয়া তাহারা উক্ত বড়মানুষ ছাত্রদিগের নিকট হইতে, তাহাদিগের নিকট অগৌরব কিন্তু প্রকৃত-রূপে গৌরব-সূচক এই উপাধি লাভ করিয়াছিল কিনা, তাহা বলিতে পারি না।

আমি প্রথমে হিন্দু কলেজের থার্ড ক্লাসে (অর্থাৎ তাহার স্কুল বিভাগের প্রথম ক্লাসে) ভরতি হই। সেই বৎসরই অনেক পুস্তক প্রাইজ পাই। সেই বৎসর গভর্ণমেণ্ট-সংস্থাপিত General Committee of Public Instruction-এর সেক্রেটারী Dr. Wise (ডাক্তার ওয়াইজ) আমাদিগকে মিল্টনের পরীক্ষা করেন। তাহার পর সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়া ৩০ টাকার সিনিয়র স্কলারশিপ (সেই বৎসরই উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি প্রথম নির্দ্ধারিত হয়) পাইয়া প্রথম শ্রেণীতে উঠি। দুই বৎসর উক্ত স্কলারশিপ ভোগ করি। তাহার পর ৪০ টাকার ছাত্র-বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া দুই বৎসর তাহা ভোগ করিয়া কলেজ পরিত্যাগ করি। তখন সর্বোত্তম ছাত্রদিগের প্রদত্ত পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইত, এবং টাউন হলে গবর্ণর-জেনারেল[২২] আসিয়া স্বহস্তে অতি নিম্নশ্রেণীর বালকদিগকে পর্যন্ত পারিতোষিক বিতরণ করিতেন। দুই-এক বার সাহিত্য, পুরাবৃত্ত ও ধর্মনীতিতে আমার প্রদত্ত উত্তর সংবাদ-পত্রে ছাপা হয়। ধর্মনীতিতে একটা রৌপ্য-মেডেল প্রাপ্ত হই। তখন Bengal Herald নামক একটী সংবাদ-পত্র ছিল, তাহা History of the Sepoy Mutiny এবং History of the Afghan

War প্রণেতা Lieutenant[২৩] William Kaye (ইহার পরে তিনি Sir[২৪] William Kaye হয়েন) সম্পাদন করিতেন।

১ "মা নিষাদ"—কথিত আছে যে রামায়ণ-কার কবি বাল্মীকি এক ব্যাধকে একজোড়া ক্রৌঞ্চ-পক্ষীর (কোঁচ-বকের) একটীকে বাণ দিয়া মারিয়া ফেলিতে দেখিয়া ক্রোধে ও দুঃখে আত্মহারা হইয়া ব্যাধকে ভৎর্সনা করেন। তাঁহার মুখ হইতে তখন অবলীলা ক্রমে এই সংস্কৃত কবিতাটী বাহির হয়—ইহা তাঁহার মুখ-নিঃসৃত প্রথম কবিতা :—

মা নিষাদ ! প্রতিষ্ঠাং ত্বম্ অগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ-মিথুনাদ্ একম্ অবধীঃ কামমোহিতম্॥

[অর্থাৎ—হে নিষাদ ! তুমি কোন কালেই প্রতিষ্ঠা বা সম্মান পাইবে না, কারণ তুমি এই কোঁচ-বকের জুড়ির মধ্যে অপরটীর প্রতি আসক্ত একটীকে মারিয়া ফেলিলে।]

বাল্মীকিকে 'আদি কবি' বলা হয়। রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত আদি মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত; আদি কবির মুখের প্রথম শ্লোক বা কবিতা পাঠ করানো শিক্ষার্থী শিশুর পক্ষে মঙ্গল-দায়ক হইবে মনে করা হইত।

২ চাণক্য-শ্লোক—চাণক্য (অপর নাম বিষ্ণুগুপ্ত, কৌটল্য বা কৌটিল্য) মৌর্য-বংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন। 'অর্থশাস্ত্র' নামে রাজনীতি ও রাজ্য-পরিচালন সম্বন্ধে ইঁহার একখানি বিখ্যাত সংস্কৃত বই আছে। কতকগুলি নীতি-বিষয়ক সংস্কৃত শ্লোক ইঁহার লেখা বলিয়া পরিচিত। পূর্বে বাঙ্গালী ছেলেরা মাতৃভাষায় অ আ, ক খ আরম্ভ করিবার সময়েই চাণক্যের লেখা এই সংস্কৃত শ্লোকগুলি মুখস্থ করিত।

৩ গাড—লার্ড=God, Lord; এখন আমরা অ-কার দিয়া 'গড, লর্ড' বলি ও লিখি। 'কালেজ' সম্বন্ধে টিপ্পনী দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৪৯।

৪ অনুষ্টুপ্ ছন্দ—সংস্কৃত ভাষায় এক অতি সাধারণ ছন্দ। দুই ছত্রে ১৬ অক্ষর করিয়া ৩২ অক্ষরে ইহা পুরা হয়। এই ৩২ অক্ষরের শ্লোককে ৮ অক্ষর করিয়া চারিটী 'পাদ' বা পায়ে বিভাগ করা হয়। উপরে প্রদত্ত বাল্মীকি-শ্লোকটী অনুষ্টুপ্ ছন্দে গঠিত। বাল্মীকি অজানিত-ভাবে এই ছন্দে শ্লোকটী রচনা করিয়া নিজেই আশ্চর্যান্বিত হইয়া গিয়াছিলেন।

৫ উগ্রক্ষত্রিয়—পশ্চিম-বঙ্গের একটী প্রধান হিন্দু জাতি, মুখ্যতঃ কৃষিজীবী।

৬ মাষ্টার—ইংরেজী Master। 'মাষ্টার' শব্দটী বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালা শব্দ হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ আজ-কাল এই বাঙ্গালা 'মাষ্টার' শব্দটিকে 'ষ্ট' দিয়া না লিখিয়া, নূতন সংযুক্ত বর্ণ 'স্‌ট' দিয়া লিখিতেছেন। ইহা ভুল, কারণ ইংরেজীতে st='স্‌ট' হইলেও, বাঙ্গালায় প্রবেশ-লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই st='স্‌ট' উচ্চারণ sht='ষ্ট' হইয়া গিয়াছে। তদ্রূপ ইংরেজীতে school 'স্কুল' শব্দ বাঙ্গালায় 'ইস্কুল' হইয়া গিয়াছে।

৭ হেয়ার সাহেব—স্বনামধন্য David Hare ডেভিড্ হেয়ার (১৭৭৫—১৮২৪ খ্রীঃ)। স্কটলাণ্ড হইতে কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করেন। ঘড়ীর কারবার করিতেন। এদেশে বাঙ্গালী ছেলেদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রাণ দিয়া পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার Hare School ইঁহার নামের স্মৃতি বজায় রাখিয়াছে।

৮ জনাই—হুগলী জেলার একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। (বস্তুতঃ ইঁহাদের বাস জনাইয়ের সংলগ্ন বাক্‌সা গ্রামে ছিল।)

৯ সংশয়-বাদ—scepticism : চোখ কান ও অন্য ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা ধরিতে পারা যায় না, যাহার সম্বন্ধে বিশ্বাস ও অনুভূতি মাত্র করা যাইতে পারে, সে-রূপ বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে (অর্থাৎ ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে) সন্দেহ করা।

১০ Scott's Ivanhoe ইত্যাদি—Sir Walter Scott, স্কটলাণ্ড-বাসী বিখ্যাত ইংরেজ কবি ও ঔপন্যাসিক রচিত Ivanhoe 'আইভ্যান্‌হো' নামক উপন্যাস। Pope পোপ ও Prior প্রায়র অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ কবি ছিলেন।

১১ Overseer, P. W. D.—Public Works Department অর্থাৎ সরকারী পূর্ত-বিভাগের পরিদর্শক, engineer বা পূর্তকারের অধস্তন কর্মচারী।

১২ হস্তযন্ত্রে-মুদ্রিত সংবাদপত্র—'হাতে-লেখা' স্থলে রহস্য করিয়া বলা হইয়াছে 'হস্তযন্ত্রে মুদ্রিত'। 'সংবাদ'—এই শব্দ আগে ভুল করিয়া 'সম্বাদ' রূপে লেখা হইত, রাজনারায়ণও তাঁহার বইয়ে 'সম্বাদ' লিখিয়াছেন। শব্দটীতে যে ম-কার আছে, তাহা মূলে অনুস্বারই ছিল, এবং অন্তঃস্থ 'ব'-এর পূর্বে বলিয়া, সংস্কৃতে অনুস্বারই থাকিত, 'ম' হইত না।

১৩ Old English Characters—প্রাচীন কালে ইংরেজীর হাতে-লেখা পুঁথিতে এক-প্রকার মোটা ছাঁদের অক্ষর ব্যবহৃত হইত—হাঁসের পালকের কলমে

লেখা হইত। বাঙ্গালা দেশে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিকপত্রগুলির শিরোনামা এই ধাঁজের অক্ষরে মুদ্রিত হয়। এই ছাঁদের অক্ষরের আর একটী নাম black-letter। জরমান ভাষা সাধারণতঃ এই ছাঁদের অক্ষরেই মুদ্রিত হয়।

১৪ তুষার-দুর্গ—উত্তর-ইউরোপের যে-সকল দেশে শীতকালে বরফ পড়ে, আকাশ হইতে পতিত সেই গুঁড়া বরফ বা তুষারের স্তূপ লইয়া সে-সব দেশের ছেলেরা মানুষের মূর্তি ঘর-বাড়ী ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া খেলা করে। ফরাসী বীর ও সম্রাট্ নেপোলিয়ন বাল্যকালে এই বরফ লইয়া দুর্গ তৈয়ারী করিতেন।

১৫ বিলাত—ইউরোপ, এবং বিশেষ করিয়া ইংলাণ্ড। আরবী wilayat 'বিলায়ৎ' অর্থে wali 'বলী' বা শাসনকর্তার অধীন প্রদেশ। আফগানিস্থান যখন ভারতের মোগল সম্রাট্দের অধীন ছিল, তখন বিশেষ করিয়া ঐ দেশকে 'বিলায়ৎ' বা 'প্রদেশ' বলা হইত। তাহা হইতে 'ভারত-বহিভূর্ত দেশ' বা 'বিদেশ' অর্থে এই শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়। (তুলনীয়—'বিলাতী পানী, বিলাতী কুমড়া')। 'বিদেশ' হইতে 'সুদূর বিদেশ', ও 'ইউরোপ'—এই অর্থের বিকাশ।

১৬ হোমারের ইলিয়াড্—(Homer, Iliad) আমাদের দেশের মহাভারত ও রামায়ণের মত প্রাচীন গ্রীসে দুইখানি জাতীয় মহাকাব্য ছিল—Ilias বা Iliad এবং Odusseia 'ওদুস্‌সেইআ' বা Odyssey 'অডিসি'। এই কাব্য দুইখানি Homer 'হোমের' নামক মহাকবি দ্বারা রচিত হয়, প্রাচীন কাল হইতেই এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এই মহাকাব্য দুইখানি খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতকে রচিত হইয়াছিল।

১৭ ফরাসিস্—ফরাসী, ফ্রেঞ্চ। ফরাসী Francais 'ফ্রাঁসে', পোর্তুগীস Francese 'ফ্রান্সেসে' হইতে বাঙ্গালা 'ফরাসিস্' ও 'ফরাসী'।

১৮ সাইরস্—প্রাচীন পারস্যে 'কুরুষ্' (অর্থাৎ 'কুরুঃ') নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, ইনি খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকে রাজত্ব করেন। মিসর-দেশ ইনি জয় করেন; গ্রীকেরা 'কুরুষ্'কে Kuros 'কুরোস' রূপে লিখিত; রোমানেরা এই নাম বিকৃত করিয়া বলিত Cyrus 'কিরুস'; এই নাম ইংরেজীতে আরও বিকৃত করিয়া 'সাইরস্' রূপে উচ্চারিত হয়। 'কুরু' বা সাইরস্-এর কাহিনী অবলম্বন করিয়া উল্লিখিত ফরাসী বইখানি রচিত হয়।

১৯ রূপক—পুরাণ-বর্ণিত দেব-দেবীর কাহিনীকে সত্য ঘটনা মনে না করিয়া আধ্যাত্মিক ঘটনার কাল্পনিক রূপ বলিয়া মনে করা।

২০ ইংরেজী শিক্ষার পিতা—Father of English Education-এর বঙ্গানুবাদ।

২১ বড়ে—সংস্কৃত 'বটিকা'—প্রাকৃত 'বডিআ'—বাঙ্গালা 'বড়ী', তাহাতে আ-প্রত্যয় যোগে 'বড়িয়া, ব'ড়ে'। দাবা খেলিবার ঘুঁটি (পদাতিক)।

২২ গবর্ণর-জেনারেল—বড় লাট সাহেব—সমগ্র ভারতের রাজপ্রতিনিধি। কলিকাতা তখন সমগ্র ভারতের রাজধানী ছিল, ভারতের বড়-লাট ও বাঙ্গালার ছোট-লাট দুইজনেই তখন কলিকাতায় থাকিতেন।

২৩ Lieutenant শব্দটী ফরাসীর lieu-tenant—ইহার অর্থ, 'স্থলাভিষিক্ত' সেনানায়কের পদ যিনি অধিকার করিয়া থাকেন। শব্দটীর ইংরেজী উচ্চারণ লক্ষণীয়—'লেফ্‌টেনাণ্ট'।

২৪ Sir—ইংলাণ্ডের রাজপ্রদত্ত সম্মান-বিশেষকে knighthood বলে; যাঁহারা এই সম্মান পান তাঁহাদের বলে knight (নাইট্), এবং তাঁহাদের নামের আগে Sir 'স্যর্' অর্থাৎ 'মহাশয়' এই পদবী সর্বদা ব্যবহৃত হয়। (সম্বোধন-কালে তাঁহাদের প্রথম নামের বা ব্যক্তিগত নামের সঙ্গে Sir শব্দ প্রযুক্ত হয়, কৌলিক উপাধির সঙ্গে কদাচ নহে। Sir William Kaye-কে Sir William বলিয়া উল্লেখ বা আহ্বান করিতে হইবে, কদাচ Sir Kaye বলিয়া নহে; তদ্রূপ Sir Rabindranath (Tagore), Sir Sarvapalli (Radhakrishnan)—কদাচ Sir Tagore, Sir Radhakrishnan নহে।)

হিমালয়-ভ্রমণ

[দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫) মহাকবি রবীন্দ্রনাথের পিতা। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ধনী বংশে ইঁহার জন্ম, কিন্তু শৈশব হইতেই ইঁহার জীবনে উচ্চ ধর্মভাবের প্রকাশ হয়। রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক প্রচারিত উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য একেশ্বরবাদের প্রতি ইঁনি আকৃষ্ট হন, এবং যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই হিন্দু ধর্মের এই বিশিষ্ট এবং সুপ্রাচীন মত প্রচারিত করিতে আত্ম-নিয়োজিত হন। ইঁহার চেষ্টায় বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ-সভা সুগঠিত হয়। প্রাচীন ভারতের উপনিষদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ইঁনি 'তত্ত্ববোধিনী-সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা' স্থাপিত করেন, এবং নানা পুস্তক-পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এক দিকে ধর্ম-জীবন ও অন্য দিকে সাংসারিক-জীবন, উভয়-ই সুচারুরূপে পালন করেন। ইঁহার আত্ম-জীবন-চরিতে ধর্মবিষয়ে নিজের মনের বিকাশ এবং বিচার ও তাহার সঙ্গে-সঙ্গে জীবনের ঘটনাবলী ইঁনি অতি সরলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই বই ১৮১৬ শকাব্দে (=১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত হয়, কিন্তু উহা এই তারিখের বহু পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ও ফারসী উভয় ভাষাই জানিতেন, এবং পারস্যের ভক্ত সূফী কবি হাফেজের ভগবদ্ভক্তি-বিষয়ক পদ প্রায়-ই আবৃত্তি করিতেন। ইঁহার মহান্ ধর্ম-ভাবের জন্য লোকে ইঁহাকে 'মহর্ষি' আখ্যা দেয়।

আমি শিমলাতে ফিরিয়া কিশোরীনাথ চাটুজ্যেকে[১] বলিলাম, "আমি সপ্তাহের মধ্যে আরো উত্তর দিকে উচ্চ উচ্চ পর্বত ভ্রমণে যাইব। আমার সঙ্গে তোমাকে যাইতে হইবে। আমার জন্য একটা ঝাঁপান[২] ও তোমার জন্য একটা ঘোড়া ঠিক করিয়া রাখ।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাহার উদ্যোগে সে চলিল। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ দিবস শিমলা হইতে যাত্রা করিবার দিন স্থির ছিল। আমি সে দিবস অতি প্রত্যূষে উঠিয়া

যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার ঝাঁপান আসিয়া উপস্থিত, বাঙ্গী-বরদারেরা[৩] সব হাজির। আমি কিশোরীকে বলিলাম, "তোমার ঘোড়া কোথায়?" "এই এলো ব'লে, এই এলো ব'লে" বলিয়া সে ব্যস্ত হইয়া পথের দিকে তাকাইতে লাগিল। এক ঘণ্টা চলিয়া গেল, তবু তাহার ঘোড়ার কোন খবর নাই। আমার যাইবার এই বাধা ও বিলম্ব সহ্য হইল না। আমি বুঝিলাম যে, অধিক শীতের ভয়ে আরো উত্তরে কিশোরী আমার সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছুক। আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি মনে করিতেছ যে, তুমি আমার সঙ্গে না গেলে আমি একাকী ভ্রমণে যাইতে পারিব না। আমি তোমাকে চাই না, তুমি এখানে থাক। তোমার নিকট পেঁটরার ও বাক্সর যে সকল চাবি আছে তাহা আমাকে দাও।" আমি তাহার নিকট হইতে সেই-সকল চাবি লইয়া ঝাঁপানে বসিলাম। বলিলাম, "ঝাঁপান উঠাও।" ঝাঁপান উঠিল; বাঙ্গী-বরদারেরা বাঙ্গী[৩] লইয়া চলিল; হতবুদ্ধি কিশোরী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি আনন্দে ও উৎসাহে বাজার দেখিতে দেখিতে শিমলা ছাড়াইলাম। দুই ঘণ্টা চলিয়া একটা পর্বতে যাইয়া দেখি, তাহার পার্শ্ব-পর্বতে যাইবার সেতু ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, আর চলিবার পথ নাই। ঝাঁপানীরা ঝাঁপান রাখিল। আমার কি তবে এখান হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে? ঝাঁপানীরা বলিল, "যদি এই ভাঙ্গা পুলের কার্নিস[৪] দিয়া একা-একা চলিয়া এই পুল পার হইতে পারেন, তবে আমরা খালি ঝাঁপান লইয়া খদ[৫] দিয়া ওপারে যাইয়া আপনাকে ধরিতে পারি।" আমার তখন যেমন মনের বেগ, তেমনি আমি সাহস করিয়া এই উপায়-ই অবলম্বন করিলাম। কার্নিসের উপরে একটীমাত্র পা রাখিবার স্থান, হাতে ধরিবার কোন দিকে কোন

অবলম্বন নাই, নীচে ভয়ঙ্কর গভীর খদ; ঈশ্বর-প্রসাদে আমি তাহা নির্বিঘ্নে লঙ্ঘন করিলাম। ঈশ্বর-প্রসাদে যথার্থই "পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্"[৬]—আমার ভ্রমণের সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল না।

তথা হইতে ক্রমে পর্বতের উপরে উঠিতে লাগিলাম। সেই পর্বত একেবারে প্রাচীরের ন্যায় সোজা হইয়া এত উচ্চে উঠিয়াছে যে, সেখান হইতে নীচে খদের কেলু-গাছকেও[৭] ক্ষুদ্র চারার মত বোধ হইতে লাগিল। নিকটেই গ্রাম। সেই গ্রাম হইতে বাঘের মত কতকগুলো কুকুর ঘেউ-ঘেউ করিয়া ছুটিয়া আইল[৮]। সোজা খাড়া পর্বত; নীচে বিষম খদ, উপরে কুকুরের তাড়া। ভয়ে-ভয়ে এ সঙ্কটে পথটা ছাড়াইলাম। দুই প্রহরের পর, একটা শূন্য পান্থশালা পাইয়া সে দিনের জন্য সেখানেই অবস্থিতি করিলাম। আমার সঙ্গে রন্ধন করিবার কোন লোক নাই। ঝাঁপানীরা বলিল, "হম্‌লোগোঁকী রোটী বড়ী মিঠী হৈ"। আমি তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের মকা[৯] ও যব মিশ্রিত একখানা রুটী লইয়া তাহার-ই একটু খাইয়া সে দিন কাটাইলাম। তাহাই আমার যথেষ্ট হইল। "রূখা সূখা গহুঁ-কা টুকড়া, লোনা অলোনা ক্যা। সির দিয়া, তো রোনা ক্যা।"[১০] খানিক পরে কতকগুলা পাহাড়ী নিকটস্থ গ্রাম হইতে আমার নিকটে আসিল, এবং নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া আমোদে নৃত্য করিতে লাগিল। ইহাদের একজনের দিকে চাহিয়া দেখি যে তাহার নাক নাই, মুখখানা একেবারে চ্যাপটা। জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমহারে মুঁহ্‌মেঁ য়হ্ ক্যা হুআ?" সে বলিল, "আমার মুখে একটা ভালুকে থাবা মারিয়াছিল।" আমার সম্মুখের একটা পথ দেখাইয়া বলিল, "ঐ পথে ভালুক আসিয়াছিল, তাহাকে তাড়াইতে যাওয়ায় সে থাবা মারিয়া আমার নাক উঠাইয়া লইয়াছে।" সে ভাঙা

মুখ লইয়া তাহার কত-ই নৃত্য, কত-ই তাহার আমোদ। আমি সেই পাহাড়ীদের সরল প্রকৃতি দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া, অপরাহ্ণে একটা পর্বতের চূড়ায় যাইয়া অবস্থান করিলাম। সেখানে গ্রামের অনেকগুলি লোক আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া বসিল। তাহারা বলিল, "আমাদের এখানে বড় ক্লেশে থাকিতে হয়। বরফের সময়ে এক-হাঁটু বরফ ভাঙ্গিয়া সর্বদাই চলিতে হয়। ক্ষেতের সময়ে শূকর ও ভালুক আসিয়া সব ক্ষেত নষ্ট করে। রাত্রিতে মাচার উপর থাকিয়া আমরা ক্ষেত রক্ষা করি।" সেই পর্বতের খাদেই তাহাদের গ্রাম। তাহারা আমাকে বলিল, "আপনি আমাদের গ্রামে চলুন, সেখানে আমাদের বাড়ীতে সুখে থাকিতে পারিবেন, এখানে থাকিলে আপনার কষ্ট হইবে।" আমি কিন্তু সেই সন্ধ্যার সময়ে তাহাদের গ্রামে গেলাম না। সে পাকদণ্ডীর[১১] পথ, বড় কষ্টে উঠিতে নামিতে হয়। আমার যাইবার উৎসাহ সত্ত্বেও দুর্গম পথ বলিয়া গেলাম না।

আমি সে রাত্রি চূড়াতেই থাকিয়া প্রভাতে সেখান হইতে চলিয়া গেলাম। এই দিন, দুই প্রহর পর্যন্ত চলিয়া ঝাঁপানীরা ঝাঁপান রাখিল। বলিল, "পথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর ঝাঁপান চলে না।" এখন কি করি? পথটা চড়াইয়ের[১২], অথচ কোন পাকদণ্ডীও নাই। ভাঙ্গা পথ, ঊর্ধ্বের দিকে কেবল পাথরের উপরে পাথরের ঢিবি পড়িয়া রহিয়াছে। এই পথ-সঙ্কট দেখিয়াও কিন্তু আমি ফিরিতে পারিলাম না। আমি সেই ভাঙ্গা পথে পাথরের উপর দিয়া হাঁটিয়া উঠিতে লাগিলাম। একজন পিছনের দিকে আমার কোমরটার অবলম্বন হইয়া ধরিয়া রহিল। তিন ঘণ্টা এইরূপ করিয়া চলিয়া চলিয়া, সে ভাঙ্গা পথ অতিক্রম করিলাম। শিখরে উঠিয়া একটা ঘর পাইলাম। সে ঘরে একখানা কৌচ[১৩] ছিল,

আমি আসিয়াই তাহাতে শুইয়া পড়িলাম। ঝাঁপানীরা গ্রামে যাইয়া আমার জন্য এক বাটী দুধ আনিল, কিন্তু অতি পরিশ্রমে আমার ক্ষুধা চলিয়া গিয়াছে, আমি সে দুধ খাইতে পারিলাম না। সেই যে কৌচে পড়িয়া রহিলাম, সমস্ত রাত্রি চলিয়া গেল, একবারও উঠিলাম না। প্রাতে শরীরে একটু বল আইল। ঝাঁপানীরা এবার এক বাটী দুধ আনিয়া দিল, আমি তাহা পান করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। আরো উপরে উঠিয়া, সে-দিন নারকাণ্ডাতে উপস্থিত হইলাম। এ অতি উচ্চ শিখর। এখানে শীতের অতিশয় আধিক্য বোধ হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে দুগ্ধ পান করিয়া পদব্রজে চলিলাম। অদূরেই নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম, যেহেতু সে-পথ বনের মধ্য দিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সেই বন ভেদ করিয়া রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পথে পড়িয়াছে, তাহাতে বনের শোভা আরো দীপ্তি পাইতেছে। যাইতে যাইতে দেখি যে, বনের স্থানে স্থানে বহুকালের বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ-সকল মূল হইতে উৎপাটিত হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণত রহিয়াছে, ও অনেক তরুণ-বয়স্ক বৃক্ষও দাবানলে দগ্ধ হইয়া অসময়ে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। অনেক পথ চলিয়া পরে যানারোহণ করিলাম। ঝাঁপানে চড়িয়া ক্রমে আরও নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম। পর্বতের উপরে আরোহণ করিতে করিতে তাহার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল হরিদ্বর্ণ ঘন-পল্লবাবৃত বৃহৎ বৃক্ষ-সকল দেখিতে পাই। তাহাতে একটী পুষ্প কি একটী ফলও নাই। কেবল কেলু নামক বৃহৎ বৃক্ষেতে হরিদ্বর্ণ এক প্রকার কদাকার ফল দৃষ্ট হয়, তাহা পক্ষীতেও আহার করে না। কিন্তু পর্বতের গাত্রে যে বিবিধ প্রকারের তৃণ-লতাদি জন্মে তাহার-ই শোভা চমৎকার। তাহা হইতে যে কত জাতির পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া

রহিয়াছে, তাহা সহজে গণনা করা যায় না। শ্বেতবর্ণ, পীতবর্ণ, নীল-বর্ণ, স্বর্ণবর্ণ, সকল বর্ণেরই পুষ্প যথা তথা হইতে নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে।[১৪] এই পুষ্প-সকলের সৌন্দর্য ও লাবণ্য ও তাহাদিগের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্তমান বোধ হইল। যদিও ইহাদিগের যেমন রূপ তেমন গন্ধ নাই, কিন্তু আর এক-প্রকার শ্বেতবর্ণ গোলাপ-পুষ্পের গুচ্ছ-সকল বন হইতে বনান্তরে প্রস্ফুটিত হইয়া, সমুদয় দেশ গন্ধে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। এই শ্বেত গোলাপ চারি পত্রের এক স্তবক মাত্র। স্থানে-স্থানে চামেলি-পুষ্পও গন্ধ দান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্ট্রবেরি[১৫] ফল-সকল খণ্ড খণ্ড রক্তবর্ণ উৎপলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। আমার সঙ্গের এক ভৃত্য এক বনলতা হইতে তাহার পুষ্পিত শাখা আমার হস্তে দিল। এমন সুন্দর পুষ্পের লতা আমি আর কখনো দেখি নাই; আমার চক্ষু খুলিয়া গেল, আমার হৃদয় বিকশিত হইল। আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিলমাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। এই বনের মধ্যে কে বা সেই সকল পুষ্পের গন্ধ পাইবে, কে বা তাহাদের সৌন্দর্য দেখিবে? তথাপি তিনি কত যত্নে, কত স্নেহে তাহাদিগকে সুগন্ধ দিয়া, লাবণ্য দিয়া, শিশিরে সিক্ত করিয়া, লতাতে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার করুণা ও স্নেহ আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। নাথ! যখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির উপরে তোমার এত করুণা, তখন আমাদের উপর না জানি তোমার কত করুণা! তোমার করুণা আমার মন প্রাণ হইতে কখনই যাইবে না। তোমার করুণা আমার মন প্রাণে এমনি বিদ্ধ হইয়া আছে, যদি আমার মস্তক যায়, তথাপি প্রাণ হইতে তোমার করুণা যাইবে না—

হর্‌গিজম মেহ্‌-র্‌-এ-তু অজ্‌ লওহ্‌-এ-দিল্‌-ও-জান্‌ ন-রওঅদ্‌।
আন্‌চুনান্‌ মেহ্‌র্‌-এ-তু-অম্‌ দর্‌ দিল্‌-ও-জানজাএ গিরিফ্‌ৎ।
কি গর্‌ম্‌-এ-সম্‌ বি-রওঅদ্‌—মেহ্‌র-এ-তু অজ্‌ জান্‌ ন-রওঅদ্‌॥

[তোমার কৃপা আমার মনের ও প্রাণের লিখন-ফলক হইতে কখনও যাইবে না ;
এইরূপ আমার প্রতি তোমার কৃপা আমার মনে ও প্রাণে স্থান লইয়াছে ;
আমার মাথা-গরম করা (অর্থাৎ সব বিষয়ে ব্যস্ততা) চলিয়া যাইবে, কিন্তু প্রাণ হইতে তোমার কৃপা যাইবে না ॥]

হাফেজের[১১] এই কবিতা পথে সমস্ত দিন উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে পড়িতে তাঁহার করুণা-রসে নিমগ্ন হইয়া, সূর্য-অস্তের কিছু পূর্বে সায়ংকালে সুজ্‌ঘী নামক পর্বত-চূড়াতে উপস্থিত হইলাম। দিন কখন চলিয়া গেল, কিছুই জানিতে পারিলাম না। এই উচ্চ শিখর হইতে পরস্পর-অভিমুখী দুই পর্বত-শ্রেণীর শোভা দেখিয়া পুলকিত হইলাম। এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কোন পর্বতে নিবিড় বন—ঋক্ষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান ; কোন পর্বতের আপাদ-মস্তক পক্ক-গোধুম-ক্ষেত্র দ্বারা স্বর্ণ-বর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে মধ্যে বিস্তর ব্যবধানে এক-এক গ্রামে দশ-বারোটী করিয়া গৃহপুঞ্জ সূর্য-কিরণে দীপ্তি পাইতেছে। কোন পর্বত, আপাদ-মস্তক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণদ্বারা ভূষিত রহিয়াছে। কোন পর্বত একেবারে তৃণশূন্য হইয়া, তাহার নিকটস্থ বনাকীর্ণ পর্বতের শোভা বর্ধন করিতেছে। প্রতি পর্বত-ই আপনার মহোচ্চতার গরিমাতে স্তব্ধ হইয়া পশ্চাতে হেলিয়া রহিয়াছে, কাহাকেও শঙ্কা নাই ; কিন্তু তাহার আশ্রিত পথিকেরা রাজভৃত্যের ন্যায় সর্বদা শঙ্কিত, একবার পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই। সূর্য অস্তমিত হইল, অন্ধকার ভুবনকে ক্রমে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, তখনও আমি সেই পর্বত-শৃঙ্গে

একাকী বসিয়া আছি। দূর হইতে পর্বতের স্থানে-স্থানে কেবল প্রদীপের আলোকে মনুষ্য-বসতির পরিচয় দিতেছে।

পরদিবস প্রাতঃকালে সেই পর্বত-শ্রেণীর মধ্যে যে পর্বত বনাকীর্ণ, সেই পর্বতের পথ দিয়া নিম্নে পদব্রজেই অবরোহণ করিতে লাগিলাম। পর্বত আরোহণ করিতে যেমন কষ্ট, অবরোহণ করা তেমনি সহজ। এই পর্বতে কেবল কেলু-বৃক্ষের বন। ইহাকে তো বন বলা উচিত হয় না, ইহা উদ্যান অপেক্ষাও ভাল। কেলু-বৃক্ষ দেবদারু-বৃক্ষের[১৭] ন্যায় ঋজু এবং দীর্ঘ। তাহার শাখা-সকল তাহার অগ্রভাগ পর্যন্ত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এবং ঝাউগাছের পত্রের ন্যায় অথচ সূচী-প্রমাণ দীর্ঘমাত্র ঘন পত্র তাহার ভূষণ হইয়াছে। বৃহৎ পক্ষীর পক্ষের ন্যায় প্রসারিত ও ঘনপত্রাবৃত শাখা-সকল শীতকালে বহু তুষার-ভার বহন করে, অথচ ইহার পত্র-সকল সেই তুষার দ্বারা জীর্ণ-শীর্ণ না হইয়া আরও সতেজ হয়, কখনো আপনার হরিদ্বর্ণ পরিত্যাগ করে না। ইহা কি আশ্চর্য নাহ? ঈশ্বরের কোন্ কার্য না আশ্চর্য! এই পর্বতের তল হইতে তাহার চূড়া পর্যন্ত এই বৃক্ষ-সকল সৈন্যদলের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিনীত-ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই দৃশ্যের মহত্ত্ব এবং সৌন্দর্য কি মনুষ্য-কৃত কোন উদ্যানে থাকিবার সম্ভাবনা? এই কেলু-বৃক্ষের কোন পুষ্প হয় না। ইহা বনস্পতি, এবং ইহার ফল-ও অতি নিকৃষ্ট, তথাপি ইহার দ্বারা আমরা বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হই। ইহাতে আল্‌কাতরা জন্মে।

কতক দূরে চলিয়া, পরে ঝাঁপানে চড়িলাম। যাইতে যাইতে স্নানের উপযুক্ত এক প্রস্রবণ প্রাপ্ত হইয়া, সেই তুষার-পরিণত হিম-জলে স্নান করিবার পর নূতন স্ফূর্তি ধারণ করিলাম, এবং ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া পবিত্র হইলাম। পথে এক পাল অজা অবি[১৮] চলিয়া যাইতেছিল,

আমার ঝাঁপানী একটী অজা ধরিয়া আমার নিকটে আনিল এবং বলিল যে, "ইস্‌সে দুধ মিলেগা।" আমি তাহা হইতে এক পোয়া মাত্র দুগ্ধ পাইলাম। উপাসনার পরে আমার নিয়মিত দুগ্ধ পথের মধ্যে পাইয়া আশ্চর্য হইলাম, এবং করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া তাহা পান করিলাম। "সবন জীওঁকা তুম্ দাতা, সো মৈঁ বিসর না জাউঁ"—সকল জীবের তুমি দাতা, তাহা যেন আমি বিস্মৃত না হই। তাহার পরে পদব্রজে অগ্রসর হইলাম, এবং বনের অন্তে এঁক গ্রামে উপনীত হইলাম। পুনর্বার সেখানে পক্ক গোধূম যবাদির ক্ষেত্র দেখিয়া প্রহৃষ্ট হইলাম। মধ্যে-মধ্যে আফিমের ক্ষেত্র রহিয়াছে। এক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা প্রসন্ন-মনে পক্ক শস্য কর্তন করিতেছে, অন্য ক্ষেত্রে কৃষকেরা ভাবী ফল প্রত্যাশায় হল-বহন দ্বারা ভূমি-কর্ষণ করিতেছে। রৌদ্রের জন্য, পুনর্বার ঝাঁপানে চড়িয়া, প্রায় দুই প্রহরের সময় বোয়ালি নামক পর্বতে উপস্থিত হইলাম। সুজ্ঘ্রী হইতে ইহা অনেক নিম্নে। এই পর্বতের তলে নগরী নদী, ইহার নিকটেই অন্যান্য পর্বত-তলে শতদ্রু নদী বহিতেছে। বোয়ালি পর্বতের চূড়া হইতে শতদ্রু নদীকে দুই হস্ত মাত্র প্রশস্ত বোধ হইতেছে, এবং তাহা রৌপ্যপাত্রের ন্যায় সূর্য-কিরণে চিক্‌চিক্ করিতেছে। এই শতদ্রু নদীর তীরে রামপুর নামে যে এক নগর আছে, তাহা এখানে অতিশয় প্রসিদ্ধ, যে হেতু এই-সকল পর্বতের অধিকারী যে রাজা, রামপুর তাঁহার রাজধানী। রামপুর যে পর্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা ইহার সন্নিকট দেখা যাইতেছে, তথাপি ইহাতে যাইতে হইলে, নিম্নগামী বহু পথ ভ্রমণ করিতে হয়। এই রাজার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর হইবে; তিনি ইংরেজী ভাষা-ও অল্প অল্প শিখিয়াছেন। শতদ্রু নদী এই রামপুর হইতে ভজ্জীর রাণার রাজধানী শোহিনী হইয়া

তাহার নিম্নে বিলাসপুরে যাইয়া পর্বত ত্যাগ করিয়া পাঞ্জাবে বহমান হইয়াছে।

গত-কল্য সুঙ্গ্রী হইতে ক্রমিক অবরোহণ করিয়া বোয়ালিতে আসিয়াছিলাম, অদ্য-ও তদ্রূপ প্রাতঃকালে এখান হইতে অবরোহণ করিয়া অপরাহ্নে নগরী নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। এই মহাবেগ-বতী স্রোতস্বতী স্বীয় গর্ভস্থ বৃহৎ বৃহৎ হস্তিকায়-তুল্য প্রস্তর-খণ্ডে আঘাত পাইয়া, রোষান্বিতা ও ফেনময়ী হইয়া গভীর শব্দ করতঃ সর্বনিয়ন্তার শাসনে সমুদ্র-সমাগমে গমন করিতেছে। ইহার উভয় তীর হইতে দুই পর্বত বৃহৎ প্রাচীরের ন্যায় অনেক উচ্চ পর্যন্ত সমান উঠিয়া, পরে পশ্চাতে হেলিয়া গিয়াছে। রৌদ্রের কিরণ বিস্তর কাল ধরিয়া এখানে থাকিবার স্থান প্রাপ্ত হয় না। এই নদীর উপর একটী সুন্দর সেতু ঝুলিতেছে, আমি সেই সেতু দিয়া নদীর পর-পারে গিয়া একটী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাঙ্গালাতে গিয়া বিশ্রাম করিলাম। এই উপত্যকা-ভূমি অতি রম্য, ও অতি বিরল। ইহার দশ ক্রোশ মধ্যে একটী লোক নাই, একটী গ্রাম নাই। এখানে স্ত্রী-পুত্র লইয়া কেবল একটী ঘরে একজন মনুষ্য বাস করিতেছে। সে তো ঘর নহে—সে পর্বতের গহ্বর। সেইখানেই তাহারা রন্ধন করে সেইখানেই তাহারা শয়ন করে। দেখি যে, তাহার স্ত্রী একটী শিশুকে পিঠে লইয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে, তাহার আর একটী ছেলে পর্বতের উপরে সঙ্কট-স্থান দিয়া হাসিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, ও তাহার পিতা একটী ক্ষেত্রে আলুর চাষ করিতেছে। এখানে ঈশ্বর তাহাদের সুখের কিছুই অভাব রাখেন নাই, রাজাসনে বসিয়া রাজাদিগের এমন শান্তি দুর্লভ।

আমি সায়ংকালে এই নদীর সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া একাকী তাহার

তীরে বিচরণ করিতেছিলাম। হঠাৎ উপরে দৃষ্টিপাত কারয়া দেখি যে, "পর্বতো বহ্নিমান্"[১৯]—পর্বতের উপরে দীপমালা শোভা পাইতেছে; সায়ংকালের অবসান হইয়া রাত্রি যতই বাড়িতে লাগিল, সেই অগ্নিও ক্রমে তত ব্যাপ্ত হইল। উপর হইতে অগ্নিবাণের ন্যায় নক্ষত্র-বেগে শত-সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইয়া নদীতীর পর্যন্ত নিম্নস্থ বৃক্ষসকলকে আক্রমণ করিল। ক্রমে একে-একে সমুদায় বৃক্ষ স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিরূপ ধারণ করিল, এবং অন্ধতিমির সে স্থান হইতে বহুদূরে প্রস্থান করিল। অগ্নির এই অপরূপ রূপ দেখিতে দেখিতে, যে দেবতা অগ্নিতে[২০], তাঁহার মহিমা অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি পূর্বে এখানকার অনেক বনে দাবানলের চিহ্ন দগ্ধ বৃক্ষ-সকলে দেখিয়াছি, এবং রাত্রিতে দূরস্থ পর্বতের উপর প্রজ্বলিত অগ্নির শোভা-ও দর্শন করিয়াছি; কিন্তু এখানে দাবানলের উৎপত্তি, ব্যাপ্তি, উন্নতি ও নিবৃত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া আমার বড়ই আহ্লাদ হইল। সমস্ত রাত্রি এই দাবানল জ্বলিয়াছিল; রাত্রিতে যখন-ই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তখন-ই তাহার আলোক দেখিয়াছি। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি, অনেক দগ্ধ দারু হইতে ধূম নির্গত হইতেছে, এবং উৎসব-রজনীর প্রভাত-কালের অবশিষ্ট দীপালোকের ন্যায় মধ্যে-মধ্যে সর্বভুক্ লোলুপ অগ্নি-ও ম্লান, অবসন্ন হইয়া জ্বলিত রহিয়াছে।

আমি সেই নদীতে যাইয়া স্নান করিলাম। ঘটী করিয়া তাহা হইতে জল তুলিয়া মস্তকে দিলাম। সে জল এমনি হিম যে, বোধ হইলে যেন মস্তকের মস্তিষ্ক জমিয়া গেল। স্নান ও উপাসনার পর কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া এখান হইতে প্রস্থান করিলাম। প্রাতঃকাল অবধি আবার এখান হইতে ক্রমিক আরোহণ করিয়া, দুই প্রহরের

সময়ে দারুণ-ঘাট নামক দারুণ উচ্চ পর্বতের শিখরে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, সম্মুখে আর এক নিদারুণ উচ্চ পর্বতের শৃঙ্গ তুষারাবৃত হইয়া উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহদ্ভয় ঈশ্বরের[২১] মহিমা উন্নত মুখে ঘোষণা করিতেছে। আমি আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে দারুণ-ঘাটে উপস্থিত হইয়া সম্মুখস্থিত তুষারাবৃত পর্বত-শৃঙ্গের আশ্লিষ্ট মেঘাবলী[২২] হইতে তুষার-বর্ষণ দর্শন করিলাম। আষাঢ় মাসে তুষার-বর্ষণ শিমলা-বাসীদিগের পক্ষেও আশ্চর্য, যে হেতু চৈত্র মাস শেষ হইতে না হইতেই শিমলা-পর্বত তুষার-জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া বৈশাখ মাসে মনোহর বসন্ত-বেশ ধারণ করে।

২রা আষাঢ় এই পর্বত হইতে অবরোহণ করিয়া সিরাহন নামক পর্বতে উপস্থিত হই। সেখানে রামপুরের রাণীর একটা অট্টালিকা আছে, গ্রীষ্মকালে রামপুরে অধিক উত্তাপ হইলে কখন কখন শীতল বায়ু সেবনার্থে রাজা এখানে আসিয়া থাকেন। গ্রীষ্মকালে পর্বত-তলে আমাদিগের দেশ অপেক্ষাও অধিক উত্তাপ হয়, পর্বত-চূড়াতেই বারো মাস শীতল বায়ু বহিতে থাকে। ৪ঠা আষাঢ় এখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, ১০ই আষাঢ় ঈশ্বর-প্রসাদাৎ নির্বিঘ্নে আমার শিমলার প্রবাস-ঘরের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া ঘা মারিলাম।

কিশোরীনাথ দরজা খুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। আমি বলিলাম, "তোমার মুখ যে একেবারে কালি হইয়া গিয়াছে।" সে বলিল, "আমি এখানে ছিলাম না, যখন আপনার আজ্ঞা অবহেলা করিলাম এবং আপনার সঙ্গে যাইতে পারিলাম না, তখন আমি অনুশোচনা ও অনুতাপে একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। আমি আর এখানে তিষ্ঠিয়া[২৩] থাকিতে পারিলাম না। আমি পর্বত হইতে নামিয়া জ্বালামুখী[২৪] চলিয়া গেলাম। জ্বালামুখীর অগ্নির তাপে,

জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রের তাপে আমার শরীর দগ্ধ হইয়া গেল। আমি তাই কালামুখ হইয়া এখানে ফিরিয়া আসিয়াছি। এখানে যেমন কর্ম তেমনি ফল হইয়াছে, আমি আপনার নিকট বড় অপরাধী ও দোষী হইয়াছি। আমার আশা নাই যে, আপনি আর আমাকে আপনার নিকট রাখিবেন।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "তোমার ভয় নাই, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তুমি যেমন আমার কাছে ছিলে তেমনি আমার কাছে থাক।" সে বলিল, "আমি নীচে যাইবার সময় একটা চাকর রাখিয়া গিয়াছিলাম, আসিয়া দেখি যে, সে চাকর পলাইয়া গিয়াছে। দরজা সব বন্ধ, আমি দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, আমাদের কাপড় ও বাক্স-পেটরা সকলই আছে, কিছুই লইয়া যায় নাই। আমি তিন দিন মাত্র পূর্বে এখানে আসিয়াছি।" আমি তাহার এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম,—যদি তিন দিন পূর্বে এখানে আসিতাম, তবে বড়ই বিভ্রাটে পড়িতে হইত। এই বিংশতি দিবসের পর্বত-ভ্রমণে ঈশ্বর আমার শরীরকে আধিভৌতিক কত বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন, আমার মনকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, বিবেক ও বৈরাগ্যের কত উচ্চ শিক্ষা দিলেন, তাঁহার সহবাস-সুখে আমার আত্মাকে কত পবিত্র ও উন্নত করিলেন, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা আমার হৃদয়ে ধরিল না। আমি তাঁহাকে ভক্তি-ভরে প্রণাম করিয়া ঘরে গিয়া তাঁহার প্রেম-গান করিতে লাগিলাম।

১ চাটুজ্যে—'চাটুজ্যে, মুখুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে (বা চাটুর্জ্যে, মুখুর্জ্যে, বাঁড়ুর্জ্যে)'—এইগুলি উক্ত পদবী তিনটার পশ্চিম-বঙ্গে প্রচলিত শুদ্ধ বাঙ্গালা রূপ। পুরাতন বাঙ্গালায় এগুলি ছিল 'চাটুর্জ্যা, মুখুর্জ্যা, বাঁড়ুর্জ্যা'—চাটু বা চাটুতি, মুখটী ও বাঁড়ুরি' গ্রামের নাম হইতে এই নামগুলির উদ্ভব। এগুলির সংস্কৃত রূপ 'চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়,

বন্দ্যোপাধ্যায়' (বন্দিঘাটী-গ্রাম ও বাঁড়ুরি-গ্রাম, এই দুই মিলিয়া গিয়া শেষোক্ত নামটীর উদ্ভব)। ইংরেজদের মুখে 'চাটুর্জ্যে' ইত্যাদির বিকার হয় 'চ্যাটার্জি, মুকার্জি, ব্যানার্জি।' বাঙ্গালা নামের এই সব ইংরেজী বিকার বাঙ্গালীর মুখে বা লেখায় ব্যবহৃত হওয়া, ভাষা-গত অশিষ্টতা ও বর্বরতার পরিচায়ক; এই জন্য, বাঙ্গালায় 'চাটুজ্যে (চাটুর্জ্যে)' প্রভৃতি, অথবা 'চট্টোপাধ্যায়' প্রভৃতি রূপই ব্যবহার করা উচিত—'চ্যাটার্জি, মুখার্জি, ব্যানার্জি' কদাচ নহে।

২ ঝাঁপান—হিন্দী 'ঝাঁপান' বা 'ঝম্পান'=মানুষের দ্বারা বাহিত এক-প্রকার যান, পাহাড়-অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়।

৩ বাঙ্গী-বর্দার—হিন্দী 'বহঙ্গী'=মাল বহিবার বাঁক,+ফারসী 'বর-দার' (=সংস্কৃত 'ভর-ধার') অর্থে 'বাহক'; যাহারা কাঁধে বা মাথায় মোট বহিয়া লইয়া যায়।

৪ কার্নিস—ইংরেজী cornice হইতে (কর্নিস—পুরাতন বাঙ্গালা রূপে অ-স্থানে আ-কার লক্ষণীয়)=ছাদের নিম্নে দেওয়ালের বহির্মুখী কিনারা।

৫ খদ্—হিন্দী শব্দ—পাহাড়ের গা, সোজা নামিয়া গিয়া বহু দূরে নীচের অধিত্যকায় খদের সৃষ্টি করে।

৬ "পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্"—সুবিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোকের অংশ—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্।

'যাঁহার কৃপা বোবাকে দিয়া কথা কহায়, এবং খোঁড়াকে দিয়া পাহাড় পার করায়, সেই পরমানন্দময় মাধব বা নারায়ণের বন্দনা করি।'

৭ কেলু-গাছ—হিমালয়-পর্বত অঞ্চলের বৃক্ষ বিশেষ; হিন্দী 'কেলু'—pine বা সরল জাতীয় গাছ।

৮ আইল—ইহা হইতে উদ্ভূত পদ 'এল' বা 'এলো' চলিত ভাষায় প্রচলিত, পূর্ব-বঙ্গের কথ্য ভাষাতেও 'আইল' শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু গদ্য সাহিত্যের সাধু ভাষায় 'আইল' আর ব্যবহৃত হয় না, ইহার স্থানে 'আসিল' পদই চলে। (সংস্কৃত 'আ+বিশ্' হইতে বাঙ্গালা 'আইস্, আস্' ধাতু; 'আ+যা' হইতে 'আয়, আই' রূপ, যাহা 'আইল'তে মিলে)।

৯ মক্কা—অন্য নাম 'ভুট্টা' বা 'মকাই'। এই শস্য উত্তর-আমেরিকার মেক্সিকো অঞ্চল হইতে পোর্তুগীসদের দ্বারা ভারতে আনীত হইয়াছে (যেমন গোল-আলু আনীত হইয়াছে দক্ষিণ-আমেরিকার পেরু দেশ হইতে)।

১০ হিন্দী বচনটীর অর্থ, রুক্ষ শুষ্ক গমের টুকরা, লবণাক্ত বা লবণহীন (অর্থাৎ তরকারী-যুক্ত বা তরকারী-হীন) হইল তো কি হইল? মাথাই যদি দিলাম, তবে রোদন কিসের?'

১১ পাকদণ্ডী—হিন্দী 'পগ্‌দণ্ডী=পায়ে পায়ে চলিবার সরু পাহাড়িয়া পথ।

১২ চড়াই—হিন্দী শব্দ 'চঢ়াই' হইতে—পাহাড়-পর্বতে আরোহণ বা উঠা (বা চড়া), অথবা উঠিবার (চড়িবার) পথ। অবরোহণ বা নামা, নামিবার পথকে 'উৎরাই' বলে (হিন্দী 'উতরাঈ' হইতে)।

১৩ কৌচ—ইংরেজী couch।

১৪ হিমালয় পর্বতের গাত্র যে-সমস্ত রঙ্গীন ফুলে উজ্জ্বল করিয়া রাখে, সে ফুলকে ইংরেজীতে বলে rhododendron, স্থানীয় ভাষায় বলে 'বঁরাস'।

১৫ ষ্ট্রাবেরি—ইংরেজী strawberry (ষ্ট্রবেরি—পুরাতন বাঙ্গালা প্রত্যক্ষরী-করণে আ-কার লক্ষণীয়)—এক-প্রকার অম্লমধুর ফল, পাকিলে লাল রঙের হয়।

১৬ হাফেজ—পারস্যের বিখ্যাত ভক্ত কবি, জন্ম খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রারম্ভে, মৃত্যু ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। ইঁহার আসল নাম শম্‌সু-দ্‌-দীন মোহম্মদ, সমগ্র কোরান মুখস্থ করিয়া তাহা মনোমধ্যে 'রক্ষা' করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার পদবী হয় 'হাফিজ' (আরবী 'হাফিধ্‌'=রক্ষক)। ইনি ঈশ্বর-প্রেম বিষয়ে উচ্চ অঙ্গের ও গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে পূর্ণ বহু কবিতা লিখিয়াছেন।

১৭ দেবদারু—ইহা আমাদের বাঙ্গালা দেশের 'দেবদারু' নহে; হিন্দী 'দেওদার' বা দেব্‌দার—ইহা উচ্চ পর্বতাঞ্চলে হয়, ঝাউ জাতীয় গাছ, Himalayan pine।

১৮ অজা অবি—ছাগী ও মেষী। সংস্কৃত 'অবি' (awi)—ইহার সগোত্র শব্দ ইংরেজীর ewe।

১৯ "পর্বতো বহ্নিমান্‌"—ন্যায়-শাস্ত্রের বিচারে একটি বিখ্যাত দৃষ্টান্ত হইতেছে—"পর্বতো বহ্নিমান্‌ ধূমাৎ"—অর্থাৎ 'পাহাড়ে আগুন লাগিয়াছে, যেহেতু ধোঁয়া দেখা

যাইতেছে'; ইহা কার্য দেখিয়া কারণ অনুমান করার দৃষ্টান্ত। লেখক এই বিখ্যাত দৃষ্টান্তের বাক্য উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

২০ যে দেবতা অগ্নিতে—উপনিষদের বচন 'যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনম্ আবিবেশ' এখানে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

২১ উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহদ্ভয় ঈশ্বরের মহিমা—উপনিষদের 'মহদ্ভয়ং বজ্রম্ উদ্যতম্'-এর প্রতিধ্বনি।

২২ মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘম্ আশ্লিষ্ট-সানুম্' স্মরণে।

২৩ তিষ্ঠিয়া—সংস্কৃত ধাতুর বাঙ্গালায় প্রয়োগ—'স্থা' ধাতু (=অবস্থান করা, থাকা) হইতে 'তিষ্ঠা'। তদ্রূপ 'বর্তিয়া, প্রতিবিধিৎসিতে, জিজ্ঞাসিয়া' ইত্যাদি।

২৪ জ্বালামুখী- পাঞ্জাবের হিমালয়-অঞ্চলের প্রসিদ্ধ দেবী-তীর্থ। পৃথিবীর ফাটল হইতে আগ্নেয়গিরির ন্যায় অগ্নিশিখা নির্গত হয়। (হিন্দীতে Volcano বা আগ্নেয়-গিরির একটী নাম 'জ্বালামুখী')।

ছাত্রজীবন

[অক্ষয়চন্দ্র সরকার]

অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৩৬—১৯১৭) বিগত যুগের একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন। ইঁহার পিতা রায় বাহাদুর গঙ্গাচরণ সরকার সব-জজ ছিলেন। ইঁহার জন্মস্থান ও বাসভূমি ছিল হুগলী জেলার চুঁচুড়া নগর। ইনি ব্যবহারজীবীর কার্য করিতেন। অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন, এবং স্বয়ং "সাধারণ" নামে রাজনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক ও "নবজীবন" নামে ধর্ম-বিষয়ক মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। নানা বিষয়ে, বিশেষতঃ ভারতীয় আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করিয়া, ইনি বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন। "গোচারণের মাঠ" ইঁহার রচিত একটী মনোহর খণ্ড-কাব্য। প্রাচীন

বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চা ও প্রচারের ইনি অগ্রণী—"প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ" নাম দিয়া ইনি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রচনা প্রকাশিত করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহিত ইনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৩১১ সালে দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় "বঙ্গভাষার লেখক" নামে বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের একখানি জীবনী-সংগ্রহ "বঙ্গবাসী" কার্যালয় হইতে প্রকাশিত করেন। তাহাতে অক্ষয়চন্দ্র "পিতাপুত্র" নাম দিয়া নিজ পিতার ও নিজের শিক্ষা ও সাহিত্যজীবনের কথা লিপিবদ্ধ করেন। ইহা হইতে তাঁহার বিদ্যার্থি-জীবনের কাহিনী উদ্ধৃত করা হইল।

স্কুল-কলেজে পড়িবার সময় আমি আগ্রহ-সহকারে সকল বাঙ্গালা পুস্তকই পাঠ করিতাম, চর্চা করিতাম। সে সকলের আনুপূর্বিক পরিচয় দেওয়া অসাধ্য। তবে সাত-আট জন গ্রন্থকারের নাম এবং তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে কিরূপ ফল পাইয়াছিলাম, তাহা বলা আবশ্যক।

প্রথমেই বলিব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত "বিবিধার্থ-সংগ্রহ"র[১] বিষয়। আমি প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা হইতে তিন চারি বৎসরের "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" পাইয়াছিলাম। অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক সেই সকল পাঠ করিতাম। বিচিত্র জুড়িদার পাইয়াছিলাম বৃদ্ধ অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে; তিনি পিতা অপেক্ষা বয়সে বিস্তর বড় ছিলেন। সন্ধ্যা-আহ্নিক পূজা-পার্বণ প্রভৃতি নিত্যকর্মে রত থাকিতেন, আর অবকাশ পাইলেই পাঠ করিতেন—"বিবিধার্থ-সংগ্রহ"। পূজার সময়ে পিতা আসিলে আমরা দুই অপূর্ব জুড়িদার সেই পাঠের পরিচয় প্রদান করিতাম। পিতা আমাদিগকে লইয়া নানা কৌতুক করিতেন। "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" হইতে জ্ঞান পাইয়াছিলাম বহুতর। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের রচনায় সাহিত্য-শিক্ষার কোন সুবিধা পাই নাই,—বলিতে কি, ভাষা-শিক্ষার-ও নহে।

তখন পুস্তকের ফেরিওয়ালারা আমাদের এতৎ অঞ্চলের স্থায় পল্লীর অলিতে-গলিতে সমস্ত দিন পুস্তক-বিক্রয় করিত। "কাশীদাস","কৃত্তিবাস", "ভারতচন্দ্র", "কবিকঙ্কণ", "চরিতামৃত", "প্রেমবিলাস", "হাতেম তাই", "চাহার দরবেশ" প্রভৃতি বড়তলার[২] প্রকাশিত গ্রন্থ, হিন্দু মুসলমান পুরুষেরা কিনিত। মেয়েরাও "জীবনতারা", "কামিনীকুমার" প্রভৃতি গ্রন্থ ক্রয় করিত। বড়তলার ছাড়া অন্যান্য দুই একখানি গ্রন্থ-ও হকারদের[৩] কাছে মিলিত। ফেরিওয়ালাদের সঙ্গে আমার বড় পোট[৪] ছিল। আমি রবিবারে তাহাদের পুস্তক ঘাঁটাঘাটি করিতাম। তাহারা আমায় কিছু বলিত না; আমি যে একজন বাঁধা খরিদ্দার, খরিদ্দার চটাইবে কেন? একদিন নাড়িতে নাড়িতে একখানি এড়াটে[৫] চটি বই পাইলাম। গ্রন্থকারের নাম নাই। কোথায় কবে ছাপা হইল, তাহার কিছুই নাই। দুইখানি সাদা কাগজের মলাট দুইদিকে, মধ্যে ৬-পৃষ্ঠা-ব্যাপী একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ, নাম "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ।"[৬]

বহু পরে জানিয়াছি, এখানি রামকমল ভট্টাচার্যের লেখা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া, আমি যেন ভাষা-রাজ্যের আর এক দেশে উপস্থিত হইলাম। এ তো "কাদম্বরী" নয়, "বেতাল-পঞ্চ-বিংশতি" নয়, "তারাশঙ্কর"-ও নয়, "প্যারীচাঁদ"-ও নয়—এ যে এক নূতন সৃষ্টি! ইহাতে "কাদম্বরী"র আড়ম্বর নাই, বিদ্যাসাগরের সরলতা নাই, অক্ষয়কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারীচাঁদের গ্রাম্য সরলতা নাই—অথচ যেন সব-ই আছে; এবং উহাদের ছাড়া আরও যেন কিছু নূতন আছে। বিশেষত্ব এই যে, সংজ্ঞা-পদে এবং বিশেষণে, স্থলে-স্থলে সংস্কৃতের মত। ক্রিয়াপদগুলি অনেক স্থলে-ই খাঁটি বাঙ্গালা। "কাদম্বরী"তে কঠোর সংস্কৃত দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু "এলা-লতালিঙ্গিত চুত" ও "তাম্বুলবল্লী-পরিণদ্ধ সুপারী—এরূপ দেখি নাই।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের নানারূপ আলোচনা আলোড়ন হইতেছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির কথা কাহাকে-ও বলিতে শুনি না, বা লিখিতে দেখি না। অথচ আমার বিশ্বাস "দুরাকাঙ্ক্ষ"র ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী। হউক বা না হউক, এই ভাষার বিশেষত্বের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ক্ষতি কি ?

আমি বাল্যকালে এই গ্রন্থের ভাষায় যে কেবল মুগ্ধ হইলাম এমন নহে, ইহার ভাবে-ও আকৃষ্ট হইলাম। গ্রন্থের সার কথা এই যে, কতকগুলি দুরাকাঙ্ক্ষা লইয়া থাকিলে, আমি হেন' করিব, আমি তেন' করিব এইরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা সব হৃদয়ে পুষিলে—মানুষের স্বস্তি থাকে না, সুখ থাকে না, শান্তি থাকে না। তাহাকে কিসে যেন হুট-পাট করিয়া তাড়াইয়া লইয়া বেড়ায়। তাহার পর ঘা খাইয়া, ঠেকিয়া শিখিয়া মানুষ যখন শান্তির অন্বেষণ করে, তখন দৈব-ক্রমেই হউক আর যেরূপেই হউক পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা লাভ করিলে তাহার শান্তি হয়। আসল কথা, সুখ দৌড়-ধাপে' নহে, রাজনীতিতে নহে—সুখ পারিবারিক শান্তিতে। এ কথা বাঙ্গালার অতি প্রাচীন কথা, বাঙ্গালীর মজ্জাগত কথা। বাঙ্গালী কিছুকাল পূর্বে এ কথা বুঝিত বলিয়া, বাঙ্গালী পারিবারিক অনুষ্ঠানের যেরূপ সুশ্রীকতা ও সম্পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছিল, এমন কেহ কখনও পারে নাই। অতি সামান্য আয়ে বাঙ্গালী দেবতা-অতিথির সেবা করিয়া, গৃহ-প্রাঙ্গণ সুপরিষ্কৃত রাখিয়া, দেহে স্বাস্থ্য মনে স্ফূর্তি পরিপোষণ করিয়া, কিছুকাল পূর্বে অতি স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছে। এইটাই বাঙ্গালীর গৌরব ছিল। "উন্নতি, উন্নতি করিয়া দারুণ দুর্দমনীয় দুরাকাঙ্ক্ষায় সেই গৌরব চূর্ণ করিতে বসিয়াছে। বালক-কালে অবশ্য এ-সকল কথা বুঝি নাই, ভাবি নাই ; কিন্তু "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা

ভ্রমণ"-এর উপদেশ হৃদয়ে বসিয়া গিয়াছিল। আমি বিচিত্র শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম।

পঠদ্দশায় আর একখানি পুস্তক আমাকে আলোড়িত করিয়াছিল, আনন্দ-ও পাইয়াছিলাম। সেখানি কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম পেঁচার নক্সা"। "আলালের ঘরের দুলাল"-এও অনেক স্থানে নক্সা ও ফোটো তুলিবার চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পল্লী-সমাজের চিত্র যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, কলিকাতার অলি-গলির নক্সা তেমন ফুটন্ত হয় নাই। তেপায়া উচ্চ টুলের উপর কাঁচের বাক্স বসাইয়া, "দু'পয়সা দাও, দু'চক্ষু দিয়া দেখ" বলিয়া যেমন মেলার মধ্যে নানাবিধ ফোটো দেখায়, অপূর্ব ভাষার গাঁথুনিতে সেইরূপ কলিকাতার নানাবিধ নক্সা তুলিয়া "পেঁচা" দেখাইতে লাগিল, ও ফুলা গাল টিপিয়া বলিতে লাগিল—"ইয়ে রাজবাড়ী-কা নক্সা বড়া মজাদার হ্যায়, ইযে শোভাবাজার-কা গাজন বড়া তামাশা হ্যায়, ইয়ে হাইকোর্ট-কা বিচার আজব তাজ্জব হ্যায়।" আমরা তখন নিতান্ত বালক, তাহার ভাষার ভঙ্গীতে, রচনার রঙ্গেতে একেবারে মোহিত হইয়া গেলাম। মনে করিলাম, আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতে বাজী খেলানো যায়, তুবড়ী ফোটানো যায়, ফুল কাটানো যায়, ফোয়ারা ছোটানো যায়; মনে করিলাম আমাদের মাতৃভাষা সর্বাঙ্গে রঙ্গময়ী। ভাল কথা—তোমরা কৃতী সন্তান, তোমরা তো নানারূপে মাতৃভাষার সেবা করিতেছ; তোমরা নক্সা লিখিতে, ছবি আঁকিতে, ফোটো তুলিতে চেষ্টা কর না কেন? পার না? না, অবজ্ঞা কর? না, পার না বলিয়া অবজ্ঞা দেখাও?

আমরা যখন চারিদিকের সন্ধান রাখিতে সমর্থ, তখন চুঁচুড়ায় নর্মাল স্কুল" বসিয়াছে। ভূদেব-বাবু নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়াছেন, সপরিবারে চুঁচুড়ায় ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেছেন, শিক্ষাদানে

করিতেছেন, পুস্তক প্রচার করিতেছেন। তাঁহার হাবভাব হেড-মাষ্টারীর কথা আমরা জানি না; তাঁহার "পুরাবৃত্ত-সার" তখন পড়ি নাই। তাঁহার প্রথম পুস্তক পাঠ করিলাম—ঐতিহাসিক উপন্যাসদ্বয় "সফল-স্বপ্ন" এবং "অঙ্গুরীয়ক-বিনিময়"। এই দুই গ্রন্থ "রোমান্‌স্ অফ্ হিস্ট্রী" হইতে লিখিত। কয়েক পংক্তিতে স্ফুটরূপে স্বভাব-বর্ণন করিয়া নানারূপ স্বভাবজ শব্দের পরিচয় দিয়া, ভূদেব-বাবু উপসংহার করিতেছেন —"যেন জগৎ-যন্ত্রের মধুর লয়-সঙ্গতি হইতেছে।" লেখাটুকু কঠোর মধুর। এই নূতন রসের আস্বাদ পাইয়া, এক-রূপ অপূর্ব আনন্দ উপলব্ধি করিলাম। বাল্যের সাহিত্য-চর্চায় ভূদেব-বাবু হইতে বিশেষ কোন শিক্ষা লাভ হইয়াছিল, এমন কথা নাই বলিলাম। সমাজ-তত্ত্বে তিনি সকল লেখকের শীর্ষস্থানীয়; যৌবনে আমরা অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছি।

১ "বিবিধার্থ-সংগ্রহ"—বাঙ্গালাদেশের বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র সাধারণ বাঙ্গালী তরুণদের জ্ঞান ও কৌতূহল বৃদ্ধি করিবার জন্য এই নামে এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত করেন (উনিশের শতকের মধ্য ভাগে)। তখন এরূপ পত্রিকা বাঙ্গালায় একখানিও ছিল না।

২ বড়তলা (বা বটতলা)—উত্তর কলিকাতার একটী বিশিষ্ট পল্লী। এখানে পূর্বে কম-দামী কাগজে শস্তায় নানাবিধ বাঙ্গালা গ্রন্থ মুদ্রিত হইত, এবং এই-সমস্ত বইয়ের সাহায্যে সমগ্র বঙ্গদেশের জন-সাধারণের মধ্যে দেশের সাহিত্যের সহিত পরিচয় ঘটিত।

৩ হকার—ইংরেজী hawker—ফেরিওয়ালা।

৪ পোট (বা পট)—বন্ধুত্ব।

৫ এড়াটে—পরিত্যক্ত। 'এড়া' অর্থে 'পরিত্যক্ত', পর্য্যসিত, তাহা হইতে 'এড়াটিয়া, এড়াটে'।

৬ "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ"—বইখানি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়,

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা" মধ্যে এটি সম্প্রতি পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

৭ হেন, তেন—অনুরূপ শব্দ 'যেন, কেন'। 'হেন', 'তেন' (=এরূপ, সেরূপ) ইত্যাদির শব্দগুলির পুরাতন বাঙ্গালা রূপ 'এহেন, তেহেন, জেহেন, কেহেন, হেন, তেন্‌হ, জেন্‌হ, কেন্‌হ'; এগুলির উদ্ভব প্রাকৃত 'এইহণ, তৈহণ, জৈহণ, কৈহণ,' সংস্কৃত এতাদৃশ+প্রাকৃতে ন, তাদৃশ+ন, যাদৃশ+ন, কীদৃশ+ন' হইতে।

৮ দৌড়-ধাপে—'দৌড়+ধাব্' হইতে। 'ব' (বর্গের তৃতীয় বর্ণ) স্থানে 'প'। অন্য দৃষ্টান্ত—ফারসী 'খ্রাব'=বাঙ্গালা 'খারাপ'; আরবী 'মিহ্রাব, জুলাব'='মেরাপ, জোলাপ'; সংস্কৃত 'আদৌ+এ=আদৌয়ে', বাঙ্গালা 'আদোবে, 'আদোপে'।

৯ নর্মাল স্কুল—শিক্ষকদের শিখাইবার জন্য বিদ্যালয়।

১০ Romance of History—ইউরোপের ইতিহাসের কতকগুলি চিত্তাকর্ষক কাহিনী অবলম্বন করিয়া এই ইংরেজী বইখানি লিখিত হয়। বইখানি একসময়ে বিশেষ লোকপ্রিয় ছিল।

শেরগড়

[নবীনচন্দ্র সেন]

কবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭—১৯১৯) তাঁহার অমর কবি-প্রতিভার জন্য সাহিত্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুকরণে ইনি বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি বড় কাব্য লেখেন ("কুরুক্ষেত্র, রৈবতক, প্রভাস, পলাশীর যুদ্ধ, অমিতাভ" প্রভৃতি)। গদ্য-সাহিত্যেও ইনি একজন শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন। ইঁহার রচিত "আমার জীবন" বাঙ্গালা ভাষায় এক প্রধান আত্ম-জীবনী। সরল ভাষায় ইনি ইহাতে নিজের জীবনের কথা ও সঙ্গে-সঙ্গে দেশের শাসন-সংক্রান্ত ও সামাজিক অবস্থানের বিষয় লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মানবচরিত্র-সম্বন্ধে ইঁহার অভিজ্ঞতা, এবং বিভিন্ন চরিত্রের নানা নর-নারীর সহিত সম্মিলন ও সঙ্ঘাতে ইঁহার মনের উপর তাহাদের প্রতিক্রিয়া, এই দুইটী জিনিস বইখানিকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। নবীনচন্দ্র ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার

তাঁহার কার্যক্ষেত্র ছিল। নিম্ন-প্রদত্ত অংশে তাঁহার বিহার-প্রবাসের একটী হৃদ্য চিত্র পাওয়া যাইবে। "আমার জীবন" তাঁহার মৃত্যুর পরে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়, পরে এক খণ্ডে উহার পুনর্মুদ্রণ হইয়াছে ("বসুমতী" যন্ত্রালয় হইতে)।

আরা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই শীতের প্রারম্ভে মফস্বলে[১] নির্গত হইলাম। অক্টোবর শেষ না হইতেই এ অঞ্চলে শীতের আবির্ভাব হয়। স্ত্রী, কনিষ্ঠ শিশু, ভ্রাতা প্রাণকুমার সঙ্গে শিবিরে চলিল। ভ্রাতৃ-প্রতিম হরকুমার-ও কলিকাতায় ফিরিয়া না গিয়া আমাদের সঙ্গে চলিল। এই প্রথম শিবির-বাস বড়ই নূতন, আনন্দ-দায়ক বোধ হইল। এ এক-প্রকার সম্ভ্রান্ত বেদিয়া[২] জীবন। একখানি hill tent বা পাহাড়-ভ্রমণের তাঁবু পশ্চিমের সুন্দর সুবিস্তৃত আম্রবাগানের কেন্দ্রস্থলে ঘন নিবিড় আম্রচ্ছায়ায় সংস্থাপিত ; কারণ, এখনও দুপুরের সময় রৌদ্রের বেশ একটুকু উত্তাপ হইয়া থাকে। তাহার কিঞ্চিৎ পশ্চাতে একটী 'রাউটি'[৩], এবং এই ব্যবধানের উভয় পার্শ্বে জনৈক জমীদার হইতে ধার-করা কাপড়ের পর্দা। মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ। আমি সস্ত্রীক ক্ষুদ্র শিবিরটীতে, এবং আর সকলে রাউটিতে থাকিত। ইহার কিঞ্চিৎ দূরে আর একটী শিবিরে কাছারী[৪] হইত, এবং এখানে স্থানীয় জমীদারবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতাম। স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার সময়ে, আবাস-শিবির প্রাতে মহাদেবের মত বৃষভ-বাহনে চলিয়া যাইত,—অন্য উপায়ে যাইবার পন্থাভাব। আহারের পর রাউটি লইয়া পরিবারবর্গ চলিয়া যাইতেন। আমি কাছারীর পর অশ্বারোহণে চলিয়া গেলে, দ্বিতীয় শিবির আমার পশ্চাতে যাইত। এইরূপে সমস্ত সব্-ডিভিশন চারিমাস কাল পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম।

বিহার-অঞ্চল এ সময়ে অতীব মনোহরা শ্রী ধারণ করিয়া থাকে যতদূর দেখা যায়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শুষ্ক প্রান্তর নির্মল শীতাকাশের

নীচে দিগন্তব্যাপী, এবং নানাবিধ হৈমন্তিক শস্য-ক্ষেত্রে বিচিত্র ও পরিশোভিত। স্থানে-স্থানে অহিফেন-ক্ষেত্রে মনোহর শ্বেত রক্ত কুসুমরাশি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে, ইহার যে কি শোভা, না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। প্রান্তরের মধ্যে-মধ্যে সুরোপিত ও সুরক্ষিত আম্রবণ। তদ্ভিন্ন আর কোথাও বৃক্ষের চিহ্নমাত্র নাই। আম্রকাননের অনতিদূরে গ্রাম, গ্রামে গৃহের উপর গৃহ, তাহার উপর গৃহ। গৃহাবলী মৃন্ময়; পুরু প্রাচীরের উপরে খাপরা ও খড়। দেখিতে অতি কদর্য। গ্রামের প্রান্ত-ভাগে জমীদারের ইষ্টকালয়। তাহার-ও সম্মুখ-দিক্ মাত্র ইষ্টক, পশ্চাদ্-ভাগ কর্দম-নির্মিত। দীন কুটীরমালার পার্শ্বে এই অট্টালিকা এক অপূর্ব তুলনাব্যঞ্জক—দরিদ্রতার মধ্যে যেন কি এক ঐশ্বর্যের গর্ব। যেখানে জমীদারের 'মোকাম'-এর অভাব—অর্থাৎ স্থানীয় জমীদার নাই, সেখানে সামান্য একটুকু প্রাঙ্গণ-যুক্ত জমীদারের কাছারী আছে। সেখানে গ্রামের কোনও স্থানে একটী ইষ্টক-নির্মিত 'ইন্দারা'[৫], এবং তাহার পার্শ্বে একটি বিশালকায় পিপ্পল-তরু।

গ্রামখানি একটী ক্ষুদ্র জগৎ। ইহাতে গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় সকলই আছে। সূত্রধর আছে, কর্মকার আছে, চর্মকার আছে, 'চামাইন' অর্থাৎ ধাত্রী পর্যন্ত আছে; এমন কি, প্রত্যেক গ্রামে এক-একটী 'ডায়নি' (ডাকিনী) পর্যন্ত আছে। কাহারও ছেলে মারা গেলে, তাহার-ই কার্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তজ্জন্য তাহাকে সময়ে-সময়ে বড়-ই লাঞ্ছিত হইতে হয়। প্রত্যেক গ্রামে জমীদারের বাড়ীতে কি কাছারীতে 'পাটোয়ার' আছে। এই ব্যক্তি গ্রামের প্রজাদের কর আদায় করিয়া, জমীদার যেখানে আছেন, তাঁহার প্রাপ্য সেখানে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দেয়। গ্রামগুলি সুন্দর দরিদ্রতা-পূর্ণ শান্তির

ছবি। দেখিলে, Elphinstone তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে গ্রাম্য সমিতির চিত্র দিয়াছেন, তাহা মনে হয়। আমি যে সময়ে দেখিয় ছি, তখনও তাহারা পূর্ণমাত্রায় ইংরেজী সভ্যতা শিক্ষা করে নাই। সমস্ত সব্-ডিভিশনে একজনও ইংরেজী জানিত না, একটী মুন্সেফ-ও ছিল না। কোর্টেও সামান্ত মোকদ্দমা মাত্র, তাহাও বড় বেশী হইত না। গ্রামের প্রাচীনেরা পিপ্পলচ্ছায়ায় বসিয়া, গ্রামের সকল বিবাদ মিটাইয়া দিত।

কিন্তু দেশ যেমন পরিষ্কার গ্রামগুলি তেমনি কদর্য। গ্রামের মধ্যে দিয়া একটী কি তুইটী ক্ষুদ্র অপরিসর গ্রাম্য পথ চলিয়া গিয়াছে। তাহাতে তুই পার্শ্ব হইতে গৃহের পয়োনালী আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রামের চারিদিকে কদর্যতার একশেষ। অনেক গ্রামে প্রবেশ করিতেই নাসিকা পীড়িত হইয়া উঠিত। ফলতঃ দেশ যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, জল যেমন নির্ম্মল, গ্রামগুলি তেমনই নরক-বিশেষ। সমস্ত প্রাতঃকাল ও অপরাহ্ণ অশ্বপৃষ্ঠে পরিভ্রমণে ও পরিদর্শনে কাটাইতাম। সেই অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে শীতকালে অশ্ব-সঞ্চালন যে কি প্রীতি ও স্বাস্থ্য-প্রদ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বোধ হইত, যেন দেহে কি এক সঞ্জীবনী সুধা সঞ্চালিত হইত।"

ভবুয়ার এলাকায় ১৪ মাইল পর্বত। শুনিয়াছি, তাহার উপর উঠিলে ঠিক যেন সমতল ক্ষেত্র। আমি এই পার্বত্য দেশ ভিন্ন আর সমস্ত স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলাম। পর্বতভুমি পরের বৎসর দর্শনের জন্ত রাখিয়াছিলাম। মানুষের গণনা সকল সময়ে সফল হয় না। যে-সকল স্থান দেখিয়াছিলাম, সর্বস্থানে জমীদার ও প্রজাবর্গের যে অপরিসীম আদর পাইয়াছিলাম, চইনপুরের সেই প্রাচীন গগনস্পর্শী সমাধিগৃহ, ভগবানপুরের ও বোধপুরের সেই পার্বত্য শোভা, বোধ-

পুরের সেই সুন্দর শৈলশ্রেণী ও তাহার পাদমূলস্থ আম্রবণে আমাদের মনোহর শিবির-সন্নিবেশ, শৈলসুতা নীল-নির্মল-সলিলা দুর্গাবতী ও কর্মনাশা নদী, নদীতীরে সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নায় প্রথমজীবনের শিশির-বিহার—এ সব আমার হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

ভবুয়া উপবিভাগের একটী সীমান্ত-স্থানে একদিন সন্ধ্যার সময়ে শিবিরে পৌছিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলাম। স্ত্রী পূর্বেই শিবিরে পৌছিয়াছিলেন। উপস্থিত পুলিশ-কর্মচারীর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলাম। গ্রামের জমীদার একটী স্ত্রীলোক। তিনি 'বহুরিয়া'[৭] বলিয়া পরিচিত। তিনি বধূ অবস্থাতেই শ্বশুর-শাশুড়ী ও স্বামিহীনা হইয়া, জমীদারীর ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্মচারিগণ নানাবিধ খাদ্যের একটী প্রকাণ্ড ডালি লইয়া উপস্থিত ছিলেন। সমাগত সকলেই এই রমণীর প্রশংসা করিতেছিলেন। শিবির-সমীপবর্তী স্থানে দেখিবার যোগ্য কিছু আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলেন, নিকটে কিছুই নাই, তবে সেখান হইতে দশ মাইল ব্যবধানে সাসারাম উপবিভাগের অন্তর্গত 'শেরগড়'[৮] স্থানটী দেখিবার যোগ্য। কিন্তু পথ নাই, জঙ্গল কাটিয়া পথ করিয়া স্থানটী দেখিতে পারা যায়; তাঁহারা কেহ-ই দেখেন নাই। তবে যে যাহা শুনিয়াছেন তাহা আমাকে বলিলেন। আমি স্থানটী দেখিবার জন্য বড়-ই আগ্রহ প্রকাশ করিলে, তাঁহারা বলিলেন যে তাঁহারা তথায় যাইবার বন্দোবস্ত করিবেন।

শীতকাল, নীল নির্মল পূর্বাকাশে উষার তপ্তকাঞ্চনাভা উন্মেষিত হইতেছে, এমন সময়ে পুলিশ-কর্মচারী ও 'বহুরিয়া'র প্রধান কর্মচারী একটী হস্তী ও বহুতর লোকজন সমভিব্যাহারে উপস্থিত। আমি বলিয়াছি যে, ভবুয়ার সাধারণ লোক আমাকে কিরূপ একটা অপত্য-

স্নেহের ভাবে দেখিত। শিশু যেরূপ ধূলা লইয়া খেলা করে, আমিও যেন তাহাই করিতাম। তথাপি লোকের মুখে প্রশংসা ধরিত না। যেখানে যাইতেছি, সেখানে লোকে আমাকে হৃদয়ের সহিত আদর দেখাইতেছে। 'বহুরিয়া'র কর্মচারী বলিলেন যে, আমি ছেলে-মানুষ, এরূপ দুর্গম স্থানে যাইব শুনিয়া 'বহুরিয়া' বড় চিন্তিত হইয়াছেন এবং আমাকে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। যদি নিতান্ত তাঁহার বাধা ঠেলিয়া আমি যাই, তবে তিনি যে সকল লোক পাঠাইয়াছেন তাহাদিগকে যেন সঙ্গে লওয়া হয়।

রমণী-হৃদয় ভিন্ন এমন আদর কোথায় সম্ভব? আমার চক্ষে জল আসিল। আমি দেখিলাম, প্রকাণ্ড লাঠি, বর্শা, বল্লম, তরবারি এবং পুরাতন আগ্নেয়াস্ত্র হস্তে একটী ক্ষুদ্র সেনা উপস্থিত। ইহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইলে আমাকেও দাক্ষিণাত্য-যাত্রী একটী ক্ষুদ্র ঔরঙ্গজেব হইতে হইবে। পুলিস-কর্মচারীও বলিল যে, এত লোক সঙ্গে লইবার কিছুই প্রয়োজন নাই। লইলে বরং অসুবিধা হইবে। আমি বলিলাম যে, এ স্থানে শিবিরে আসা পর্যন্ত 'বহুরিয়া' আমাকে যেরূপ স্নেহ করিতেন, মাতা-ও পুত্রের প্রতি তাহার অধিক স্নেহ করিতে পারে না, অতএব তাঁহার কথা আমি অবহেলা করিতে পারি না। তবে শেরগড় দেখিবার আমার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। তাঁহার আশীর্বাদে কোনও বিঘ্ন হইবে না। শেষে কর্মচারী মহাশয় বলিলেন যে, অন্ততঃ তাঁহাকে আমার সঙ্গে যাইতে 'বহুরিয়া' বিশেষ করিয়া আদেশ করিয়াছেন। অগত্যা তাহাতে স্বীকৃত হইলাম। তিনি, আমি ও পুলিস-কর্মচারী, একটী সুন্দর সুসজ্জিত ক্ষুদ্র হস্তীর পৃষ্ঠে যাত্রা করিলাম। আমি এত হস্তী দেখিয়াছি, কিন্তু এমন সুন্দর ছোট হাতী দেখি নাই। একটী বৃহৎ 'ওয়েলর'* অপেক্ষা বড় বেশী বড় হইবে না। শুনিলাম হাতীটী এ

অঞ্চলের হস্তীদিগের মধ্যে 'রায় বাহাদুর'-বিশেষ। পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীরা ঘোড়ার কদম-চাল[১০] বড়ই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। কিন্তু হাতীর কদম-চাল যে সম্ভবে, আমার বিশ্বাস ছিল না। এই হাতীটি কদম-চালের জন্য প্রসিদ্ধ। ঐরাবত দেবরাজের বাহন হউক, কিন্তু এমন সুখকর বাহন আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু এই হাতীটী এমন সুন্দর কদমে পা ফেলিয়া দ্রুতবেগে চলিল যে, এক অপূর্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম।

কিছু দূর গেলেই জঙ্গলে উপস্থিত হইলাম। তখন পশ্চাৎ হইতে কুঠারকর পরশুরামগণ[১১] আমাদের অগ্রবর্তী হইল। উহারা জঙ্গল কাটিয়া পথ করিয়া দিয়া আগে-আগে চলিল। হস্তীও ডাল ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিল। এইরূপে আমরা জনমানব-শূন্য বন-পথে চলিলাম। স্থানে স্থানে বন-ঘুঘুর গভীর কণ্ঠ, বনকুক্কুটের পঞ্চম ধ্বনি, গো-মহিষের কণ্ঠ-লগ্ন বংশ-ঘণ্টা, রাখালগণের উচ্চ সম্ভাষণ ও গীত, সেই নির্জনতার বক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছিল। কোথাও বা হরিণ-কণ্ঠে শিখরমালা প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এবং শার্দুলের জৃম্ভণে হৃৎকম্প উপস্থিত করিতেছে। আমাদের তিনজনের হস্তস্থিত আগ্নেয়াস্ত্রে তখন অজ্ঞাতসারে হাত পড়িতেছে। কিন্তু অগ্রবর্তী কুঠারধারী বন-কাঠুরিয়াগণ তাহাতে কর্ণপাত করিতেছে না। নির্ভয়ে স্ব স্ব কার্য করিয়া বন আলোড়িত করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

আমরা ক্রমে শেরগড় পর্বতের পাদমূলে উপস্থিত হইলাম। একটী এরূপ বিস্তৃত পথ সুকৌশলে গিরি-অঙ্গ কাটিয়া নির্মিত হইয়াছে যে, আমরা অনায়াসেই হস্তীর পৃষ্ঠে গিরিশিখরের উপর উত্তীর্ণ হইলাম। শেরগড় একটী মনোহর পার্বত্য দুর্গ। শিখরের প্রান্তভাগে যেখানে-যেখানে শত্রুর আরোহণ করিবার সম্ভাবনা, সেখানে দুর্গপ্রাচীর

নির্মিত হইয়াছে। শিখরের মধ্যস্থলে কলিকাতার চক-মিলানো[১২] বাড়ীর মত অতি বিস্তৃত রাজপ্রাসাদ। তাহার প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটী সুড়ঙ্গ[১৩]। সুন্দর সুনির্মিত সোপানাবলীর দ্বারা সুড়ঙ্গ-পথে অবতীর্ণ হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা আর ভুলিবার নহে। উপরে যেরূপে প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছে, গিরিগর্ভেও উপরিস্থিত প্রাসাদের নিম্নে সেরূপ একটী বৃহৎ প্রাঙ্গণের চারিপার্শ্বে প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে সুড়ঙ্গ-পথে তাহাতে সুন্দর আলোক প্রবেশ করিতেছিল, এবং গৃহাবলী পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। পাঠান-মোগলদিগের প্রবল সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু অপূর্ব গিরিগর্ভস্থ অট্টালিকার অমল ধবল বর্ণ এবং বিচিত্র ফলপুষ্পপল্লবে চিত্রিত লতার রঙ পর্যন্ত এই কয়েক শত বর্ষে মলিন হয় নাই ; উপরিস্থিত অট্টালিকার ছাতে উঠিয়া চারিদিকে দেখিলাম—কি মনোহর শোভা! মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া এমন শোভা আর দেখি নাই। শেরগড়ের চারিদিকে প্রথম বিস্তৃত আরণ্য শোভা, তাহার পর গ্রামাবলী ও নানা বর্ণের শস্য-শোভিত অনন্ত অসংখ্য প্রান্তর। স্থানে স্থানে ক্ষীণ-কলেবরা পার্বত্য নদী ও নদ, শ্বেত পুষ্প-হারের মত পূর্বাহ্ণের সূর্য-করে শোভা পাইতেছে। প্রান্তচারী গো-মহিষাদিকে যেন নানাবর্ণের ক্ষুদ্র প্রান্তর-জাত পুষ্পের মত বোধ হইতেছে। বহুক্ষণ নয়ন ভরিয়া এই শোভা দেখিয়া, আমরা শেরগড় হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

আমাদের পথ-প্রদর্শক ও পরিষ্কারক পরশুরামগণ বলিল যে, অনতিদূরে এক গিরিগর্ভে একটী প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ আছেন। ভারতবর্ষের 'নও-নাথ'-এর—অর্থাৎ সোমনাথ, শম্ভুনাথ, চন্দ্রনাথ, আদিনাথ, বৈদ্য-নাথ প্রভৃতির—মধ্যে ইনি নবম নাথ। আমি শিবলিঙ্গের নামটী এখন ভুলিয়া গিয়াছি। সেখানে ফাল্গুন মাসে একটি মেলা হইয়া থাকে।

নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে, সঙ্গিগণ কিঞ্চিৎ আপত্তি করিয়া সে পথে প্রত্যাবর্তন করা স্থির করিলেন। আমরা পূর্ববৎ অরণ্য ভেদ করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে সেই তীর্থে উপস্থিত হইলাম। একটী শৈল-শ্রেণী চলিয়া গিয়াছে, তাহার পাদমূলে এক স্থানে গিরি-অঙ্গে একটী সুড়ঙ্গ। তাহার প্রবেশ-স্থান ভারী পাথরে বাঁধানো এবং পাথরের সোপানে সজ্জিত। সোপানের এক পার্শ্বে একটী সন্ন্যাসী এই মহা অরণ্যের মধ্যে বসিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা কিঞ্চিৎ আলাপ করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে সঙ্গী কনস্টেবলগণ গো-মহিষ-চারক আহীরগণ[১৪] হইতে একটা মশাল ও কিঞ্চিৎ ঘৃত, দধি ও দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া আনিল। আমরা সেই মশালের সাহায্যে সেই শৈল-সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলাম। অতি ভয়ানক সুড়ঙ্গটী মনুষ্য-কৃত নহে। তিন-চার হাত উর্দ্ধ, এবং তিন-চার হাত আয়ত। উপর হইতে স্থানে স্থানে টপ্‌ টপ্‌ করিয়া জল পড়িতেছে। পথ শিলাখণ্ডময় ও পিচ্ছিল। উভয় পার্শ্বে নানা অবয়বে খণ্ড খণ্ড শিলা ভীম অঙ্গ বহির্গত করিয়া রহিয়াছে। একবার পা টলিলে, পার্শ্বস্থ কি পদতলস্থ শিলায় জীবলীলা শেষ হইবে। সঙ্গের কনস্টেবলগণ উচ্চৈঃস্বরে "হর হর বম্‌ বম্‌!" বলিয়া শ্রীভগবানের নাম করিতেছে, আর সকলে সেই মশালের আলোকে অতি সাবধানে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছি। সুড়ঙ্গটীকে একটী বৃহৎ মূষিক-বিবর বলিলেও হয়। ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেক সঙ্কট-স্থল পার হইয়া, শিলারূপী অনেক দেবদেবী ও 'ভয়রো' বা ভৈরব দর্শন করিয়া, অবশেষে সেই নবম-নাথের কাছে উপস্থিত হইলাম। বিবরের মধ্যস্থলে অনুমান দুই হাত উচ্চ একখণ্ড শিবলিঙ্গাকৃতি শৈলখণ্ড ;—যেন গিরিবক্ষ হইতে একটী শৈলবিম্ব উঠিয়াছে। উপর হইতে অবিরল জলবিন্দু তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে পড়িতেছে, এবং এরূপ অজস্র জলবিন্দু-পাতে

তাঁহার সর্বাঙ্গ ও উপরিস্থিত সুড়ঙ্গ-শৈল জটায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। দেখিতে অপূর্ব শোভা। কনস্টেবলগণ নবম-নাথের জটা-শ্রেণীর উপর দধি-দুগ্ধের ধারা ঢালিতে লাগিল, এবং বন-পুষ্প-বর্ষণ করিয়া আনন্দে 'হর হর বম্ বম্' ধ্বনিতে বিবর্ণ করিতে লাগিল। একে এই ঘূর্ণাবর্ত বিবরের এই দুই স্থানে বাতাস প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই, তাহাতে মশালের আগুনে স্থানটী এরূপ গরম হইয়া উঠিল যে, পশ্চিমের সেই দারুণ অস্থিভেদী মাঘ মাসের শীতেও আমাদের সর্বশরীরে স্বেদ-ধারা বহিতে লাগিল। নয়ন ভরিয়া নবম-নাথকে দর্শন করিয়া আমরা প্রত্যাবর্তন করিলাম।

যখন বিবর হইতে বহির্গত হইলাম, তখন ঠিক যেন একটা অগ্নি-পরীক্ষা শেষ হইল। আমার সমস্ত পরিচ্ছদ এরূপ ঘর্মাক্ত হইয়াছে যে, ঠিক যেন স্নান করিয়াছি। কিছুক্ষণ বিবর-মুখে বসিয়া প্রচুর বিশ্রাম করিয়া ও খাদ্য যাহা 'বহুরিয়া' সঙ্গে দিয়াছিলেন তাহা উদরস্থ করিয়া, আমরা অন্য পথে শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সমস্ত পথ পর্বতময়, প্রাকৃতিক শোভার রঙ্গভূমি। অপরাহ্ণ ও সান্ধ্য ছায়ায় সেই গিরি-পাদমূলে, কখন কখন বা গিরি-পৃষ্ঠে, শৈলনির্ঝরিণী-তীরবাহী পথে হস্তিপৃষ্ঠে পর্যটনে নবযৌবনোচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে যে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা হৃদয়ে যেন আজিও জাগিয়া রহিয়াছে।

রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময়ে শিবিরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, শিবিরে পত্নী ও পার্শ্বস্থ অট্টালিকায় 'বহুরিয়া' চিন্তান্বিতা হইয়া রহিয়াছেন। 'বহুরিয়া'র লোক প্রতিমুহূর্তে আসিয়া সংবাদ লইতেছিল। তিনি সমস্ত দিন অনাহারে আমার নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য আহ্নিকে বসিয়া শ্রীভগবান্‌কে ডাকিতেছিলেন। রাত্রি হওয়াতে তিনি বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

সপ্তাহ-কাল এখানে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। 'বহুরিয়া'র একটী মাত্র, আমার স্ত্রীর সমবয়স্কা, কন্যা ছিলেন ; তিনি মাতৃহৃদয় শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার দেশের ও বংশের নিয়মানুসারে আমার শিবিরে আসা 'বহুরিয়া'র সাধ্যাতীত ; অথচ তিনি আমার স্ত্রীকে দেখিতে বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দাসীগণ সমস্ত দিন শিবিরে যাতায়াত করিত, এবং তাঁহার স্বহস্তের কতই খাদ্য আনিত, কিন্তু আমি এমনিই অঙ্গদের সিংহাসনারূঢ়[১৫] যে আমলাগণ বলিলেন, আমার স্ত্রী 'বহুরিয়া'র বাড়ীতে গেলে হাকিমী[১৬] সম্মানের বহির্ভূত কার্য হইবে। আমরা যখন চলিয়া আসি, শুনিলাম তিনি বাতায়নে বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেছিলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, স্ত্রীর পালকী তাঁহার দেউড়ীর সম্মুখে একবার এক মুহূর্তের জন্য রাখিলে তিনি তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার কন্যার শোক ভুলিবেন। হাকিমত্ব অতল সলিলে ডুবুক! আমি আর থাকিতে পারিলাম না, স্ত্রীর পালকী সেখানে পাঠাইলাম। তিনি মাতার মত স্ত্রীকে বুকে লইয়া, কি একটা বহুমূল্য উপহার দিয়াছিলেন। স্ত্রী তাহা লইলেন না—তিনি কাঁদিতেছিলেন, আমরা-ও তাঁহার স্নেহ-রাজ্য হইতে শুষ্ক চক্ষে আসিতে পারি নাই।

১ মফস্বল—এই বানানটী লক্ষণীয়—ঠিক-মত শব্দটীর বানান হওয়া উচিত 'মুফস্‌সল্' ; 'স্‌স'-এর সংযুক্ত-ব্যঞ্জনবর্ণ বাঙ্গালা ছাপার অক্ষরে না থাকায়, এই কিম্ভুত উপায়ে দ্বিত্ব-স-কে জানাইবার চেষ্টা। মূল রূপ—আরবী 'মুফস্‌সল', অর্থ—'পৃথক্-কৃত, বিভক্ত', তাহা হইতে 'দেশের বিভাগ, প্রদেশ, জেলা', তদনন্তর 'পল্লী-অঞ্চল, শহর হইতে দূর পল্লী'। Private বা 'নিজ' অথবা 'খাস' অর্থে 'মফস্বল' শব্দ কখনও-কখনও বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়—Public—সদর, Private—মফস্বল।

২ বেদিয়া—যাহারা নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, কোথাও স্থায়ী ভাবে বাস করে না ; 'যাযাবর'।

৩ রাউটী—হিন্দী 'রাবটী, রাওটী'—ছোট চতুষ্কোণ তাঁবু। প্রাসাদের ছাতের উপর ছোট ঘরকেও 'রাওটী' বলে। ভারতবর্ষে ব্যবহৃত ইংরেজীতে এই শব্দটী rowtie রূপে গৃহীত হইয়াছে।

৪ কাছারী—কার্য-নির্বাহ-স্থান; সংস্কৃত 'কৃত্য-গৃহ', প্রাকৃত 'কচ্চঘর, কচ্চহর', তাহা হইতে ঈ-প্রত্যয় যোগে বাঙ্গালীর 'কাছারী। এটী আমাদের ভারতীয় শব্দ; ফারসী 'দপ্তর', ইংরেজী 'আপিস, অফিস' এখন এই শব্দটাকে অনেকটা বেদখল করিয়াছে।

৫ ইন্দারা—বড় পাকা কুয়াকে পশ্চিমে 'ইন্দারা' বলে। 'ইন্দারা'—'ইন্দ্রাগার' শব্দ হইতে; যেন মেঘ, বৃষ্টি ও বৃষ্টি-জলের দেবতা ইন্দ্র এইরূপ কূপের মধ্যে অবস্থান করেন, ইহাতে জলের অভাব হয় না।

৬ ভাল আব-হাওয়ার গুণে মানুষের জীবনীশক্তি স্ফূর্তিযুক্ত হয়, কেবল জীবন-ধারণেই যেন একটা অবসাদহীন আনন্দ আসে। এই ভাবকে ফরাসী (ও ইংরেজীতে) joie de vivre (joy of living) বলে।

৭ বহুরিয়া—বাঙ্গালায় 'বহুড়ী', সংস্কৃতে 'বধূটিকা' বা 'বধূটী'। (পুরাতন বাঙ্গালায় আর একটী অনুরূপ শব্দ আছে 'বহুয়ারী', ইহা সংস্কৃত 'ব্যবহারিকা' শব্দ হইতে উদ্ভুত, ইহার মৌলিক অর্থ—'সেবিকা', তদনন্তর 'গৃহস্থ-বাড়ীর নূতন বউ')।

৮ শেরগড়—'শের-গঢ়' শব্দের অর্থ 'বাঘের (বা সিংহের) কেল্লা'।

৯ ওয়েলর—Waler, অষ্ট্রেলিয়া-দেশ-জাত ভাল জাতির ঘোড়া। অষ্ট্রেলিয়ার প্রদেশ New South Wales-এর Wales শব্দ হইতে।

১০ কদম-চাল—এক সময়ে চার পা তুলিয়া ছোটাকে 'কদম-চালে' ছোটা (gallop) বলে। কেবল এক পাশের দুই পা তুলিয়া ছোটাকে 'দুল্‌কী' (canter) বলে।

১১ পরশুরামগণ—পরশুরামের অস্ত্র কুঠার, এবং এই কাঠুরিয়াদের-ও অস্ত্র কুঠার; রহস্য করিয়া ইহাদিগকে 'পরশুরাম' বলা হইয়াছে।

১২ চক-মিলানো বাড়ী—যে বাড়ীর মধ্যে চক বা চতুষ্কময় আঙ্গিনা ও তাহার চারিদিকে একতলা বা দুতলা অলিন্দ ও প্রকোষ্ঠ-শ্রেণী আছে।

১৩ সুড়ঙ্গ (বা সুরঙ্গ)—এটী প্রাচীন ভারতীয় কথ্য ভাষায় ও সংস্কৃতে আগত

একটী গ্রীক শব্দ—গ্রীক surinks বা syrinx হইতে (এই গ্রীক শব্দ হইতে আবার ইংরেজী syringe—'পিচকারী' শব্দ আসিয়াছে)।

১৪ আহীর—সংস্কৃত 'আভীর'; পশ্চিমের (উত্তর-ভারতের) গোপালক বা গোয়ালা।

১৫ অঙ্গদের সিংহাসনারূঢ়—বানর-রাজকুমার অঙ্গদকে রামচন্দ্রের দূত-রূপে রাবণের সভায় পাঠানো হয়। অঙ্গদ রাবণকে অপদস্থ করিবার জন্য মায়াবলে নিজের লাঙ্গুলকে অতি দীর্ঘ করিয়া, সাপের মত তাহা পাকাইয়া রাবণের সিংহাসনের চেয়ে উঁচু আসনের মত করিয়া লইয়া উপবেশন করেন। এই কথা কৃত্তিবাসের বাঙ্গালা রামায়ণে 'অঙ্গদ রায়বার' অংশে আছে। সরকারী পদের গৌরব এই লাঙ্গুল-বৃদ্ধি-জাত উচ্চাসনমাত্র, এই রহস্য করিয়া নবীনচন্দ্র লিখিতেছেন।

১৬ হাকিম—ন্যায়াধীশ, বিচারক। হাকিমের কার্য 'হাকিমী'।

ঘর ও বাহির

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

বঙ্গ-গৌরব, ভারত-গৌরব ও বিশ্ব-গৌরব কবি রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবন-চরিত বাঙ্গালা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্য-গ্রন্থ। "জীবনস্মৃতি" নামে এই বই "প্রবাসী" পত্রিকায় ধারা-বাহিক রূপে প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৯১০—১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাতে কবি অতি মনোহর ভাবে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সঙ্গে-সঙ্গে আপনার ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রদর্শন করিয়াছেন। উদ্ধৃত অংশে কবির শিশুকালের ও বাল্যের কথা আছে। তাঁহার চারিদিকে যে বাহিরের জগৎ তাঁহাকে ঘিরিয়া ছিল, তখন তাঁহার মনে এই জগতের ছাপ যে ভাবে পড়িয়াছিল, পরিণত বয়সে কবি তাহার আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে একটী শিশু-মন, বহির্জগৎ-সম্বন্ধে অসীম রহস্য-বোধের ভিতর দিয়া কি করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহার অনুধাবন করা যাইবে।

আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়। মোটের উপর, তখনকার জীবন-যাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক

বেশি সাদাসিধা ছিল। তখনকার কালের ভদ্রলোকের মান-রক্ষার উপকরণ দেখিলে, এখনকার কাল লজ্জায় তাহার সহিত সকল প্রকার সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে চাহিবে। এই তো তখনকার কালের বিশেষত্ব। তাহার পর আবার বিশেষ ভাবে আমাদের বাড়িতে ছেলেদের প্রতি অত্যন্ত বেশি দৃষ্টি দিবার উৎপাত একেবারেই ছিল না। আসলে, আদর করা ব্যাপারটা অভিভাবকদেরই বিনোদনের জন্য, ছেলেদের পক্ষে এমন বালাই আর নাই।

আমরা ছিলাম চাকরদেরই শাসনের অধীনে। নিজেদের কর্তব্যকে সরল করিয়া লইবার জন্য তাহারা আমাদের নাড়াচাড়া এক প্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেদিকে বন্ধন যতই কঠিন থাক্, অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা—সেই স্বাধীনতায় আমাদের মন মুক্ত ছিল। খাওয়ানো পরানো সাজানো গোছানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে চারি দিক হইতে একেবারে ঠাসিয়া ধরা হয় নাই।

আহারে আমাদের সৌখিনতার[১] গন্ধও ছিল না। কাপড়-চোপড়[২] এতই যৎসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে, সম্মান-হানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনো দিন কোনো কালেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। ইহাতে কোনো দিন অদৃষ্টকে দোষ দেই নাই। কেবল আমাদের বাড়ির দরজী নেয়ামত খলিফা[৩] অবহেলা করিয়া আমাদের জামায় পকেট-যোজনা অনাবশ্যক মনে করিলে দুঃখ বোধ করিতাম,—কারণ এমন বালক কোনো অকিঞ্চনের ঘরে জন্ম-গ্রহণ করে নাই, পকেটে রাখিবার মতো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহার কিছু মাত্র নাই। বিধাতার কৃপায় শিশুর ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ধনী ও নির্ধনের ঘরে বেশি কিছু

তারতম্য দেখা যায় না। আমাদের চটি জুতা একজোড়া থাকিত। কিন্তু পা দুটা যেখানে থাকিত, সেখানে নহে। প্রতি পদক্ষেপে তাহাদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম—তাহাতে যাতায়াতের সময় পদ-চালনা অপেক্ষা জুতা-চালনা এত বাহুল্য পরিমাণে হইত যে, পাদুকা-সৃষ্টির উদ্দেশ্য পদে-পদে ব্যর্থ হইয়া যাইত।

আমাদের চেয়ে যাঁহারা বড়ো, তাঁহাদের গতি-বিধি, বেশ-ভূষা আহার-বিহার, আরাম-আমোদ, আলাপ-আলোচনা সমস্তই আমাদের কাছ হইতে বহু দূরে ছিল; তাহার আভাস পাইতাম, কিন্তু নাগাল পাইতাম না। এখনকার কালে ছেলেরা গুরুজনদিগকে লঘু করিয়া লইয়াছে; কোথাও তাহাদের কোনো বাধা নাই এবং না চাহিতেই তাহারা সমস্ত পায়। আমরা এত সহজে কিছুই পাই নাই। কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল; বড়ো হইলে কোনো এক সময়ে পাওয়া যাইবে, এই আশায় তাহাদিগকে দূর ভবিষ্যতের জিম্মায় সমর্পণ করিয়া বসিয়া ছিলাম। তাহার ফল হইয়াছিল এই যে, তখন সামান্য যাহা কিছু পাইতাম তাহার সমস্ত রসটুকু পুরা আদায় করিয়া লইতাম, তাহার খোসা হইতে আঁটি পর্যন্ত কিছুই ফেলা যাইত না। এখনকার সম্পন্ন ঘরের ছেলেদের দেখি, তাহারা সহজেই সব জিনিস পায় বলিয়া তাহার বারো-আনাকেই আধখানা কামড় দিয়া বিসর্জন করে—তাহাদের পৃথিবীর অধিকাংশই তাহাদের কাছে অপব্যয়েই নষ্ট হয়।

বাহির-বাড়িতে দোতলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত।

আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি। সে আমাকে

ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ্। বিপদ্টা আধিভৌতিক, কি আধিদৈবিক, স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না; কিন্তু মনে বড় একটা আশঙ্কা হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতার কী সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, এই জন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।

জানালার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্ব ধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট, দক্ষিণ ধারে নারিকেল-শ্রেণী। গণ্ডি-বন্ধনের বন্দী আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির মতো দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত। কেহ বা দুই কানে আঙুল চাপিয়া ঝুপ্-ঝুপ্ করিয়া দ্রুত বেগে কতকগুলা ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত; কেহ বা ডুব না দিয়া গামছায় জল তুলিয়া ঘন ঘন মাথায় জল ঢালিতে থাকিত; কেহ বা জলের উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্য বার বার দুই হাতে জল কাটাইয়া এক সময়ে ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত; কেহ বা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিত; কেহ বা জলের মধ্যে নামিতে নামিতে এক নিঃশ্বাসে কতকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া লইত; কেহ বা ব্যস্ত, কোনো মতে স্নান সারিয়া লইয়া বাড়ি যাইবার জন্য উৎসুক; কাহারো বা ব্যস্ততার লেশ-মাত্র নাই, ধীরে-সুস্থে স্নান করিয়া গা মুছিয়া কাপড় ছাড়িয়া, কোঁচাটা দুই তিন

বার ঝাড়িয়া বাগান হইতে কিছু বা ফুল তুলিয়া, মৃদুমন্দ দোদুল গতিতে স্নান-স্নিগ্ধ শরীরের আরামটিকে বায়ুতে বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা। এমনি করিয়া দুপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য, নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলা সারা বেলা ডুব দিয়া গুগ্‌লি তুলিয়া খায়, এবং চঞ্চুচালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালখ সাফ করিতে থাকে।

পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে, সেই বট-গাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে, বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রম-ক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গিয়াছে। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্ন-যুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম, এবং তাহাদের ক্রিয়া-কলাপ যে কি রকম, আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব। সেই বটকেই উদ্দেশ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম—

নিশি-দিসি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় ল'য়ে জট,
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট ?

কিন্তু হায়, এখন সে বট কোথায়! যে পুকুরটি এই বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দর্পণ ছিল, তাহাও এখন নাই; যাহারা স্নান করিত, তাহারাও অনেকেই এই অন্তর্হিত বটগাছের ছায়ারই অনুসরণ করিয়াছে। আর সেই বালক আজ বাড়িয়া উঠিয়া নিজের চারিদিক্ হইতে নানাপ্রকারের ঝুরি নামাইয়া দিয়া বিপুল জটিলতার মধ্যে সুদিন-দুর্দিনের ছায়া-রৌদ্রপাত গণনা করিতেছে।

বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল; এমন কি বাড়ির

ভিতরেও আমরা যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেই জন্ত বিশ্ব-প্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারী পদার্থ ছিল, যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানালার[৪] নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের[৫] ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেই জন্ত প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই। বড়ো হইয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে—

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে।
বনের পাখি বলে—"খাঁচার পাখি আয়,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।"
খাঁচার পাখি বলে—"বনের পাখি, আয়,
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।"
বনের পাখি বলে—"না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।"
খাঁচার পাখি বলে—"হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব!"

আমাদের বাড়ির ভিতরের ছাতের প্রাচীর আমার মাথা ছাড়াইয়া উঠিত। যখন একটু বড়ো হইয়াছি, এবং চাকরদের শাসন কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে, যখন বাড়িতে নূতন বধূর সমাগম হইয়াছে এবং অবকাশের সঙ্গী রূপে তাঁহাদের আশ্রয়লাভ করিতেছি, তখন এক-এক দিন মধ্যাহ্নে সেই ছাতে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। তখন বাড়িতে সকলের আহার শেষ হইয়া গিয়াছে; গৃহকর্মে ছেদ পড়িয়াছে, অন্তঃপুর বিশ্রামে নিমগ্ন; স্নান-সিক্ত শাড়িগুলি ছাতের কার্নিসের উপর হইতে ঝুলিতেছে; উঠানের কোণে যে উচ্ছিষ্ট ভাত পড়িয়া আছে তাহারই উপর কাকের দলের সভা বসিয়া গেছে। সেই নির্জন অবকাশে প্রাচীরের রন্ধ্রের ভিতর হইতে এই খাঁচার পাখির সহিত ঐ বনের পাখির চঞ্চুতে চঞ্চুতে পরিচয় চলিত। দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকিতাম—চোখে পড়িত আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগান-প্রান্তের নারিকেল-শ্রেণী; তাহারই ফাঁক দিয়া দেখা যাইত, সিঙ্গির-বাগান পল্লীর একটা পুকুর, এবং সেই পুকুরের ধারে, যে তারা গয়লানী আমাদের দুধ দিত তাহারই গোয়াল-ঘর; আরও দূরে দেখা যাইত, তরু-চূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা শহরের নানা আকারের ও নানা আয়তনের উচ্চ-নীচ ছাতের শ্রেণী মধ্যাহ্নের রৌদ্রে প্রখর শুভ্রতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্বদিগন্তে পাণ্ডুবর্ণের নীলিমার মধ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই-সকল অতিদূর বাড়ির ছাতে এক একটি চিলে-কোঠা উঁচু হইয়া থাকিত, মনে হইত তাহারা যেন নিশ্চল তর্জনী তুলিয়া চোখ টিপিয়া আপনার ভিতরকার রহস্য আমার কাছে সঙ্কেতে বলিবার চেষ্টা করিতেছে। ভিক্ষুক যেমন প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজভাণ্ডারের রুদ্ধ সিন্দুকগুলার মধ্যে অসম্ভব রত্ন-মাণিক কল্পনা করে, আমিও তেমনি অজানা বাড়িগুলিকে কত খেলা কত স্বাধীনতায় আগা-গোড়া বোঝাই-

করা মনে করিতাম তাহা বলিতে পারি না। মাথার উপরে আকাশ-ব্যাপী খর দীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ডাক আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত, এবং সিঙ্গির-বাগানের পাশের গলিতে দিবা-সুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলির সম্মুখ দিয়া পসারী সুর করিয়া "চাই চুড়ি চাই, খেলনা চাই" হাঁকিয়া যাইত—তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।

পিতৃদেব প্রায়ই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, বাড়িতে থাকিতেন না। তাঁহার তেতলার ঘর বন্ধ থাকিত। খড়খড়ি খুলিয়া হাত গলাইয়া ছিটকিনি টানিয়া দরজা খুলিতাম, এবং তাঁহার ঘরের দক্ষিণ প্রান্তে একটি সোফা ছিল—সেইটিতে চুপ করিয়া পড়িয়া আমার মধ্যাহ্ন কাটিত। একে তো অনেক দিনের বন্ধকরা ঘর, নিষিদ্ধপ্রবেশ, সে ঘরে যেন একটা রহস্যের ঘন গন্ধ ছিল। তাহার পরে সম্মুখের জনশূন্য খোলা ছাতের উপর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিত, তাহাতেও মনটাকে উদাস করিয়া দিত। তার উপরে আরো একটা আকর্ষণ ছিল। তখন সবে-মাত্র শহরে জলের কল হইয়াছে। তখন নূতন মহিমার ঔদার্যে বাঙালি-পাড়াতেও তাহার কার্পণ্য শুরু হয় নাই। সেই জলের কলের সত্যযুগে[৬] আমার পিতার স্নানের ঘরে তেতলাতেও জল পাওয়া যাইত। ঝাঁঝরি খুলিয়া দিয়া অকালে মনের সাধ মিটাইয়া স্নান করিতাম। সে স্নান আরামের জন্য নহে, কেবলমাত্র ইচ্ছাটাকে লাগাম ছাড়িয়া দিবার জন্য। একদিকে মুক্তি, আর একদিকে বন্ধনের আশঙ্কা এই দুইয়ে মিলিয়া কোম্পানির[৭] কলের জলের ধারা আমার মনের মধ্যে পুলক-শর বর্ষণ করিত।

বাহিরের সংস্রব আমার পক্ষে যতই দুর্লভ থাক্, বাহিরের আনন্দ আমার পক্ষে হয় তো সেই কারণেই সহজ ছিল। উপকরণ প্রচুর

থাকিলে মনটা কুড়ে[৮] হইয়া পড়ে, সে কেবল বাহিরের উপরই সম্পূর্ণ বরাত দিয়া বসিয়া থাকে,—ভুলিয়া যায়, আনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর। শিশুকালে মানুষের সর্বপ্রথম শিক্ষাটাই এই। তখন তাহার সম্বল অল্প এবং তুচ্ছ; কিন্তু আনন্দ-লাভের পক্ষে ইহার চেয়ে বেশি তাহার কিছুই প্রয়োজন নাই। সংসারে যে হতভাগ্য শিশু খেলার জিনিস অপর্যাপ্ত পাইয়া থাকে, তাহার খেলা মাটি হইয়া যায়।

বাড়ির ভিতরে আমাদের যে বাগান ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশি বলা হয়। একটা বাতাবি লেবু[৯], একটা কুল-গাছ, একটা বিলাতি আমড়া ও এক সার নারিকেল-গাছ তাহার প্রধান সম্বতি। মাঝখানে ছিল একটা গোলাকার বাঁধানো চাতাল। তাহার ফাটলের রেখায় রেখায় ঘাস ও নানাপ্রকার গুল্ম অনধিকার-প্রবেশ-পূর্বক জবর-দখলের পতাকা[১০] রোপণ করিয়াছিল। যে ফুলগাছগুলা অনাদরেও মরিতে চায় না, তাহারাই মালীর নামে কোন অভিযোগ না আনিয়া, নিরভিমানে যথাশক্তি আপন কর্তব্য পালন করিয়া যাইত। উত্তর কোণে একটা ঢেঁকিঘর ছিল, সেখানে গৃহস্থালির প্রয়োজনে মাঝে-মাঝে অন্তঃপুরিকাদের সমাগম হইত। কলিকাতায় পল্লীজীবনের সম্পূর্ণ পরাভব স্বীকার করিয়া, এই ঢেঁকিশালটি কোনো একদিন নিঃশব্দে মুখ ঢাকিয়া অন্তর্ধান করিয়াছে। প্রথম মানব আদমের স্বর্গোদ্যানটি যে আমাদের এই বাগানের চেয়ে বেশি সুসজ্জিত ছিল, আমার এরূপ বিশ্বাস নহে। কারণ, প্রথম মানবের স্বর্গলোক আবরণ-হীন—আয়োজনের দ্বারা সে আপনাকে আচ্ছন্ন করে নাই। জ্ঞান-বৃক্ষের ফল[১১] খাওয়ার পর হইতে যে পর্যন্ত না সেই ফলটাকে সম্পূর্ণ হজম করিতে পারিতেছে সে পর্যন্ত মানুষের সাজ-সজ্জার প্রয়োজন

কেবল বাড়িয়া উঠিতেছে। বাড়ির ভিতরের বাগান আমার সেই স্বর্গের বাগান ছিল—সেই আমার যথেষ্ট ছিল। বেশ মনে পড়ে, শরৎকালের ভোর-বেলায় ঘুম ভাঙিলেই সেই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। একটি শিশির-মাখা ঘাস-পাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত, এবং স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি লইয়া আমাদের পূর্বদিকের প্রাচীরের উপর নারিকেল-পাতার কম্পমান ঝালরগুলির তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত।

আমাদের বাড়ির উত্তর অংশে আর একখণ্ড ভূমি পড়িয়া আছে, আজ পর্যন্ত ইহাকে আমরা গোলা-বাড়ি বলিয়া থাকি। এই নামের দ্বারা প্রমাণ হয়, কোনো এক পুরাতন সময়ে ওখানে গোলা করিয়া সংবৎসরের শস্য রাখা হইত—তখন শহর এবং পল্লী অল্প বয়সের ভাই-ভগিনীর মতো অনেকটা একরকম চেহারা লইয়া প্রকাশ পাইত, এখন দিদির সঙ্গে ভাইয়ের মিল খুঁজিয়া পাওয়াই শক্ত।

ছুটির দিনে সুযোগ পাইলেই এই গোলা-বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম। খেলিবার জন্য যাইতাম বলিলে ঠিক বলা হয় না। খেলাটার চেয়ে এই জায়গাটার-ই প্রতি আমার টান বেশি ছিল। তাহার কারণ কী বলা শক্ত। বোধ হয়, বাড়ির কোণের একটা নিভৃত পোড়ো[১২] জায়গা বলিয়াই আমার কাছে তাহার কী একটা রহস্য ছিল। সে আমাদের বাসের স্থান নহে, ব্যবহারের স্থান নহে, সেটা কাজের জন্যও নহে, সেটা বাড়ি-ঘরের বাহির, তাহাতে নিত্য প্রয়োজনের কোনো ছাপ নাই, তাহা শোভাহীন অনাবশ্যক পতিত জমি, কেহ সেখানে ফুলের গাছও বসায় নাই, সেইজন্য এই উজাড়[১৩] জায়গাটায় বালকের মন আপন ইচ্ছা-মতো কল্পনায় কোনো বাধা পাইত না। রক্ষকদের শাসনের একটু মাত্র রন্ধ্র দিয়া, যে দিন কোনমতে

এইখানে আসিতে পারিতাম, সে দিন ছুটির দিন বলিয়াই বোধ হইত।

বাড়িতে আরো একটা জায়গা ছিল—সেটা যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত বাহির করিতে পারি নাই। আমার সমবয়স্কা খেলার সঙ্গিনী একটি বালিকা সেটাকে 'রাজার বাড়ি' বলিত। কখনো-কখনো তাহার কাছে শুনিতাম, "আজ সেখানে গিয়াছিলাম।" কিন্তু একদিনও এমন সুভযোগ হয় নাই, যখন আমিও তাহার সঙ্গ ধরিতে পারি। সে একটা আশ্চর্য জায়গা, সেখানে খেলাও যেমন আশ্চর্য, খেলার সামগ্রীও তেমনই অপরূপ। মনে হইত, সেটা অত্যন্ত কাছে, একতলায় বা দোতলায় কোনো একটা জায়গায়, কিন্তু কোনোমতে সেখানে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। কতবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি "রাজার বাড়ি কি আমাদের বাড়ির বাহিরে?" সে বলিয়াছে "না, এই বাড়ির মধ্যেই।" আমি বিস্মিত হইয়া বসিয়া ভাবিতাম, বাড়ির সকল ঘর-ই তো আমি দেখিয়াছি, কিন্তু সে-ঘর তবে কোথায়? রাজা যে কে, সে কথা কোনো দিন জিজ্ঞাসা করি নাই, রাজত্ব যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে, কেবল এইটুকু মাত্র পাওয়া গিয়াছে যে আমাদের বাড়িতেই সেই রাজার বাড়ি।

ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায়, সব-চেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে, এবং কখন্ যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই, এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, কী আছে বলো দেখি? কোন্‌টা থাকা যে অসম্ভব, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।

১ সৌখিনতা—বস্তু-বিশেষের প্রতি আসক্তি, বিলাস-প্রিয়তা। মূল শব্দটী আরবীর 'শৌক্' বা 'শওক্' শব্দ—অর্থ, 'আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, সাধ'; ইহা হইতে বিশেষণ, ফারসী প্রত্যয় 'ঈন্' যোগে—'শৌকীন্' বা 'শওকীন্'—'আসক্ত'। শব্দটী ভারতবর্ষে 'শৌখ' 'শৌখ্' রূপে প্রথম পরিবর্তিত হয়; পরে বাঙ্গালা ভাষায়, সংস্কৃত 'সখা, সুখ' এই শব্দদ্বয়ের প্রভাবে, ইহা 'সখ, সৌখিন (বা সৌখীন)' রূপে লিখিত হয়। বিদেশী শব্দে সংস্কৃত প্রত্যয় 'তা'-র যোগ লক্ষণীয়।

২ কাপড়-চোপড়—দুইটী শব্দ মিলিত হইয়া, 'ইত্যাদি' অর্থে দ্বন্দ্ব-সমাস হইয়াছে; দ্বিতীয় শব্দটী, প্রথমটীর 'অনুচর'-শব্দ; তদ্রূপ—'আলাপ-সালাপ, দোকান-পাট, হাঁড়ী-কুড়ী'। 'সহচর'-শব্দের সহিত, 'প্রতিচর'-শব্দের সহিত, 'বিকার'-শব্দের সহিত, 'অনুকার' শব্দের সহিত এবং 'অনুবাদ' শব্দের সহিত এই প্রকারের 'ইত্যাদি' অর্থে সমাস হয়; যথা—'জন-মানব, দৌড়-ধাপ (=দৌড়-ধাব্), ভাগ-বাঁটোয়ারা, ছেলে-ছোকরা, বেশ-ভূষা, গা-গতর, চুরি-ডাকাতি' (সহচর-শব্দ); 'দিন-রাত, রাজা-প্রজা মেয়ে-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান, জজ-ব্যারিষ্টার' (প্রতিচর-শব্দ); 'ঠাকুর-ঠুকুর, দোকান-দাকান, জারি-জুরি' (বিকার শব্দ); 'বাসন-কোসন, চাকর-বাকর, জল-টল, কাজ-কাজ, তেল-টেল' (অনুকার-শব্দ); 'লজ্জা-শরম, ধন-দৌলত, ঝাণ্ডা-নিশান, বাক্স-পেঁড়া, চা-খড়ি ('চাক্‌খড়ি' হইতে), পাঁউ-রুটি, ঠাট্টা-মস্‌করা' (অনুবাদ শব্দ)। এই রচনায় মধ্যে এই প্রকার আরও সমস্ত-পদ আছে, তাহা আলোচনার যোগ্য।

৩ দরজী নেয়ামত খলিফা—'খলীফা' শব্দ মূলে সম্মাননীয় পদবী-বাচক ছিল, নবী মোহম্মদের পরে যাঁহারা আরব-জাতির নেতা হন তাঁহাদের পদবী ছিল। পরে ইহার অর্থ ভারতে বৃত্তিবিশেষের নির্দেশক পদবীতে অবনীত হয়।

৪ জানালা ও ৫ গরাদে—এই দুইটী বাঙ্গালায় আগত পোর্তুগীস শব্দ—Janella ও grade ('ঝানেল্লা' ও 'গ্রাদি')।

৬ সত্যযুগ—জগতের ইতিহাস, প্রাচীন হিন্দু মতে, চারি যুগে বিভক্ত—'সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি'। যত এদিকে আসা যায়, তত পাপ এবং দুঃখের পরিণাম বাড়িয়া যাইতেছে। প্রাচীন ইউরোপীয় মতে Age of Gold, Age of Silver, Age of Iron—এই তিন যুগ।

৭ কোম্পানি East India Company,—অর্থাৎ 'প্রাচ্য-ভারত সঙ্ঘ' নামে ইংরেজ বণিক্-সম্প্রদায় খ্রীষ্টাব্দ ১৬০০-র দিকে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসে। ধীরে-ধীরে 'আধুনিক ইউরোপীয় শৃঙ্খলা-শক্তি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, যুদ্ধ-বিদ্যা' ইত্যাদির গুণে এই বণিক্-সঙ্ঘ, প্রথমে বাঙ্গালা দেশে, পরে ভারতের বহু অংশে, রাজ্যশাসনকারী শক্তিতে পরিণত হয়। বাঙ্গালা দেশে ইংরেজ অধিকার এই 'কোম্পানি'কে অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়; লোকে ইংলাণ্ডের রাজশক্তি বা রাজাকে জানিত না, তাহারা জানিত 'কোম্পানি'-কে; 'কোম্পানির রাজ্য' বাঙ্গালা দেশে ও অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের অবসানে কোম্পানির হাত হইতে ইংলাণ্ডের রাজশক্তি ভারত-শাসন-ভার গ্রহণ করে। কিন্তু পুরাতন 'নামে'র স্মৃতি এখনও চলিয়া আসিতেছে—এখনও দেশের জনসাধারণ জানে, ভারতের ইংরেজ-রাজ্য হইতেছে 'কোম্পানি'র রাজ্য। যাহা কিছু সরকারী, যাহা কিছু 'সাধারণ', তাহাই 'কোম্পানি'র। এই অর্থে, জন-মতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার 'মিউনিসিপালিটি' বা পৌর-শাসন-মণ্ডলী-ও 'কোম্পানি'র শামিল হইয়া গিয়াছে।

৮ 'কুড়ে' কথাটা 'কুড়িয়া' হইতে। 'কুঁড়ে' রূপেও পাওয়া যায়।

৯ বাতাবি লেবু—যবদ্বীপের Batavia শহরের নাম হইতে।

১০ জবর-দখলের পতাকা রোপণ—কাহারও গৃহ বা ভূ-সম্পত্তি জোর করিয়া দখল করা হইলে, দখলকার নিজ স্বত্ব-ঘোষণার জন্য ধ্বজ-দণ্ড সেই সম্পত্তির উপরে পুতিয়া দিত। আজকাল আদালতের হুকুমে এই কার্য হয়, এবং তাহাকে 'বাঁশগাড়ি' অর্থাৎ 'বাঁশ গাড়া (অর্থাৎ পোতা)' বলে।

১১ জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়া—য়িহুদী পুরাণের কথা। যিহোবা বা পরমেশ্বর আদি মানব আদম ও আদি মানবী এবা (বা হবা)-কে সৃষ্টি করিয়া, এক উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। উদ্যানের একটী গাছ ছাড়া আর সব গাছের ফলে তাঁহাদের অধিকার দিলেন। পাপ-পুরুষ শাতান (বা শয়তান)-এর প্ররোচনায় এবা ও আদম এই ফল খাইলেন। এই ফল জ্ঞান-বৃক্ষের ফল। ইহাদ্বারা ইঁহাদের জাগতিক জ্ঞান লাভ হইল বটে, কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করার দরুণ পতন হইল, ঈশ্বরের দয়ায় যে অবস্থায় তাঁহারা ছিলেন তাহার অবসান ঘটিল।

১২ পোড়ো—'পতিত' (জমি বা বাড়ী)। পড়্ ধাতু+উয়া-প্রত্যয়=‘পড়ুয়া’

—পতিত, 'অভিশ্রুতি'র নিয়ম অনুসারে কলিকাতা অঞ্চলে 'প'ড়ো', উচ্চারণে 'পোড়ো'। (তদ্রূপ 'জলুয়া—জ'লো, জোলো')।

১৩ উজাড়—যেখানে গাছ-পালা, বাড়ী-ঘর কিছুই নাই। সংস্কৃত উজ্‌ঝাট,—অর্থাৎ যেখানে 'ঝাড়' অর্থাৎ বৃক্ষ নাই।

দীনবন্ধু-জীবনী

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু, কবি ও নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের এই সংক্ষিপ্ত জীবনী তাঁহার মৃত্যুর তিন বৎসর পরে ১২৮৩ সালে প্রকাশিত করেন। দীনবন্ধু প্রথম যুগের বাঙ্গালা নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এবং হাস্য-রসের অবতারণায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বঙ্কিমের লিখিত এই নাতিদীর্ঘ চরিত্র-চিত্রণ হইতে দীনবন্ধুর ব্যক্তিত্বের ও তাঁহার প্রতিভার একটী সুন্দর দিগ্‌দর্শন হইবে। দীনবন্ধুর জীবৎকাল ১৮৩০-১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ।

দীনবন্ধুর জীবন-চরিত লিখিবার সময় এখনও হয় নাই। কোন ব্যক্তির জীবনের ঘটনা-পরম্পরার বিবৃতি মাত্র, জীবন-চরিতের উদ্দেশ্য নহে। কিয়ৎপরিমাণে তাহাও উদ্দেশ্য বটে; কিন্তু যিনি সম্প্রতি-মাত্র অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধীয় প্রকৃত ঘটনা-সকল বিবৃত করিতে হইলে, এমন অনেক কথা বলিতে হয় যে, তাহাতে জীবিত লোক লিপ্ত। কখনও কোনও জীবিত ব্যক্তির নিন্দা করিবার প্রয়োজন ঘটে, কখনও জীবিত ব্যক্তিদিগের অন্য প্রকার পীড়াদায়ক কথা বলিবার প্রয়োজন হয়; কখনও-কখনও গুহ্য কথা ব্যক্ত করিতে হয়; তাহা কাহারও-না-কাহারও পীড়াদায়ক হয়। আর, একজনের জীবন-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অন্য ব্যক্তি শিক্ষা প্রাপ্ত হউক,—ইহা যদি জীবন-চরিত-প্রণয়নের

যথার্থ উদ্দেশ্য হয়, তবে বর্ণনীয় ব্যক্তির দোষ গুণ উভয়ের-ই সবিস্তার বর্ণনা করিতে হয়। দোষ-শূন্য মনুষ্য পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করে নাই; দীনবন্ধুর-ও যে কোন দোষ ছিল না, ইহা কোন্ সাহসে বলিব? যে কারণেই হউক, এক্ষণে তাঁহার জীবন-চরিত লিখিতব্য নহে।

আর লিখিবার তাদৃশ প্রয়োজনও নাই। বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে না চিনিত কে? কাহার সঙ্গে তাঁহার আলাপ ও সৌহার্দ ছিল না? দীনবন্ধু যে প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা কে না জানে? সুতরাং জানাইবার তত আবশ্যকতা নাই।

এই সকল কারণে, আমি এক্ষণে দীনবন্ধুর প্রকৃত জীবন-চরিত লিখিব না; যাহা লিখিব তাহা পক্ষপাত-শূন্য হইয়া লিখিতে যত্ন করিব। দীনবন্ধুর স্নেহ-ঋণে আমি ঋণী; কিন্তু তাই বলিয়া আমি মিথ্যা প্রশংসার দ্বারা সে ঋণ পরিশোধ করিতে যত্ন করিব না।

পূর্ব-বাঙ্গালা রেইলওয়ের[১] কাঁচড়াপাড়া স্টেশনের কয় ক্রোশ পূর্বোত্তরে 'চৌবেড়িয়া'[২] নামে গ্রাম আছে। যমুনা নামে ক্ষুদ্র নদী এই গ্রামকে প্রায় চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে—এই জন্য ইহার নাম 'চৌবেড়িয়া'। এই গ্রাম দীনবন্ধুর জন্মভূমি। এই গ্রাম নদীয়া জেলার অন্তর্গত। বাঙ্গালা দেশে সাহিত্য, দর্শন এবং ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নদীয়া জেলার বিশেষ গৌরব আছে; দীনবন্ধুর নাম নদীয়ার আর একটি গৌরব-স্থল।

সন ১২৩৮ সালে দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালাচাঁদ মিত্রের পুত্র। তাঁহার বাল্য-কাল-সম্বন্ধীয় কথা অধিক বলিবার নাই। দীনবন্ধু অল্প বয়সে কলিকাতায় আসিয়া, হেয়ারস্কুলে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। সেই বিদ্যালয়ে থাকিতে-থাকিতেই তিনি বাঙ্গালা রচনা আরম্ভ করেন।

সেই সময়ে তিনি "প্রভাকর"-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের নিকট পরিচিত হন। বাঙ্গালা সাহিত্যের তখন বড় দুরবস্থা। তখন "প্রভাকর" সর্বোৎকৃষ্ট সংবাদ-পত্র। ঈশ্বরগুপ্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর একাধিপত্য করিতেন। বালকগণ তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইত। ঈশ্বরগুপ্ত তরুণ-বয়স্ক লোকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন। "হিন্দু-প্যাট্রিয়ট্" যথার্থই বলিয়াছিলেন, "আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে অনেকে ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য।" কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল কতদূর স্থায়ী বা বাঞ্ছনীয় হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। দীনবন্ধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লেখকের ন্যায়, এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বরগুপ্তের নিকট ঋণী। আপনাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না যে, এক্ষণকার পরিণাম ধরিতে গেলে, ঈশ্বরগুপ্তের রুচি তাদৃশ বিশুদ্ধ বা উন্নত ছিল না, বলিতে হইবে। তাঁহার শিষ্যেরা অনেকেই তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া অন্য পথে গমন করিয়াছেন[৩]। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনার মধ্যে ঈশ্বরগুপ্তের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, কেবল দীনবন্ধুতেই কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার চিহ্ন পাওয়া যায়।

"এলো চুলে বেণে বউ, আল্‌তা দিয়ে পায়,
নলক নাকে, কলসী কাঁখে, জল আন্‌তে যায়।"

ইত্যাকার কবিতায় ঈশ্বরগুপ্তকে স্মরণ হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে চারিজন রহস্য-পটু লেখকের নাম করা যাইতে পারে—টেকচাঁদ[৪], হুতোম[৫], ঈশ্বরগুপ্ত ও দীনবন্ধু। সহজেই বুঝা যায় যে, ইঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয় প্রথমের শিষ্য এবং চতুর্থ তৃতীয়ের শিষ্য। টেকচাঁদের সহিত হুতোমের যতদূর সাদৃশ্য, ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে দীনবন্ধুর ততদূর সাদৃশ্য না

থাকুক, অনেকদূর ছিল। প্রভেদ এই যে, ঈশ্বরগুপ্তের লেখায় wit বা ব্যঙ্গ প্রধান; দীনবন্ধুর লেখায় হাস্য প্রধান। কিন্তু ব্যঙ্গ এবং হাস্য উভয়বিধ রচনায় দুইজনেই পটু ছিলেন,—তুল্য পটু ছিলেন না। হাস্যরসে ঈশ্বরগুপ্ত দীনবন্ধুর সমকক্ষ নহেন।

আমি যতদূর জানি, দীনবন্ধুর প্রথম রচনা "মানব-চরিত্র" নামক একটী কবিতা। ঈশ্বরগুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত "সাধুরঞ্জন" নামক সাপ্তাহিক পত্রে উহা প্রকাশিত হয়। অতি অল্প বয়সের লেখা, এজন্য ঐ কবিতায় অনুপ্রাসের অত্যন্ত আড়ম্বর। ইহাও বোধ হয় ঈশ্বরগুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল। অন্যে ঐ কবিতা পাঠ করিয়া কিরূপ বোধ করিয়াছিলেন, বলিতে পারি না; কিন্তু উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিয়াছিল। আমি ঐ কবিতা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, এবং যতদিন সেই সংখ্যার "সাধুরঞ্জন"-খানি জীর্ণ গলিত না হইয়াছিল, ততদিন উহাকে ত্যাগ করি নাই। সে প্রায় সাতাইশ বৎসর হইল; এই কালমধ্যে ঐ কবিতা আর কখনও দেখি নাই; কিন্তু ঐ কবিতা আমাকে এমনই মন্ত্র-মুগ্ধ করিয়াছিল যে, অদ্যাপি তাহার কোন কোন অংশ স্মরণ করিয়া বলিতে পারি। পাঠকগণের ঐ কবিতা দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই,—কেন না উহা কখনও পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। অনেকেই দীনবন্ধুর প্রথম রচনা দুই-এক-পঙ্‌ক্তি শুনিলেও প্রীত হইতে পারেন, এজন্য স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া ঐ কবিতা হইতে দুই পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিলাম। উহার আরম্ভ এইরূপ—

"মানব-চরিত্র-ক্ষেত্রে নেত্র নিক্ষেপিয়া।
দুঃখানলে দহে দেহ, বিদরয়ে হিয়া॥"

একটী কবিতা এই—

"যে দোষে সরস হয় সে জনে সরস।
যে দোষে বিরস হয় সে জনে বিরস ॥"

আর একটী—

"যে নয়নে রেণু-অণু অসি-অনুমান।
বায়সে হানিবে তায় তীক্ষ্ণ চঞ্চু-বাণ ॥" ইত্যাদি।

সেই অবধি দীনবন্ধু মধ্যে-মধ্যে "প্রভাকর"-এ কবিতা লিখিতেন। তাঁহার প্রণীত কবিতা-সকল পাঠক-সমাজে আদৃত হইত। তিনি সেই তরুণ বয়সে যে কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার অসাধারণ "সুরধুনী কাব্য" এবং দ্বাদশ কবিতা" সে পরিচয়ানুরূপ হয় নাই। তিনি দুই বৎসর জামাই-ষষ্ঠীর সময়ে "জামাই-ষষ্ঠী" নামে দুইটী কবিতা লেখেন। এই দুইটী কবিতা বিশেষ প্রশংসা এবং আগ্রহাতিশয্যের সহিত পঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরের "জামাই-ষষ্ঠী" যে-সংখ্যক "প্রভাকর"-এ প্রকাশিত হয়, তাহা পুনর্মুদ্রিত করিতে হইয়াছিল। "সুরধুনী কাব্য" এবং "দ্বাদশ কবিতা" সেরূপ প্রশংসিত হয় নাই। তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। হাস্য-রসে দীনবন্ধুর অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল। "জামাই-ষষ্ঠী"তে হাস্য-রস প্রধান। "সুরধুনী কাব্য" ও "দ্বাদশ কবিতা"-য় হাস্য-রসের আশ্রয়-মাত্র নাই। "প্রভাকর"-এ দীনবন্ধু যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন, সেগুলি পুনর্মুদ্রিত হইলে বিশেষ-রূপে আদৃত হইবার সম্ভাবনা।

দীনবন্ধু "প্রভাকর"-এ "বিজয়-কামিনী" নামে একটী ক্ষুদ্র উপাখ্যান-কাব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। নায়কের নাম বিজয়, নায়িকার নাম কামিনী। তাহার বোধ হয় দশ-বার বৎসর পরে, "নবীন তপস্বিনী" লিখিত হয়। "নবীন তপস্বিনী"র নায়কের নাম বিজয়, নায়িকা-ও

কামিনী। চরিত্র-গত উপাখ্যান-কাব্য ও নাটকের নায়ক-নায়িকার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। এই ক্ষুদ্র উপাখ্যান-কাব্যটী সুন্দর হইয়াছিল।

দীনবন্ধু হেয়ার-স্কুল হইতে হিন্দু-কালেজে যান, এবং তথায় ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কয় বৎসর অধ্যয়ন করেন। তিনি কালেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন।

দীনবন্ধুর পাঠ্যাবস্থার কথা আমি বিশেষ জানি না; তৎকালে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না।

বোধ হয় ১৮৫৫ সালে দীনবন্ধু কালেজ পরিত্যাগ করিয়া ১৫০্ বেতনে পাটনার পোস্ট-মাস্টারের[৮] পদ গ্রহণ করেন। ঐ কর্মে তিনি ছয় মাস নিযুক্ত থাকিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। দেড় বৎসর পরেই তাঁহার পদ-বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি উড়িষ্যা-বিভাগের "ইন্‌স্পেক্‌টিং পোস্ট-মাস্টার" হইয়া যান। পদ-বৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু তখন বেতন-বৃদ্ধি হইল না; পরে হইয়াছিল।

এক্ষণে মনে হয়, দীনবন্ধু চিরদিন দেড়-শত টাকার পোস্ট-মাস্টার থাকিতেন তাহাও ভাল ছিল. তাঁহার ইন্‌স্পেক্‌টিং পোস্ট-মাস্টার হওয়া মঙ্গলের বিষয় হয় নাই। পূর্বে এই পদের কার্যের নিয়ম এই ছিল যে, ইঁহাদিগকে অবিরত নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পোস্ট-আপিসের কার্য সকলের তত্ত্বাবধান করিতে হইতে। এক্ষণে ইঁহারা ছয় মাস হেড-কোয়ার্টর[৯]-এ স্থায়ী হইতে পারেন। পূর্বে সে নিয়ম ছিল না, সংবৎসর-ই ভ্রমণ করিতে হইত। কোন স্থানে এক দিন, কোন স্থানে দুই দিন, কোন স্থানে তিন দিন—এইরূপ কালক্রম অবস্থিতি, বৎসর বৎসর ক্রমাগত এইরূপ পরিশ্রমে লৌহের শরীরও ভগ্ন হইয়া যায়, নিয়ত আবর্তনে লোহার চক্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দীনবন্ধুর

শরীরে আর সে পরিশ্রম সহিল না; বঙ্গদেশের দুরদৃষ্ট-বশত-ই তিনি ইন্‌স্পেক্‌টিং পোস্ট-মাস্টার হইয়াছিলেন।

ইহাতে আমাদের মূলধন নষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু কিছু লাভ হয় নাই, এমত নহে। উপহাস-নিপুণ লেখকের একটী বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। নানাপ্রকার মনুষ্যের চরিত্রের পর্যালোচনাতেই সেই শিক্ষা পাওয়া যায়। দীনবন্ধু নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া, নানাবিধ চরিত্রের মনুষ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তজ্জনিত শিক্ষার গুণে তিনি নানাবিধ রহস্য-জনক চরিত্রের সৃজনে সক্ষম[১০] হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত নাটক সকলে যেরূপ চরিত্র-বৈচিত্র্য আছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল।

উড়িষ্যা-বিভাগ হইতে দীনবন্ধু নদীয়া-বিভাগে প্রেরিত হন এবং তথা হইতে ঢাকা-বিভাগে গমন করেন। এই সময় নীল-বিষয়ক গোলযোগ[১১] উপস্থিত হয়। দীনবন্ধু নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া নীলকর-দিগের দৌরাত্ম্য বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে "নীল-দর্পণ" প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করিলেন।

দীনবন্ধু বিলক্ষণ জানিতেন যে, তিনি যে"নীল-দর্পণ"-এর প্রণেতা, এ কথা ব্যক্ত হইলে তাঁহার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। যে-সকল ইংরেজের অধীন হইয়া তিনি কর্ম করিতেন, তাঁহারা নীলকরদিগের সুহৃদ্। বিশেষতঃ পোস্ট-আপিসের কার্যে নীলকর প্রভৃতি অনেককে ইংরেজের সংস্পর্শে সর্বদা আসিতে হয়। তাহারা শত্রুতা করিলে, বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারুক না পারুক, সর্বদা উদ্ব্যস্ত করিতে পারে; এ-সকল জানিয়াও দীনবন্ধু 'নীল-দর্পণ"-প্রচারে পরাঙ্মুখ হন নাই। "নীল-দর্পণ"-এ গ্রন্থকারের নাম ছিল না বটে, কিন্তু গ্রন্থকারের নাম

গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধু অন্য কোন প্রকার যত্ন করেন নাই। "নীল-দর্পণ"-প্রচারের পরেই বঙ্গদেশের সকল লোকই কোন-না-কোন প্রকারে জানিয়াছিল যে, দীনবন্ধু ইহার প্রণেতা।

দীনবন্ধু পরের দুঃখে নিতান্ত কাতর হইতেন, "নীল-দর্পণ" এই গুণের ফল। তিনি বঙ্গদেশের প্রজাগণের দুঃখ সহৃদয়তার সহিত সম্পূর্ণ-রূপে অনুভব করিয়াছিলেন। যে-সকল মনুষ্য পরের দুঃখে কাতর হয়, দীনবন্ধু তাহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের অসাধারণ গুণ এই ছিল যে, যাহার দুঃখ, সে যেরূপ কাতর হইত, দীনবন্ধু তদ্রূপ বা ততোধিক কাতর হইতেন। ইহার একটী অপূর্ব উদাহরণ আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একদা তিনি যশোহরে আমার বাসায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাত্রে তাঁহার কোন বন্ধুর কোন উৎকট পীড়ার উপক্রম হইল। যিনি পীড়ার আশঙ্কা করিতেছিলেন, তিনি দীনবন্ধুকে জাগরিত করিলেন এবং পীড়ার আশঙ্কা জানাইলেন। শুনিয়া দীনবন্ধু মূর্ছিত হইলেন। যিনি স্বয়ং পীড়িত বলিয়া দীনবন্ধুকে জাগাইয়াছিলেন, তিনি আবার দীনবন্ধুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সেইদিন জানিয়াছিলাম যে, অন্য যাহার যে গুণ থাকুক, পরের দুঃখে দীনবন্ধুর ন্যায় কেহ কাতর হয় না। সেই গুণের ফল "নীল-দর্পণ"।

"নীল-দর্পণ" ইংরেজীতে অনুবাদিত হইয়া ইংলণ্ডে যায়, এবং লং সাহেব তৎপ্রচারের জন্য সুপ্রীম-কোর্টের[১২] বিচারে দণ্ডনীয় হয়েন। সীটন-কার[১৩] সাহেব তৎপ্রচারের জন্য অপদস্থ হইয়াছিলেন। এ সকল বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন।

এই গ্রন্থের নিমিত্ত লং সাহেব কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা ইহার বিশেষ কোন গুণ থাকার নিমিত্তই হউক, "নীল-দর্পণ"

ইউরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদিত ও পঠিত হইয়াছিল। এ সৌভাগ্য বাঙ্গালায় আর কোন গ্রন্থের-ই ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য যাহাই হউক, কিন্তু যে যে ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই কিছু কিছু বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন, সীটন-কার অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়াছিলেন, এবং শুনিয়াছি, তিনি তাঁহার জীবন-নির্বাহের উপায় সুপ্রীম-কোর্টের চাকরী পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্তা নিজে কারাবদ্ধ বা কর্মচ্যুত হন নাই বটে, কিন্তু তিনি ততোঽধিক বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। একদিন রাত্রে "নীল-দর্পণ" লিখিতে-লিখিতে দীনবন্ধু মেঘনা পার হইতেছিলেন। কূল হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে গেলে, নৌকা হঠাৎ জলমগ্ন হইতে লাগিল। দাঁড়ী মাঝি সকলেই সন্তরণ আরম্ভ করিল; দীনবন্ধু তাহাতে অক্ষম। দীনবন্ধু "নীল-দর্পণ" হস্তে করিয়া জলমজ্জনোন্মুখ নৌকায় নীরবে বসিয়া রহিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ একজনের পদ মৃত্তিকা-স্পর্শ করিতে, সে সকলকে ডাকিয়া বলিল, "ভয় নাই, এখানে জল অল্প, নিকটে অবশ্য চর আছে।" বাস্তবিক নিকটে চর ছিল, তথায় নৌকা আনীত হইয়া চর-লগ্ন হইল, দীনবন্ধু উঠিয়া নৌকার ছাতের উপর বসিয়া রহিলেন। তখনও সেই আর্দ্র "নীল-দর্পণ" তাঁহার হস্তে রহিয়াছে। এই সময়ে মেঘনায় ভাটা বহিতেছিল; সত্বর-ই জোয়ার আসিলে এই চর ডুবিয়া যাইবে, এবং সেই সঙ্গে এই জল-পূর্ণ ভগ্ন-তরী ভাসিয়া যাইবে; তখন জীবন-রক্ষার উপায় কি হইবে, এই ভাবনা দাঁড়ী মাঝি সকলেই ভাবিতেছিল, দীনবন্ধুও ভাবিতেছিলেন। তখন রাত্রি গভীর, আবার

ঘোর অন্ধকার, চারিদিকে বেগবতী নদীর বিষম স্রোতধ্বনি, কচিৎ মধ্যে-মধ্যে নিশাচর পক্ষীদিগের চীৎকার। জীবন-রক্ষার উপায় না দেখিয়া দীনবন্ধু একেবারে নিরাশ্বাস হইতেছিলেন, এমন সময়ে দূরে দাঁড়ের শব্দ শোনা গেল। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে পুনঃপুনঃ ডাকিতে থাকায়, দূরবর্তী নৌকারোহীরা উত্তর দিল, এবং সত্বরে আসিয়া দীনবন্ধু ও তৎসমভিব্যাহারীদিগকে উদ্ধার করিল।

ঢাকা-বিভাগ হইতে দীনবন্ধু পুনর্বার নদীয়া প্রত্যাগমন করেন। ফলতঃ নদীয়া-বিভাগেই তিনি অধিককাল নিযুক্ত ছিলেন। বিশেষ কার্য-নির্বাহ জন্ত তিনি ঢাকা বা অন্যত্র প্রেরিত হন।

ঢাকা-বিভাগ হইতে প্রত্যাগমনের পরে দীনবন্ধু "নবীন-তপস্বিনী" প্রণয়ন করেন। উহা কৃষ্ণনগরে মুদ্রিত হয়। ঐ মুদ্রাযন্ত্রটী দীনবন্ধু প্রভৃতি কয়েকজন কৃতবিদ্যের উদ্‌যোগে স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু স্থায়ী হয় নাই।

দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগ হইতে ফিরিয়া আসিয়া উড়িষ্যা-বিভাগে প্রেরিত হয়েন; পুনর্বার নদীয়া-বিভাগে আইসেন। কৃষ্ণনগরেই তিনি অধিক কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেখানে একটী বাড়ী কিনিয়াছিলেন। সন ১৮৬৯ সালের শেষে অথবা সন ১৮৭০ সালের প্রথমে তিনি কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় সুপর-নিউমররি[১৪] ইন্‌স্পেক্‌টিং পোস্ট-মাস্টার নিযুক্ত হইয়া আইসেন। পোস্ট-মাস্টার জেনেরালের সাহায্যই এই পদের কার্য। দীনবন্ধুর সাহায্যে পোস্ট-আপিসের কার্য এই কয় বৎসর অতি সুচারু রূপে সম্পাদিত হইতে লাগিল। ১৮৭১ সালে দীনবন্ধু লুশাই-যুদ্ধের[১৫] ডাকের বন্দোবস্ত করিবার জন্ত কাছাড় গমন করেন। তথায় এই গুরুতর কার্য সম্পন্ন করিয়া, অল্প-কাল মধ্যে প্রত্যাগমন করেন।

কলিকাতায় অবস্থিতি-কালে তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই উপাধি যিনি প্রাপ্ত হন, তিনি আপনাকে কতদূর কৃতার্থ মনে করেন, বলিতে পারি না। দীনবন্ধুর অদৃষ্টে ঐ পুরস্কার ব্যতীত আর কিছু ঘটে নাই। কেন না, দীনবন্ধু বাঙ্গালী-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমশ্রেণীর বেতন পাইতেন বটে, কিন্তু কাল-সাহায্যে প্রথমশ্রেণীর বেতন চতুষ্পদ জন্তুদিগের প্রাপ্য হইয়া থাকে। পৃথিবীতে সর্বত্রই প্রথম-শ্রেণীভুক্ত গর্দভ দেখা যায়।

দীনবন্ধু এবং সূর্যনারায়ণ, এই দুই ব্যক্তি ডাক-বিভাগের কর্মচারীদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ বলিয়া গণ্য ছিলেন। সূর্যনারায়ণবাবু আসামের কার্যের গুরুভার লইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেন; অন্য যেখানে কোন কঠিন কার্য পড়িত, দীনবন্ধু সেইখানেই প্রেরিত হইতেন। এইরূপ কার্যে ঢাকা, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম, দারজিলিং, কাছাড় প্রভৃতি স্থানে সর্বদা যাইতেন। এইরূপে তিনি বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার প্রায় সর্বস্থানেই গমন করিয়াছিলেন, বেহারেও অনেক স্থান দেখিয়াছিলেন। ডাক-বিভাগের যে পরিশ্রমের ভাগ, তাহা তাঁহার ছিল,—পুরস্কারের ভাগ অন্যের কপালে ঘটিল।

দীনবন্ধুর যেমন কার্যদক্ষতা এবং বহুদর্শিতা ছিল, তাহাতে তিনি যদি বাঙ্গালী না হইতেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অনেক দিন পূর্বেই তিনি পোস্ট-মাস্টার-জেনেরাল হইতেন, কালে ডাইরেক্টর জেনেরালও হইতে পারিতেন। কিন্তু যেমন শতবার ধৌত করিলেও অঙ্গারের মালিন্য যায় না, তেমনি কাহারও কাহারও কাছে সহস্র গুণ থাকিলেও, কৃষ্ণবর্ণের দোষ যায় না; charity যেমন সহস্র দোষ ঢাকিয়া রাখে, কৃষ্ণ চর্মে তেমনি সহস্র গুণ ঢাকিয়া রাখে।

পুরস্কার দূরে থাকুক, শেষাবস্থায় দীনবন্ধু অনেক লাঞ্ছনা প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। পোস্ট-মাস্টার-জেনেরালে এবং ডাইরেক্টর-জেনেরালে বিবাদ উপস্থিত হইল। দীনবন্ধুর অপরাধ, তিনি পোস্ট-মাস্টার-জেনেরালের সাহায্য করিতেন। এজন্য তিনি কার্যান্তরে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম কিছু দিন রেইলওয়ের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তারপরে হাবড়া ডিভিজনে নিযুক্ত হন। এই শেষ পরিবর্তন।

শ্রমাধিক্যে অনেকদিন হইতে দীনবন্ধু উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। রোগাক্রান্ত হওয়া অবধি দীনবন্ধু অতি সাবধান এবং অবিহিতাচার-বর্জিত হইয়াছিলেন। অতি অল্প পরিমাণ অহিফেন সেবন আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাহাতে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে বলিতেন। পরে সন ১২৮০ সালের আশ্বিন মাসে আকস্মিক বিস্ফোটক কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর বৃত্তান্ত সকলে অবগত আছেন, বিস্তারিত লেখার আবশ্যক নাই, লিখিতেও পারি না। যদি মনুষ্যের সকল প্রার্থনা সফল হইবার সম্ভাবনা থাকিত, প্রার্থনা করিতাম যে, এরূপ সুহৃদের মৃত্যুর কথা কাহাকেও যেন লিখিতে না হয়।

আমি দীনবন্ধুর গ্রন্থ-সকলের কোন সমালোচনা করিলাম না। গ্রন্থ-সমালোচনা এ প্রবন্ধে উদ্দিষ্ট নহে; ইহা সমালোচনার সময়-ও নহে। দীনবন্ধু যে সুলেখক ছিলেন, ইহা সকলেই জানেন, আমাকে বলিতে হইবে না। তিনি যে অতি সুদক্ষ রাজকর্মচারী ছিলেন, তাহার-ও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু দীনবন্ধুর একটা পরিচয় বাকী আছে। তাঁহার সরল, অকপট, স্নেহময় হৃদয়ের পরিচয় কি প্রকারে দিব? বঙ্গদেশে আজকাল গুণবান্ ব্যক্তির অভাব নাই, সুলেখকেরও নিতান্ত অভাব নাই; কিন্তু দীনবন্ধুর অন্তঃকরণের মত অন্তঃকরণের অভাব, বঙ্গদেশে কেন, মনুষ্য লোকে চিরকাল থাকিবে। এ সংসারে ক্ষুদ্র

কীট হইতে সম্রাট্ পর্যন্ত সকলের-ই এক স্বভাব—অহঙ্কার, অভিমান, ক্রোধ, স্বার্থপরতা ও কপটতায় পরিপূর্ণ। এমন সংসারে দীনবন্ধুর ন্যায় রত্ন-ই অমূল্য রত্ন।

সে পরিচয় দিবার-ই বা প্রয়োজন কি! এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে কে বিশেষ না জানে? দার্জ্জিলিং হইতে বরিশাল পর্যন্ত, কাছাড় হইতে গঞ্জাম পর্যন্ত—ইহার মধ্যে কয়জন ভদ্রলোক দীনবন্ধুর বন্ধুমধ্যে গণ্য নহেন? কয়জন তাঁহার স্বভাবের পরিচয় না জানেন? কাহার নিকট পরিচয় দিতে হইবে?

দীনবন্ধু যেখানে না গিয়াছেন, বাঙ্গালায় এমত স্থান অল্পই আছে। যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই বন্ধু সংগ্রহ করিয়াছেন। যে তাঁহার আগমন-বার্তা শুনিত, সে-ই তাঁহার সহিত আলাপের জন্য উৎসুক হইত। যে আলাপ করিত সে-ই তাঁহার বন্ধু হইত। তাঁহার ন্যায় সুরসিক লোক বঙ্গভূমে এখন আর কেহ আছে কিনা বলিতে পারি না। তিনি যে সভায় বসিতেন, সেই সভায় জীবন-স্বরূপ হইতেন। তাঁহার সরস সুমিষ্ট কথোপকথনে সকলেই মুগ্ধ হইত। শ্রোতৃবর্গ মর্ম্মের দুঃখ ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার সৃষ্ট রস-সাগরে ভাসিত। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ-সকল বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হাস্য-রসের গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত হাস্যরস-পটুতার শতাংশের পরিচয় তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না। হাস্যরসাবতারণায় তাঁহার যে পটুতা তাহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কথোপকথনেই পাওয়া যাইত। অনেক সময়ে তাঁহাকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ হাস্য-রস বলিয়া বোধ হইত। দেখা গিয়াছে যে, অনেকে "আর হাসিতে পারি না" বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে। হাস্য-রসে তিনি প্রকৃত ঐন্দ্রজালিক ছিলেন।

অনেক লোক আছে যে, নির্ব্বোধ অথচ অত্যন্ত আত্মাভিমানী;

এরূপ লোকের পক্ষে দীনবন্ধু সাক্ষাৎ যম ছিলেন। কদাচ তাহাদিগের আত্মাভিমানের প্রতিবাদ করিতেন না, বরং সেই আগুনে সাধ্য-মত বাতাস দিতেন। নির্বোধ সেই বাতাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিত, তখন দীনবন্ধু তাহার রঙ্গ-ভঙ্গ দেখিতেন। এরূপ লোক দীনবন্ধুর হাতে পড়িলে কোন রূপে নিষ্কৃতি পাইত না।

মনুষ্য মাত্রের-ই অহঙ্কার আছে, দীনবন্ধুর ছিল না; মনুষ্য-মাত্রের-ই রাগ আছে, দীনবন্ধুর ছিল না। দীনবন্ধুর কোন কথা আমার গোপন ছিল না; আমি কখন তাঁহার রাগ দেখি নাই। অনেক সময়ে তাঁহার ক্রোধাভাব দেখিয়া তাঁহাকে অনুযোগ করিয়াছি,—তিনি রাগ করিতে পারিলেন না বলিয়া অপ্রতিভ হইয়াছেন। অথবা ক্রুদ্ধ হইবার জন্ম যত্ন করিয়া শেষে নিষ্ফল হইয়া বলিয়াছেন, "কই, রাগ যে হয় না।"

একটী দুর্লভ সুখ দীনবন্ধুর কপালে ঘটিয়াছিল। তিনি সাধ্বী স্নেহ-শালিনী পতি-পরায়ণা পত্নীর স্বামী ছিলেন। দীনবন্ধুর অল্প বয়সে বিবাহ হয় নাই। হুগলীর কিছু উত্তরে বংশবাটী গ্রামে তাঁহার বিবাহ হয়। দীনবন্ধু চিরদিন গৃহসুখে সুখী ছিলেন। দম্পতী-কলহ—কখন-না-কখন সকল ঘরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কস্মিন্ কালে মুহূর্ত্ত নিমিত্ত ইঁহাদের কথান্তর হয় নাই। একবার কলহ করিবার নিমিত্ত দীনবন্ধু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা বৃথা হইয়াছিল; বিবাদ করিতে পারেন নাই।

দীনবন্ধু বন্ধুবর্গের প্রতি বিশেষ স্নেহবান্ ছিলেন। আমি ইহা বলিতে পারি যে, তাঁহার ন্যায় বন্ধু-প্রীতি সংসারে একটী প্রধান সুখ। যাঁহারা তাহা হারাইয়াছেন, তাঁহাদের দুঃখ বর্ণনীয় নহে।

১ ইংরেজী Railway শব্দে ai এবং ay উভয়ের উচ্চারণ, দক্ষিণ-ইংলণ্ডের ভদ্র ভাষায় 'এয়্'; সেই উচ্চারণ জানাইবার চেষ্টায় বঙ্কিমচন্দ্র 'রেইল্ওয়ে' এই বানান

লিখিয়াছেন। এখনও কেহ-কেহ এই diphthong বা সন্ধ্যক্ষরের উচ্চারণ ধরিয়া mail, train প্রভৃতি শব্দকে 'মেইল, ট্রেইন' রূপে লেখেন। ইহাতে একটা অসুবিধা ঘটে,—অনেকে ভুল ঝোঁক দিয়া এইরূপ বানানে লেখা ইংরেজী শব্দগুলিকে, monosyllabic বা একাক্ষর-রূপে উচ্চারণ না করিয়া, disyllabic বা দ্ব্যক্ষর করিয়া ফেলেন (মেয়্‌ল্‌, ট্রেয়্‌ন্‌' স্থলে 'মে—ইল্‌, ট্রে—ইন্‌')। সাদাসিধা ভাবে এ-কার লেখা ভাল ('রেলওয়ে, মেল, ট্রেন' ইত্যাদি)।

২ চৌবেড়িয়া—কলিকাতার Upper Circular Road, Lower Circular Road-কে বাঙ্গালার 'উত্তর-চৌবেড়িয়া রাস্তা, দক্ষিণ-চৌবেড়িয়া রাস্তা' (অথবা 'চক্রবেড় রাস্তা') বলিলে কেমন হয় ?

৩ ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালা ভাষায় প্রাচীন-পন্থী কবিদের মধ্যে শেষ বড় কবি ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের আবহাওয়া তাঁহার মনকে স্পর্শ করে নাই। পরবর্তী কবিরা প্রায় সকলেই ইংরেজীতে পণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহাদের লেখায় ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ করিয়া আসিয়া পড়ে।

৪ এলো—সংস্কৃত 'আকুল' হইতে প্রাকৃত 'আউল', তাহাতে উআ-প্রত্যয় যোগে 'আউলুআ'; অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির ক্রিয়ার ফলে 'আউলুয়া, আইলুয়া', চলিত ভাষায় 'এলো'। এই শব্দকে বাঙ্গালায় কখনও-কখনও সংস্কৃত শব্দের সহিত সমস্ত বা প্রত্যয়ের সহিত সংযুক্ত করা হয়—'এলোকেশী', 'এলায়িত-কুন্তলা'। 'আউলুআ-নাইলুআ' হইতে 'এলো-মেলো'।

৫ টেকচাঁদ—প্যারীচাঁদ মিত্র (১২২১ বঙ্গাব্দে) 'টেকচাঁদ ঠাকুর' এই ছদ্ম নামে "আলালের ঘরের দুলাল" নামে একখানি উপন্যাস লেখেন। ইহা বাঙ্গালা ভাষার এক আদি উপন্যাস।

৬ হুতোম—কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪১-১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ) 'হুতোম পেঁচার নক্সা' নাম দিয়া কলিকাতা সমাজের এক ব্যঙ্গময় চিত্র ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন।

৭ আদ্যোপান্ত—'গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত'; 'আদ্য+উপান্ত'; এই শব্দটি বাঙ্গালায় বিশেষ প্রচলিত থাকিলেও, শুদ্ধ নহে; 'আদি+অন্ত'—'আদ্যন্ত' বলাই ভাল।

৮ পোষ্ট-মাষ্টার—শব্দটীর ইংরেজী উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, শুদ্ধ ইংরেজী রূপ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিলে, 'সৃট' লিখিতে হয়; আবার এ দিকে 'পোষ্টাপিস,

পোষ্ট-মাষ্টার' বাঙ্গালা শব্দ হইয়া গিয়াছে, বাঙ্গালীর মুখে 'স্ট' স্থানে 'ষ্ট' আসিয়াছে; এইরূপ শব্দের বানান-বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষা দো-টানায় পড়িয়াছে।

৯ হেড-কোয়টর—Head-quarters—বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক ইংরেজী শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়।

১০ চরিত্র-সৃজনে সক্ষম—সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে 'সর্জন' ও 'ক্ষম' হওয়া উচিত। 'সৃজন' ভুল হইলেও বাঙ্গালায় স্থায়ী আসন পাইয়াছে; কিন্তু আজকাল কেহ-কেহ 'সক্ষম'কে বর্জন করিয়া, 'সমর্থ' লেখেন ও লিখিতে উপদেশ দেন।

১১ উনিশের শতকের তৃতীয় পাদে বাঙ্গালা দেশে নীলের চাষ করিয়া কতকগুলি ইংরেজ ধনশালী হয়। তাহারা চাহিত যে, কৃষকেরা ধান, পাট প্রভৃতি অন্য শস্য উৎপাদন করা বন্ধ করিয়া বা কমাইয়া দিয়া, তাহাদের নির্দেশ-মত কেবল নীলের-ই চাষ করে, যাহাতে অল্প দামে কাঁচা নীল তাহাদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া, নিজেদের কুঠিতে তাহা হইতে নীল রং তৈয়ারী করিয়া ইউরোপে চালান দিয়া নিজেরা লাভবান হইবে। কৃষকেরা নীল চাষ করিতে রাজী না হইলে নীল-কুঠির পরাক্রান্ত সাহেব তাহাদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিত। এই অত্যাচারের কথা দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার নাটক "নীল-দর্পণ"-এ প্রকাশিত করেন। বঙ্গীয় প্রজার হিতৈষী পাদরি John Long জন লং সাহেব এই বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ নিজ নামে প্রকাশিত করেন। তাহাতে নীলকর সাহেবেরা তাঁহার বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা আনে, বিচারে লং সাহেবের কারাবাস এবং এক হাজার টাকা জরিমানা হয়; সে টাকা কালীপ্রসন্ন সিংহ দেন। এই বই প্রকাশের ফলে নীলকরের অত্যাচার অনেকটা দমন করা হয়। পরে জরমানিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম নীল তৈয়ারী হয়, সঙ্গে সঙ্গে নীলের ব্যবসায়ে আর লাভ থাকে না, নীল-কুঠি ও নীলকরদের অত্যাচার একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

১২ সুপ্রীম কোর্ট—Supreme Court—প্রধান বিচারালয়, পরে ইহার নাম হইয়াছে High Court 'হাই-কোর্ট'।

১৩ সীটন-কার—Seton Kerr—ইনি জনৈক উদার-চেতা ইংরেজ রাজকর্মচারী ছিলেন।

১৪ সুপর-নিউমররি (Super-numerary)—অতিরিক্ত।

১৫ লুশাই-যুদ্ধ—আসামের এক দুর্ধর্ষ আদিম নিবাসী, Lushai 'লুশাই'-জাতি, ইহাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ-সরকারের অভিযান।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]

বাঙ্গালা সাহিত্যে এবং বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্থান কোথায়, সে সম্বন্ধে ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় "বঙ্গদর্শন" নব-পর্য্যায়-এ ১৩১৩ সালে একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৩-১৮৭৩) এবং রবীন্দ্রনাথ—ইঁহারা আধুনিক যুগের তিনজন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী লেখক ও কবি। বাঙ্গালী জাতির মনের গতি পরিচালনায় ইঁহাদের মধ্যে বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী হইয়াছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯২১) আধুনিক যুগে বঙ্গভাষার চিন্তাশীল লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ইনি কলিকাতার রিপন-কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে অপার পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে বহু মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া ইনি মাতৃভাষার প্রকাশ-শক্তি ও তাঁহার সাহিত্য-গৌরব দুইয়েরই যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়া যান।

বার বৎসর অতীত হইল, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শ্যামাঙ্গিনী জননীর অঙ্কদেশ শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এতদিন আমরা তাঁহার স্মৃতির সম্মানার্থ কোনরূপ আয়োজন আবশ্যক বোধ করি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমাদের কর্তব্য-বুদ্ধি যে এতদিন জাগে নাই, তাহা আমাদের অবস্থার পক্ষে স্বাভাবিক। বার বৎসর পরে যদি সেই কর্তব্য-বুদ্ধি জাগিয়া থাকে, সেই প্রবৃদ্ধি-সাধনে আমাদের কৃতিত্ব বিচার্য বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং কোন তপোলোকে বা সত্যলোকে অবস্থিত হইয়াও, মর্ত্যলোকে তাঁহার দুঃখিনী জননীকে আজিও ভুলিতে পারেন

নাই; সেখানে বসিয়া, "তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে" বলিয়া কাতর-কণ্ঠে গান গাহিতেছেন; আর মানবের অশ্রুতি-গোচর সেই সঙ্গীত, সপ্তকোটি কণ্ঠে কলকলনিনাদ উত্থাপিত করিয়া বঙ্গভূমিকে জাগ্রত করিয়াছে। আমাদের কর্তব্য-বুদ্ধি আজ যদি জাগিয়া থাকে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদিগকে জাগাইয়াছেন, আমাদের উহাতে কোন কৃতিত্ব নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উপাসনার জন্য আজিকার সভা আহূত হইয়াছে; এবং যাঁহারা এই উপাসনার আয়োজন করিয়াছেন এবং এই উপাসনা-কর্মকে সম্ভবত সাংবাৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কি কারণে জানি না, আজিকার অনুষ্ঠানে প্রধান ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন। আমার প্রতি তাঁহাদিগের এই অহৈতুকী শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমার ভক্তি-প্রকাশের অবসর লাভ করিয়া, আমি যুগপৎ গর্ব ও আনন্দ অনুভব করিতেছি; কিন্তু যোগ্যতর পাত্রে এই ভার অর্পিত হইলে, উপস্থিত ভদ্র-মণ্ডলীকে বঞ্চিত হইতে হইত না। কেবল সময়োচিত বিনয় প্রকাশের জন্য আমি এ কথা বলিতেছি, তাহা নহে; বঙ্কিমচন্দ্র যে বিস্তীর্ণ বঙ্গীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহবর্তী ও পরবর্তী অনুচরগণের পথ-প্রদর্শক হইয়া গিয়াছেন, আমিও সেই বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষেত্রের এক প্রান্তে সঙ্কীর্ণ পথ আশ্রয় করিয়া মন্দ গতিতে ধীরে ধীরে পদক্ষেপে সাহসী হইয়াছি; ইহাই আমার জীবনের কাজ ও ইহাই আমার জীবিকা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রতিভার অত্যুজ্জল আলোক-বর্তিকা হস্তে করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রের যে যে অংশ প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন, সেই সেই অংশে আমার "প্রবেশ নিষেধ।" আমি দূর হইতেই সেই আলোকের উজ্জ্বল দীপ্তিতে

মুগ্ধ হইয়াছি মাত্র, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ভাগ্যবান্ সহচরগণের ও অনুচরগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেও আমি অধিকারী নহি। আজিকার আয়োজনের অনুষ্ঠাতাদিগের অনুগ্রহ জন্য অকপট কৃতজ্ঞতা স্বীকারে আমি বাধ্য আছি; কিন্তু আমি আশা করি যে, আপনারা তাঁহাদের পাত্র-নির্বাচনে বিষয়-বুদ্ধির প্রশংসা করিবেন না।

বাঙ্গালীর জীবনের উপর বঙ্কিমচন্দ্র যে কত দিকে কত উপায়ে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি; কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরে সম্ভবতঃ তিনি বাঙ্গালার স্যর ওয়াল্‌টার স্কট্ মাত্র। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত পরিচয় অতি অল্প বয়সেই ঘটিয়াছিল, সে বয়সে উপন্যাস গ্রন্থের সহিত আমার পরিচয় বড় একটা স্পৃহণীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। আমার যখন আট বৎসর বয়স, তখন "বঙ্গদর্শন"-এ "বিষবৃক্ষ"-র দুই-চারিটা পরিচ্ছেদ আত্মসাৎ করিয়াছিলাম। সেই বয়সে "বিষবৃক্ষ"-র সাহিত্য-রসের কিরূপ আস্বাদ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা ঠিক মনে নাই; তবে এ কথা বেশ মনে আছে যে, পাঠশালায় গিয়া তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ভূগোল-বিবরণ"-এর ভারতবর্ষের অধ্যায়ে 'গঞ্জাম—গঞ্জাম, ছত্তরপুর—ছত্তরপুর, মসলিপটম্—মসলিপটম্; আর্কট—আর্কট, মদুরা—মদুরা, টিনেভেলি—টিনেভেলি' প্রভৃতি অপরূপ সুশ্রাব্য নামাবলী আবৃত্তির ত্রুটি ঘটিলে পণ্ডিত-মহাশয়ের নিকট বেত্রাঘাত উপহার পাইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি যে অনুরাগ দাঁড়াইয়াছিল, নগেন্দ্রনাথের নৌকা-যাত্রা ও কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন-দর্শন নিতান্ত তাহার সমর্থন ও পোষণ করে নাই। আমার বেশ মনে আছে যে, 'পদ্মপলাশ-লোচনে তুমি কে' এই পরিচ্ছেদের সহিত আমার তাৎকালিক "বিষবৃক্ষ" পাঠ সমাপ্ত হয়, এবং ঐ পরিচ্ছেদের শীর্ষস্থিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি মনের মধ্যে বিস্ময় ও কৌতূহলের উদ্রেক করিয়া কিছু

দিনের জন্ত একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে। কিছু দিনের জন্ত মাত্র; কেন না পর-বৎসর আমি পাঠশালার পরীক্ষার যে পুরস্কার পাইয়াছিলাম, বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, তাহার রাঙা ফিতার বন্ধনের মধ্যে "শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত দুর্গেশনন্দিনী ও বিষবৃক্ষ" নামক দুইখানি পুস্তক রহিয়াছে। এই সভাস্থলে যাঁহারা পিতার বা পিতৃস্থানীয় অভিভাবকের গৌরব-যুক্ত পদবী গ্রহণ করেন, তাঁহারা শুনিয়া সতর্কিত হইবেন যে, ঐ পুরস্কার-বিতরণে গ্রন্থ-নির্বাচনের ভার আমার পিতৃদেবের উপর অর্পিত ছিল, এবং তিনি আমার 'গঞ্জাম—গঞ্জাম, ছত্তরপুর—ছত্তরপুর' প্রভৃতি সূক্ষ্ম ভৌগোলিক-তত্ত্বে পারদর্শিতার পুরস্কার স্বরূপ ঐ দুইখানি গ্রন্থ নির্বাচন করিয়া তাঁহার নবম বর্ষের পুত্রের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। পুরস্কার-হস্তে বাড়ী আসিয়া রাত্রিটা এক রকমে কাটাইয়াছিলাম, পরদিন "বিষবৃক্ষ" ও তার পরদিনে "দুর্গেশনন্দিনী", টাইটেল-পেজের হেডিং, মায় 'মূল্য পাঁচসিকা' হইতে শেষ পর্যন্ত এক রকমে উদরস্থ করি। ঐ দুই গ্রন্থের কোন্ অংশ সর্বোৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছিল, তাহা যদি এখন অকপটে বলিয়া ফেলি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনারা আমার কাব্য-রস-গ্রাহিতার প্রশংসা করিবেন না। "বিষবৃক্ষ"-এর মধ্যে যেখানে ছেলের পাল 'হীরার আয়ি বুড়ী, হাঁটে গুড়ি-গুড়ি' বলিয়া সেই বৃদ্ধার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল ও বৃদ্ধা 'হিষ্টিরস' নামক ব্যাধির প্রতিকার বিষয়ে 'কেষ্টরস' নামক ঔষধের উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রতিবেশিনীর সহিত আলাপ করিতেছিল, সেই স্থানটাই গ্রন্থের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলাম। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকেই "দুর্গেশনন্দিনী"র মধ্যে সর্বপ্রধান পাত্র স্থির করিয়াছিলাম, ইহাও নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিতেছি। আসমানীর ঘরে বিমলার আকস্মিক প্রবেশের সহিত বিদ্যাদিগ্‌গজ ঘরের কোণে

লুকাইয়া আত্ম-গোপন করিলেন, এবং তাঁহার শীর্ষ-রক্ষিত হাঁড়ি হইতে অড়হরের দাল বিগলিত হইয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মন্দাকিনীর ধারা বহাইল, সেই বিবরণ যখনই পাঠ করিলাম তখনই বুঝিলাম যে, বাঙ্গালার সাহিত্য অতি উপাদেয় পদার্থ; এই সাহিত্যের সরোবরে বিদ্যাদিগ্‌গজের মত শতদল কমল যখন বিদ্যমান আছে, তখন 'গঙ্গাম—গঙ্গাম, ছত্তরপুর—ছত্তরপুর'-এর কাঁটাবন ঠেলিয়াও সেই কমল চয়নের চেষ্টা অনুচিত নহে।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এত লোকে এত কথা কহিয়াছেন যে, আর সে বিষয়ে কোন কথিতব্য আছে কি না, আমি জানি না। কথিতব্য থাকিলেও, আমি কোন কথা বলিতে সাহস করি না। শ্রোতৃগণের মধ্যে অনেকেই হয়ত দাবি করিবেন যে, আমি যখন বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠে উদ্যত হইয়াছি, তখন আমি সূর্যমুখীর ও ভ্রমরের চরিত্র আর একবার সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিয়া, উভয় চরিত্রের তুলনামূলক সমালোচনে বাধ্য আছি। যদি কেহ এইরূপ দাবি রাখেন, তাঁহার নিকট আমি ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি। বঁক নল আর টেস্ট টিউব হাতে দিয়া নানাজাতি কিম্ভূত-কিমাকার দ্রব্যের বিশ্লেষণ আমার ব্যবসায় বটে, কিন্তু মানব-চরিত্র বা মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণে কিছুমাত্র শিক্ষা বা দক্ষতা আমার নাই; কেন না, নভেল-বর্ণিত মানব-চরিত্র বিশ্লেষণে সালফরেট-হাইড্রোজেনের কিছুমাত্র উপযোগিতা নাই; ঐ মানব-চরিত্র নমনীয়-ও নহে দ্রবণীয়-ও নহে, এবং জলে দ্রব করিয়া উত্তাপ প্রয়োগে উহার তাম্রতাপাদন২-ও অসম্ভব। আর আমার কাব্যরস-গ্রাহিতার যে নমুনা দিয়াছি, তাহাতে আপনারাও আমার নিকট সে আশা রাখেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে একটা স্থূল কথা আমার বলিবার আছে। সেই কথাটা সংক্ষেপে বলিয়াই, আমি আপনাদিগকে রেহাই দিব।

এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন, তাঁহারা বলেন, মানবসমাজের সুখ-দুঃখ, রেষারেষি, ঘেষাঘেষি এবং ভালবাসাবাসি যথাযথ-রূপে চিত্রিত করাই নভেলের মুখ্য উদ্দেশ্য, উহাতে কল্পনার খেলার অবসর নাই। ইঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সম্পূর্ণ প্রসন্ন নহেন। আর এক শ্রেণীর সমালোচক বলেন, পাপ-পুণ্যের ফলাফলের তারতম্য দেখাইয়া সমাজের নীতিশিক্ষার ও ধর্মশিক্ষার বিধানই নভেলের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা দেখিয়া নভেলের উৎকর্ষ বিচার করিতে হইবে। ইঁহারাও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি সম্পূর্ণ প্রসন্ন নহেন। ব্যাকরণশাস্ত্রে যেমন "ভট্টিকাব্য", ইঁহাদের মতে ধর্মনীতি-শাস্ত্র তেমনি নভেল; কাব্যের ছলনা করিয়া পাঠকগণকে কাঁদানোই নভেল রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। মানবসমাজের যথাযথ চিত্র আঁকিতে নৈপুণ্যের প্রয়োজন, আর নীতি-শাস্ত্র অতি সাধু-শাস্ত্র, ইহা স্বীকার করিয়াও, আমরা মনে করিয়া লইতে পারি—নভেল এক কাব্য, এবং সৌন্দর্য-সৃষ্টিই কাব্যের প্রাণ। কেবল নীতি-শাস্ত্র কেন, যদি কেহ দর্শন-শাস্ত্র বা রসায়ন-শাস্ত্রকেই নভেলের বিষয় করিতে চাহেন, তাহাতে আপত্তি করিব না। কিন্তু বিষয়টী যদি সুন্দর না হয়, তাহা হইলে তাহা কাব্য হয় না।

সৌন্দর্যের-ও প্রকার-ভেদ আছে; গাছ-পালার ছবি সুন্দর হইতে পারে, "গুপ্তকথা"র হরিদাস’-ও সুন্দর হইতে পারেন, কিন্তু মানব-জীবনের ও জগৎ-সংসারের গোড়ার কথাগুলি যিনি সুন্দর করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রথম শ্রেণীর কবি। গোড়ার কথা দেখাইলেই কবি হয় না, সেটা দার্শনিকের ও বৈজ্ঞানিকের এবং ধর্মতত্ত্ববিদের কাজ; কিন্তু তাহা সুন্দর করিয়া দেখাইতে পারিলে কবি হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের নভেলের মধ্যে সেই রকম গোড়ার কথা দুই-একটা সুন্দর করিয়া

দেখানো হইয়াছে; সেইজন্য কবির আসনে তাঁহার স্থান অতি উচ্চ। মানব-জীবনের একটা গোড়ার কথা এই যে, উহা আগাগোড়া একটা সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা-মাত্র। শুধু মানব-জীবনের কথাই বা বলি কেন, বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির নিরন্তর সামঞ্জস্য-স্থাপনের নামই জীবন। যাঁহারা হর্বট স্পেন্সর-প্রদত্ত জীবনের এই পারিভাষিক সংজ্ঞা জানেন, তাঁহারা আমার কথায় সায় দিবেন। জীবনের উহা অপেক্ষা ব্যাপকতর সংজ্ঞা আমি দেখি নাই। যাহার জীবন আছে, তাহাকে দুই দিকের টানাটানির মধ্যে বাস করিতে হয়। ধবলগিরি পর্বত বহুকাল হইতে বরফের বোঝা মাথায় করিয়া ভারতবর্ষের পুরুষ-পরম্পরা অবলোকন করিতেছেন, কিন্তু বিজ্ঞান-শাস্ত্র তাঁহার সজীবতায় সন্দেহ করেন; ধবলগিরি এত মহান্ হইয়াও শীতাতপের এবং জলবৃষ্টির ও তুষারবৃষ্টির উৎপাত অকাতরে সহিয়া আসিতেছেন, এবং স্রোতস্বিনীর সহস্র ধারা তাঁহার কলেবরকে শীর্ণ বিশীর্ণ ও ক্ষীণ করিয়া তাঁহার অভ্রভেদী মস্তককে সমভূমি করিবার চেষ্টা করিতেছে—সেই আপন্নিবারণের জন্য তাঁহার কোন চেষ্টাই নাই। কিন্তু সামান্য একটা পিপীলিকা ক্রমাগত আহার করিয়া আপনার ক্ষয়শীল দেহের পূরণ করিয়া থাকে, এবং যদি কেহ তাহাকে দলিত করে, সে দংশন করিয়া আত্মরক্ষণে সাধ্যমত ত্রুটি করে না। এক দিকে বহিঃপ্রকৃতি তাহাকে ক্রমাগত ধ্বংসের মুখে টানিতেছে, অন্য দিকে সে ধ্বংস হইতে আত্মরক্ষার জন্য কেবল-ই চেষ্টা করিতেছে। তাহার কীট-জীবন এই চেষ্টার পরম্পরা মাত্র। যে দিন সেই চেষ্টার বিরাম, সেই দিন তাহার মৃত্যু। মানুষও ঠিক পিঁপীড়ার মত-ই জীবন ব্যাপিয়া আপনাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষার জন্য ব্যাপৃত।

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু অন্তঃ-প্রকৃতিকে বহিঃ-প্রকৃতির আক্রমণ-নিবারণে সমর্থ করিয়া মৃত্যু নিবারণের ধারাবাহিক চেষ্টা-ই তাহার জীবন। সর্বনাশ সমুৎপন্ন হইলে পণ্ডিত লোকে অর্ধ-ত্যাগে বাধ্য হন ; তাই মৃত্যু অনিবার্য জানিয়া পণ্ডিত-জীব আপনার অর্ধেককে অপত্য-রূপে রাখিয়া অপরার্ধকে ত্যাগ করিয়া থাকেন। সর্বনাশ সমুৎপন্ন হইলে, জীবনের কিয়দংশ রক্ষার জন্য এই অপত্যোৎপাদন, আহার, নিদ্রা প্রভৃতির একমাত্র উদ্দেশ্য—যেন-তেন প্রকারেণ জীবন-রক্ষা। জীবন-রক্ষার দুই উপায়, আত্ম-রক্ষা ও বংশ-রক্ষা। পশুর সহিত নরের এই স্থলে সামঞ্জস্য ; কাজেই ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে আমরা 'পাশব-প্রবৃত্তি' বলিয়া থাকি।

কিন্তু মানুষের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। মানুষ অতি দুর্বল পশু, সব শত্রুর নিকট আত্মরক্ষার জন্য সে আর একটা কৌশল আশ্রয় করিয়াছে। মানুষ দল বাঁধিয়া বাস করে ; সেই দলের নাম 'সমাজ' ; দল বাঁধিয়া থাকিতে হইলে, স্বাধীনতাকে ও স্বাতন্ত্র্যকে সংযত করিতে হয়—নতুবা দল ভাঙিয়া যায়। যে পাশব প্রবৃত্তি সমাজকে তুচ্ছ করিয়া মানুষকে কেবল আত্মরক্ষার দিকে প্রেরিত করে, দলের কল্যাণার্থ মানুষ সেই পাশব প্রবৃত্তির সংযমে বাধ্য হয়। সহজাত সংস্কারের অভাবে, অতীতের অভিজ্ঞতার ভর দিয়া, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, বুদ্ধি-পূর্বক পাশব প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হয়। এইজন্য যে বুদ্ধি আবশ্যক, তাহার নাম 'ধর্ম-বুদ্ধি' ; ইহা বিশিষ্ট-রূপে মানব-ধর্ম। ইহা সমাজ-রক্ষার অনুকূল, ইহা লোক-স্থিতির সহায়। মানুষের পশু-জীবনই তো দুই টানাটানির ব্যাপার ; উহার উপর এই সামাজিক-জীবন আর একটা নূতন টানাটানির সৃষ্টি করে। আত্ম-রক্ষার অভিমুখে যে সকল প্রবৃত্তি, তাহা মানুষকে এক পথে প্রেরণ করে ; আর মানুষের ধর্ম-বুদ্ধি,

যাহা মুখ্যত সমাজ-রক্ষার অর্থাৎ লোক-স্থিতির অনুকূল, গৌণত আত্ম-রক্ষার অনুকূল মাত্র, তাহা মানুষকে অন্যদিকে প্রেরণ করে। সামাজিক মনুষ্যকে এই দুই টানাটানির মধ্যে পড়িয়া সামঞ্জস্য-বিধানের জন্য কেবল-ই চেষ্টা করিতে হয়। এই সামঞ্জস্য-স্থাপনের নিরন্তর চেষ্টাই মানুষের নৈতিক জীবন। প্রবৃত্তি তাহাকে উদ্দাম স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঠেলে আর ধর্ম-বুদ্ধি তাহার অন্তরের অন্তর হইতে তাহাকে নিবৃত্তি-মার্গে চালাইতে চেষ্টা করে। এই দুইটী টানাটানির মধ্যে পড়িয়া মনুষ্য কৃপার পাত্র। এইখানেই মানুষের গোড়ায় গলদ, original sin৬, এইখানেই অমঙ্গলের মূল—সংসার-বিষবৃক্ষের বীজ।

Origin of evil—মানব-জীবনের উৎকট রহস্যে ইহাই গোড়ার কথা। খোদার সঙ্গে শয়তানের৭ চিরন্তন বিবাদের মূল এইখানে মনুষ্যের হৃদয় সেই জীবন-ব্যাপী মহাহবের কুরুক্ষেত্র৮—ধর্মের সহিত অধর্মের মহাযুদ্ধ সেখানে নিরন্তর চলিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চারিখানি উপন্যাসে এই গোড়ার কথাটার আলোচনা করিয়াছেন। সেই মহা-যুদ্ধের ক্ষেত্র হইয়া মানবহৃদয় কিরূপ ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া থাকে, তাহা তিনি সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছেন; তাহাতে তিনি উচ্চ শ্রেণীর কবি।

"বিষবৃক্ষ", "চন্দ্রশেখর", "রজনী" আর "কৃষ্ণকান্তের উইল," এই চারিখানি উপন্যাসের কথা আমি বলিতেছি। এই চারিখানি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এক। প্রতাপ ও নগেন্দ্র, অমরনাথ ও গোবিন্দলাল সকলেই কুসুম-সায়কের লক্ষ্য হইয়াছিলেন; ধর্মবুদ্ধির দৃঢ়তা ও প্রবৃত্তির তীব্রতার তারতম্যানুসারে কেহ বা জয়লাভ করিয়াছিলেন, কেহ বা পারেন নাই। বীর্যবন্ত প্রতাপ সারা জীবন প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার জীবনব্যাপী

কঠোর নীরব সাধনার বিষয় জগতের লোকে জানিতে পারিয়াছিল। মোহ-মুগ্ধ অমরনাথ আপনার পিঠের উপর আকস্মিক পদ-স্খলনের স্থায়ী চিহ্ন ধারণ করিয়া, তাঁহার স্বাভাবিক দম্ভের বলে পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাসী সাজিয়া বেড়াইয়াছিলেন, পত্নী-বৎসল নগেন্দ্রনাথ আপনার আত্মাকে ছিন্ন-ভিন্ন বিদীর্ণ করিয়া, অনাথা পিতৃহীনা বালিকার প্রতি দয়া-প্রকাশের ফল ভোগ করিয়াছিলেন, আর সর্বাপেক্ষা কৃপাপাত্র গোবিন্দলাল সর্বতো-ভাবে আপনার অধীন ঘটনাচক্রের নিষ্ঠুর পেষণে নিষ্পিষ্ট হইয়া আপনাকে কলঙ্ক-হ্রদে নিমগ্ন করিয়া, অবশেষে, অপমৃত্যু-দ্বারা শান্তিলাভে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই চারিটী মনুষ্যের বিভিন্ন দশার চিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমরা কখনও মানব-চরিত্রের মহিমা দেখিয়া স্পর্ধিত ও গর্বিত হইতে পারি, কখনও বা জাগতিক শক্তির সম্মুখে মানবের দৌর্বল্য দেখিয়া ভীত হইতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র মানব-জীবনের ও জগদ্বিধানের সমস্যা—এই গোড়ার কথা—অতি সুন্দর চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন, এবং এইজন্য তিনি উচ্চ শ্রেণীর কবি।

আজিকার দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের অদৃশ্য হস্ত আমাদের জাতীয় জীবনকে যেরূপে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছে, তাহাতে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র যতই উচ্চ স্থানে অবস্থান করুন, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য মূর্তির পদপ্রান্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে আজ ব্যগ্র হইব ইহা স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র কত দিক্ হইতে আমাদের জীবনের উপর প্রভুত্ব করিতেছেন, তাহার গণনা দুষ্কর। ইংরেজীতে একটা বাক্য প্রচলিত হইয়াছে—"যাহার মূলে গ্রীক নাই, সে জিনিস জগতে অচল।"[১] বলা বাহুল্য, এখানে 'জগৎ' অর্থে, কেবল পাশ্চাত্ত্য দেশ বুঝায়। আমরা যদি ঐ বাক্যকে ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া বলি যে, "যাহার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র

নাই, সে জিনিস বাঙ্গালা দেশে অচল”,—তাহা হইলে নিতান্ত অত্যুক্তি হইবে না। ইংরেজী গতি-বিজ্ঞানে একটা শব্দ আছে, ‘মোমেণ্টম্’[১০]; বাঙ্গালায় উহাকে ‘ঝোঁক’ শব্দে অনুবাদ করিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়েকটা জিনিসকে ঝোঁক দিয়া ঠেলিয়া দিয়াছেন, সেই কয়টা জিনিস বাঙ্গালা দেশে চলিতেছে। সেই জিনিসগুলা গতি-উপার্জনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তের প্রেরণার অপেক্ষায় ছিল; বঙ্কিমচন্দ্র হাত দিয়া ঠেলিয়া দিলেন, আর উহা চলিতে লাগিল, তাহার পর আর উহা থামে নাই।

* * * *

বঙ্কিমচন্দ্রকে কেহ-কেহ apostle of culture[১১] বলিয়া থাকেন। ধর্মের সার্বভৌমিক অংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সমুদায় বৃত্তির সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য-বিধানকে ‘ধর্ম’ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা ধর্মের এই সংজ্ঞা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারি। পূর্বেই বলিয়াছি, বহিঃ-প্রকৃতির সহিত অন্তঃ-প্রকৃতির অবিরত সামঞ্জস্য-সাধন-চেষ্টার নাম জীবন; এবং যখন সমুদায় বৃত্তির সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য-বিধান না ঘটিলে বহিঃ-প্রকৃতির সহিত অন্তঃ-প্রকৃতির পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তখন ধর্মই জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়—“ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ”[১২]। ধর্মই মানবজীবনকে রক্ষা করে; কেবল ব্যক্তির জীবন বা বংশের জীবন কেন, সমাজের জীবনও ধর্মই রক্ষা করে, এবং যদি কেহ ঐহিক জীবনের উপর পারত্রিক জীবনের রক্ষাকেও ধর্মের উদ্দেশ্য বলিতে চাহেন, তাঁহারও সহিত আমি আজ বিবাদ করিতে প্রস্তুত নই। বঙ্কিমচন্দ্র-প্রযুক্ত ধর্মের এই বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে, উহা culture অপেক্ষা ব্যাপক হইয়া উঠে। এই ধর্মের অন্বেষণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র আপন ঘরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া,[১৩] গীতাশাস্ত্রের আশ্র

লইয়াছিলেন। এই ব্যাপক অর্থে 'ধর্ম' শব্দ প্রয়োগ করিলে, সার্বভৌমিক ও প্রাদেশিক উভয় ধর্ম উহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, সেই সার্বভৌমিক ধর্মের বা প্রাদেশিক যুগ-ধর্মের অন্বেষণের জন্য-ও আমাদিগকে পরের দ্বারে ভিখারী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। আজ গীতার সুলভ সংস্করণ লোকের পকেটে পকেটে বিরাজ করিতেছে; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে তার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন ইংরেজী-শিক্ষিত লোকের মধ্যে উহা বিরল-প্রচার ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যাহার মূলে, বাঙ্গালা-দেশে সে জিনিস অচল থাকে না, তাহা প্রচলিত হয়, তাই বঙ্কিমচন্দ্র যে দিন "নব-জীবন" ও "প্রচার" আশ্রয় করিয়া বঙ্গবাসীকে তাহার সহিত পরিচিত করিলেন, সেই দিন হইতে সেই শাস্ত্র-কথা বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত সমাজে চলিতে লাগিল, তদবধি উহা আর থামে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সম্মুখে স্বদেশের শাস্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, এ কথা বলিলে ভুল হইবে। তাঁহার অনেক পূর্বে বঙ্গজননীর আর এক সন্তান বিশ্বজগতে পুরাণ-কবির চতুর্মুখ-নিঃসৃত এবং ভারতের প্রাচীন ঋষিগণের শ্রুতিপ্রবিষ্ট বাণীর মধ্যে সার্বভৌমিক ধর্মের সন্ধান পাইয়া পুলকিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার পরে বঙ্গ-জননীর আর একজন সন্তান ঈশোপনিষদ গ্রন্থের, পরিত্যক্ত পাতার মধ্যে সেই ধর্মের সন্ধান পাইয়া আপনাকে ধন্য মানিয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রুতি-বাক্যের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহারা ভারতবর্ষকে স্বকীয় সামর্থ্যের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে আহ্বান করিয়া ভারতবাসীর যে জ্ঞানান্ধতাপনোদন করিয়া গিয়াছেন,

তজ্জন্য আমি তাঁহাদের স্বদেশে জন্মিয়া ধন্য হইয়াছি। এ কথা গোপন করিবার প্রয়োজন নাই যে, ঐ দুই মহাপুরুষের অনুবর্তীরা ধর্ম-তত্ত্বের অনুসন্ধানের জন্য বিদেশযাত্রা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন, এবং অন্য দেশের অন্য জাতির শাস্ত্র হইতে সার্বভৌমিক ধর্মের সার সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম-পিপাসার পিপাসা যদি তাঁহাদিগকে পানীয়-অন্বেষণে পৃথিবী-ভ্রমণে বাধ্য করে তাহাতে দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। এই বিদেশে যাত্রীদিগের পরিশ্রমের জন্য আমরা তত দুঃখিত নহি; কিন্তু বিদেশের আকর্ষণে তাঁহারা স্বদেশী সামগ্রীর প্রতি যদি উপেক্ষা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহার জন্য ক্ষোভ করিবার হেতু আছে। যাহাই হউক, ধর্ম-তত্ত্বের অনুসন্ধানে বিদেশ-পর্যটন অনাবশ্যক হইলেও, আমরা ঐ অনাবশ্যক পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম এমন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে আপন ঘরে প্রত্যাবর্তনের জন্য ডাক দিলেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী সেই আহ্বান শুনিল, ও মাতৃমন্দির "আনন্দমঠ"-এ ফিরিয়া আসিতে সঙ্কোচ বোধ করিল না।

১ সলফ্রেট হাইড্রোজেন (Sulphurate Hydrogen)—রসায়ন-শাস্ত্রের প্রয়োগে ব্যবহৃত মিশ্র-পদার্থ বিশেষ।

২ ভাস্বরতা-পাদন—ইংরেজী Crystallisation-এর বঙ্গানুবাদ। কতকগুলি বস্তু দ্রব-অবস্থা হইতে কঠিন হইবার কালে স্ফটিকের মত নানা-কোণ-বিশিষ্ট মনোহর আকার ধারণ করে; যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই ব্যাপার ঘটে তাহাকে 'ভাস্বরতা-পাদন' বলে। লেখক বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ ছিলেন, কলেজে বিজ্ঞান পড়াইতেন, সেই জন্য রহস্য করিয়া মানব-চরিত্র বিশ্লেষণে নিজ অক্ষমতা জানাইয়াছেন।

৩ "গুপ্ত-কথা"র হরিদাস—"হরিদাসের গুপ্তকথা" নামক একখানা উপন্যাসের প্রচলন এক সময়ে খুব ছিল; এই বই নানা লোমহর্ষণ ঘটনায় পূর্ণ; উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য-পর্যায়ের নহে।

৪ হর্বর্ট স্পেন্সর (Herbert Spencer)—বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক (১৮২০—১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ)।

৫ সর্বনাশ সমুৎপন্ন হইলে—সংস্কৃত প্রবচন—"সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"—ইহার ছায়া বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬ Original Sin—আদিম বা মৌলিক পাপ। য়িহুদী 'পুরাণে'র মতে আদি মানব আদম, ঈশ্বরের নিদেশ অমান্য করিয়া যে পাপ করিয়াছিল, সেই পাপ বংশগত হইয়া সমগ্র মানব-জাতিতে বিদ্যমান। দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দর Original sin-এর অন্যরূপ যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিতেছেন।

৭ ঈশ্বর-বিরোধী স্বতন্ত্র পাপ-পুরুষ শয়তানের কল্পনা ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার অনুকূল নহে; এই বিশেষ ভাবধারা য়িহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মে মিলে; সেইজন্য লেখক বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত মুসলমান ধর্মের পারিভাষিক শব্দ 'খোদা' ও 'শয়তান' ব্যবহার করিয়াছেন।

৮ কুরুক্ষেত্র—মহাভারতে বর্ণিত অষ্টাদশ-দিন-ব্যাপী যুদ্ধ এখানে ঘটিয়াছিল। পাণ্ডব-পক্ষ ধর্ম ও কৌরব-পক্ষ অধর্মের প্রতীক ছিল, এইজন্য কুরুক্ষেত্রে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় হইয়াছিল বলা হয়। ধর্ম-অধর্মের রণক্ষেত্র-স্বরূপ কুরুক্ষেত্রের সঙ্গে মানব-হৃদয়ের তুলনা করা হইতেছে।

৯ গ্রীক—প্রাচীন গ্রীক জাতির সভ্যতার ভিত্তি বা আধারের উপরে ইউরোপের ও আধুনিক জগতের সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। জীবনের প্রায় সকল দিকে গ্রীক জাতির শ্রেষ্ঠ দান আছে, প্রাচীন গ্রীসের উৎকর্ষ অবলম্বন করিয়া আধুনিক সভ্যতার উৎকর্ষ।

১০ মোমেন্টম্ (momentum)—লাটিন শব্দ। মৌলিক অর্থ 'ক্ষণ, অল্পকাল' তদনন্তর, বিশেষ অর্থে 'চলমান বস্তুর পরিমাণ এবং তাহার গতিবেগের গুণন'—সংক্ষেপে, ইহার 'গতিবেগ'। 'গতি-বিজ্ঞান'—Dynamics.

১১ Apostle of culture—Apostle অর্থে 'দূত', বা বিশেষ অর্থে, 'দেবদূত'; মানসিক ও অন্তবিধ সংস্কৃতির প্রচারক।

১২ "ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ"—ধর্মকে রক্ষা করিলে, ধর্মও মানুষকে রক্ষা করে।

১৩ ভারতের বাহিরের সংস্কৃতিতে উচ্চ আধ্যাত্মিক সাধনার সন্ধানে যাইয়া অবশেষে ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতিতেই সেই সাধনার লাভ।

১৪ সার্বভৌমিক ও প্রাদেশিক ধর্ম—যে ধর্ম সকল দেশে, সকল কালে ও সকল মানবের পক্ষে সত্য, তাহা 'নিত্য ধর্ম' বা সার্বভৌমিক ধর্ম'; যে ধর্ম বিশেষ দেশ-কাল-পাত্র-নিবদ্ধ, তাহা 'লৌকিক' বা 'প্রাদেশিক ধর্ম'। 'মিথ্যা কথা বলিও না'—নিত্য ধর্ম; 'অমুক তিথিতে বা দিনে উপবাস করিও'—লৌকিক ধর্ম।

১৫ ব্রহ্মা জগৎ-স্রষ্টা, তিনি জগতের আদি বা পুরাতন কবি। হিন্দু দেবতা-বাদে ব্রহ্মার চারিটী মুখ কথিত হইয়াছে। তাঁহার বাণীই ঋষিদের দ্বারা শ্রুত, তাহা 'শ্রুতি' বা 'বেদ' শাস্ত্র।

১৬ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশোপনিষদের একটী শ্লোক একখানি ছিন্ন পত্রে পাঠ করিয়া উপনিষদের গভীর তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন।

১৭ শ্রুতি-বাক্য—শ্রুতি বা বেদের (উপনিষদের) বচন।

১৮ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরে ব্রাহ্ম-সমাজের একটী সম্প্রদায় সব ধর্ম-সমন্বয় করিবার চেষ্টায় পৃথিবীর তাবৎ ধর্মশাস্ত্র হইতে ভাব ও বচন-ধারার সংগ্রহ-কার্যে নিযুক্ত হন।

বিদ্যাসাগর-চরিত

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক রচিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্র-আলোচনা বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে মহাপুরুষের ব্যক্তিত্ব-বিশ্লেষণের অন্যতম সার্থক চেষ্টা। এই মূল্যবান্ নিবন্ধে বিদ্যাসাগরের মত অসাধারণ পুরুষের চরিত্র-গৌরব অতি সুন্দর-ভাবে বাঙ্গালী পাঠকের সমক্ষে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের প্রতিভা ছিল নানামুখী, তাঁহার কর্মও ছিল নানামুখ। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার, সাহিত্য ও শিক্ষা-বিস্তার, জনহিত ও নারীহিত, গুণীর আদর ও দরিদ্রের পোষণ—সব দিকে তিনি নিজের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তা ও কোমলতা, উভয় গুণের অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়। তাঁহার মধ্যে ভাব-প্রবণ বাঙ্গালীর কাছে সুলভ কোমলতাটুকু মাত্র ছিল না—তাঁহার মধ্যে একটা সবল সুদৃঢ় অটল অবিচল পৌরুষ দেখা যায়, যাহা

সাধারণ বাঙ্গালী-চরিত্রে দুর্লভ। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের এই সকল সদ্গুণ নিপুণ তুলিকাপাতে রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন। বিদ্যাসাগরের চরিত্র চিরকাল ধরিয়া আমাদের জাতির মানসিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষের কারণ হইয়া থাকিবে।

বিদ্যাসাগর তাঁহার "বর্ণ-পরিচয়" প্রথম ভাগে গোপাল নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপ-মায়ে যা বলে, সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন, তখন গোপালের অপেক্ষা কোনো-কোনো অংশে রাখালের১ সঙ্গেই তাঁহার সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক্, পিতা যাহা বলিতেন, তিনি ঠিক তাহার উল্টা করিয়া বসিতেন। শম্ভুচন্দ্র২ লিখিয়াছেন—"পিতা তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যেদিন সাদা বস্ত্র না থাকিত, সেদিন বলিতেন, 'আজ ভাল কাপড় পরিয়া কলেজে যাইতে হইবে', তিনি হঠাৎ বলিতেন, 'না, আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব।' যেদিন বলিতেন, 'আজ স্নান করিতে হইবে', শ্রবণ-মাত্র দাদা বলিতেন যে, 'আজ স্নান করিব না'; পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া টাঁকশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা চড়-চাপড় মারিয়া জোর করিয়া স্নান করাইতেন।

নিরীহ বাঙ্‌লা দেশে গোপালের মত সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মত দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে, বাঙালী জাতির শীর্ণ চরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাস করিয়া ভাল চাকুরি-বাকুরি ও বিবাহ-কালে প্রচুর পণ লাভ করে, সন্দেহ নাই; কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা

যায়। বহুকাল পূর্বে একদা নবদ্বীপের শচী-মাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে৩ এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু একটা বিষয়ে রাখালের সহিত তাহার জীবন-চরিত-লেখকের সাদৃশ্য ছিল না। "রাখাল পড়িতে যাইবার সময়ে পথে খেলা করে, মিছামিছি দেরি করিয়া সকলের শেষে পাঠশালায় যায়।" কিন্তু পড়াশুনায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। যে প্রবল জিদের সহিত তিনি পিতার আদেশ ও নিষেধের বিপরীত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই দুর্দম জিদের সহিত তিনি পড়িতে যাইতেন। সে-ও তাঁহার প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে নিজের জিদ রক্ষা। ক্ষুদ্র একগুঁয়ে৪ ছেলেটি মাথায় এক মস্ত ছাতা তুলিয়া তাঁহাদের বড়বাজারের বাসা হইতে পটলডাঙার সংস্কৃত-কলেজে যাত্রা করিতেন; লোকে মনে করিত, একটি ছাতা চলিয়াছে। এই দুর্জয় বালকের শরীরটি খর্ব, শীর্ণ, মাথাটা প্রকাণ্ড,—স্কুলের ছেলেরা সেই জন্য তাঁহাকে 'যশুরে কৈ'৫ ও তাহার অপভ্রংশে 'কশুরে জৈ' বলিয়া ক্ষ্যাপাইত; তিনি তখন তোৎলা ছিলেন—রাগিয়া কথা কহিতে পারিতেন না।

এই বালক রাত্রি দশটার সময় শুইতে যাইতেন। পিতাকে বলিয়া যাইতেন, রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহাকে জাগাইয়া দিতে। পিতা আর্মানী গির্জার ঘড়িতে বারোটা বাজিলেই ঈশ্বরচন্দ্রকে জাগাইতেন, বালক অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া পড়া করিতেন। ইহাও একগুঁয়ে ছেলের নিজের শরীরের প্রতি জিদ্‌। শরীর-ও তাহার প্রতিশোধ তুলিতে ছাড়িত না। মাঝে মাঝে কঠিন সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল, কিন্তু পীড়ার শাসনে তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই।

উহার উপর গৃহকর্মও অনেক ছিল। বাসায় তাঁহার পিতা ও মধ্যম ভ্রাতা ছিলেন। দাস-দাসী ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র দুইবেলা

সকলের রন্ধনাদি কার্য করিতেন। সহোদর শম্ভুচন্দ্র তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ঈশ্বরচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আবৃত্তি করিয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া কাশীনাথ বাবুর বাজারে বাটা মাছ ও আলু-পটল তরকারী ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাসায় তাঁহারা চারিজন খাইতেন। আহারের পর উচ্ছিষ্ট মুক্ত ও বাসন ধৌত করিয়া তবে পড়িতে যাইবার অবসর পাইতেন। পাক করিতে-করিতে ও স্কুল যাইবার সময়ে পথে চলিতে-চলিতে পাঠানুশীলন করিতেন।

এই তো অবস্থা। এদিকে ছুটির সময় যখন জল খাইতে যাইতেন, তখন স্কুলের ছাত্র যাহারা উপস্থিত থাকিত, তাহাদিগকে মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। স্কুল হইতে মাসিক যে বৃত্তি পাইতেন, ইহাতেই তাহা ব্যয়িত হইত। আবার দরোয়ানের নিকট ধার করিয়া দরিদ্র ছাত্র-দিগকে নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিতেন। পূজার ছুটির পর দেশে গিয়া, "দেশস্থ যে-সকল লোকের দিন-পাত হওয়া দুষ্কর দেখিতেন, তাহাদিগকে যথা-সাধ্য সাহায্য করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না। অন্যান্য লোকের পরিধেয় বস্ত্র না থাকিলে, গামছা পরিধান করিয়া নিজের বস্ত্রগুলি তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন।"

যে অবস্থায় মানুষ নিজের নিকট নিজে প্রধান দয়ার পাত্র, সে অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র অন্যকে দয়া করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে প্রথম ইহাই দেখা যায় যে, তাঁহার চরিত্র সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়-লাভ করিয়াছে। তাঁহার মত অবস্থাপন্ন ছাত্রের পক্ষে বিদ্যালাভ করা পরম দুঃসাধ্য; কিন্তু এই গ্রাম্য বালক শীর্ণ খর্ব দেহ এবং প্রকাণ্ড মাথা লইয়া আশ্চর্য অল্পকাল মধ্যেই 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার মত দরিদ্রাবস্থার লোকের পক্ষে দান করা,

দয়া করা বড় কঠিন, কিন্তু তিনি যখন যে অবস্থাতেই পড়িয়াছেন নিজের কোন প্রকার অসচ্ছলতায় তাঁহাকে পরের উপকার হইতে বিরত করিতে পারে নাই, এবং অনেক মহৈশ্বর্যশালী রাজা, রায়-বাহাদুর প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধি লাভ করিতে পারে নাই এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান সেই 'দয়ার-সাগর' নামে বঙ্গদেশে চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।

কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর প্রথমে ফোর্ট-উইলিয়াম-কলেজে প্রধান পণ্ডিত ও সংস্কৃত-কলেজের এসিস্টান্ট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। এই কার্যোপলক্ষে তিনি যে-সকল ইংরেজ প্রধান কর্মচারীর সংস্রবে আসিয়াছিলেন, সকলের-ই পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে প্রায় অনেকেই নিজের এবং স্বদেশে মর্যাদা নষ্ট করিয়া ইংরেজের অনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর, সাহেবের হস্ত হইতে শিরোপাং লইবার জন্য কখনো মাথা নত করেন নাই; তিনি আমাদের দেশের ইংরেজ-প্রসাদ-গর্বিত সাহেবানুজীবীদের মত আত্মাবমাননার মূল্যে বিক্রীত সম্মান ক্রয় করিতে চেষ্টা করেন নাই।

একটা উদাহরণে তাহার প্রমাণ হইবে। একবার তিনি কার্যোপলক্ষে হিন্দু কালজের প্রিন্সিপাল কার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সভ্যতাভিমানী সাহেব তাঁহার বুট-বেষ্টিত দুই পা টেবিলের উপরে উর্ধ্বগামী করিয়া দিয়া, বাঙালী ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রতা-রক্ষা করা বাহুল্য বোধ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ঐ কার সাহেব কার্য-বশত সংস্কৃত-কলেজে বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে আসিলে, বিদ্যাসাগর চটিজুতা-সমেত তাঁহার সর্বজন-বন্দনীয় চরণ-যুগল টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া এই অহঙ্কৃত

ইংরেজ অভ্যাগতের সহিত আলাপ করিলেন। বোধ করি শুনিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না, সাহেব নিজের এই অবিকল অনুকরণ দেখিয়া সন্তোষ-লাভ করেন নাই।

ইতিমধ্যে কলেজের কার্য-প্রণালী সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সহিত মতান্তর হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র কর্মত্যাগ করিলেন। সম্পাদক রসময় দত্ত এবং শিক্ষা-সমাজের অধ্যক্ষ ময়েট সাহেব অনেক উপরোধ-অনুরোধ করিয়াও কিছুতেই তাঁহার পণ ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। আত্মীয়-বান্ধবেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার চলিবে কি করিয়া?" তিনি বলিলেন, "আলু-পটল বেচিয়া, মুদির দোকান করিয়া দিন চালাইব।" তখন বাসায় প্রায় কুড়িটি বালককে তিনি অন্নবস্ত্র দিয়া অধ্যয়ন করাইতেছিলেন; তাহাদের কাহাকেও বিদায় করিলেন না। তাঁহার পিতা পূর্বে চাকরি করিতেন—বিদ্যাসাগরের সবিশেষ অনুরোধে কার্যত্যাগ করিয়া বাড়ি বসিয়া সংসার-খরচের টাকা পাইতেছিলেন। বিদ্যাসাগর কাজ ছাড়িয়া দিয়া প্রতি মাসে ধার করিয়া পঞ্চাশ টাকা বাড়ি পাঠাইতে লাগিলেন। এই সময়ে ময়েট সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর কাপ্তেন ব্যাঙ্ক নামক একজন ইংরেজকে কয়েকমাস বাঙলা হিন্দী শিখাইতেন। সাহেব যখন মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে বেতন দিতে গেলেন, তিনি বলিলেন, "আপনি ময়েট সাহেবের বন্ধু এবং ময়েট সাহেব আমার বন্ধু—আপনার কাছে আমি বেতন লইতে পারি না।"

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত-কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক ও ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপাল-পদে নিযুক্ত হন। আট বৎসর দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া শিক্ষা-বিভাগের নবীন কর্তা এক তরুণ সিভিলিয়ানের* সহিত মনান্তর হইতে থাকায়, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কর্মত্যাগ করেন।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত-কলেজে নিযুক্ত, তখন কলেজের কাজ-কর্মের মধ্যে থাকিয়াও এক প্রচণ্ড সমাজ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এক দিন বীরসিংহ গ্রামে বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পিতার সহিত বীরসিংহ-স্কুল সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতা রোদন করিতে করিতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া একটি বালিকার বৈধব্য-সংঘটনের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুই এত দিন এত শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবার কি কোন উপায় নাই?" মাতার পুত্র উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহ অথচ ভক্তি ছিল। ইহাও তাঁহার সুবৃহৎ পৌরুষের একটি প্রধান লক্ষণ। সাধারণত আমরা স্ত্রীজাতির প্রতি ঈর্ষাবিশিষ্ট; অবলা স্ত্রীলোকের সুখ স্বাস্থ্য স্বচ্ছন্দতা আমাদের নিকট পরম পরিহাসের বিষয়, প্রহসনের উপকরণ। আমাদের ক্ষুদ্রতা ও কাপুরুষতার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ইহাও একটি।

বিদ্যাসাগর প্রথমত বেথুন-সাহেবের[১০] সহায়তা করিয়া বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা ও বিস্তার করিয়া দেন। অবশেষে যখন তিনি বাল-বিধবাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিধবা-বিবাহ প্রচলনে চেষ্টা করেন, তখন দেশের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙলা গালি মিশ্রিত এক তুমুল কল-কোলাহল উত্থিত হইল। সেই মুষলধারে শাস্ত্র ও গালি-বর্ষণের মধ্যে এই ব্রাহ্মণ-বীর বিজয়ী হইয়া বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত প্রমাণ করিলেন, এবং তাহা রাজবিধি-সম্মত করিয়া লইলেন।

বিদ্যাসাগর এই সময়ে আরও একটি ক্ষুদ্র সামাজিক যুদ্ধে জয়-লাভ করিয়াছিলেন, এই স্থলে তাহার-ও সংক্ষেপে উল্লেখ আবশ্যক। তখন সংস্কৃত-কলেজে কেবল ব্রাহ্মণেরই প্রবেশ ছিল, সেখানে শূদ্রেরা সংস্কৃত

পড়িতে পাইত না। বিদ্যাসাগর সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শূদ্রদিগকে সংস্কৃত-কলেজে বিদ্যাশিক্ষার অধিকার দান করেন।

সংস্কৃত-কলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি—মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিট্যুশন[১১]। বাঙালীর নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষাকে স্বাধীন-ভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন, তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন, যিনি লোকাচার-রক্ষক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন; এবং সংস্কৃত-বিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না, তিনি-ই ইংরেজী বিদ্যাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল এই স্কুল ও কলেজটিকে একাগ্র-চিত্তে প্রাণাধিক যত্নে পালন করিয়া, দীন দরিদ্র রোগীর সেবা করিয়া, অকৃতজ্ঞদিগকে মার্জনা করিয়া, বন্ধু-বান্ধবদিগকে অপরিমেয় স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া, আপন পুষ্প-কোমল ও বজ্র-কঠিন বক্ষে দুঃসহ বেদনা-শল্য বহন করিয়া, আপন আত্মনির্ভরপর উন্নত বলিষ্ঠ চরিত্রের মহান্ আদর্শ বাঙালী জাতির মনে চিরাঙ্কিত করিয়া দিয়া, ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। কারণ, দয়াবৃত্তি আমাদের অশ্রু-প্রবণ বাঙালী-হৃদয়কে যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের

দয়ায় কেবল যে বাঙালী-জন-সুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, তাহাতে বাঙালী-দুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রবৃত্তির ক্ষণিক উত্তেজনা-মাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচল কর্তৃত্ব সর্বদা বিরাজ করিত বলিয়াই, তাহা এমন মহিমশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্ট-লাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্তকালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না। সংস্কৃত-কলেজে কাজ করিবার সময়ে, ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে, বিদ্যাসাগর তারানাথ তর্কবাচস্পতির জন্য মার্শেল-সাহেবকে[১২] অনুরোধ করেন। সাহেব বলিলেন, "তাঁহার চাকরি লইবার ইচ্ছা আছে কিনা অগ্রে জানা আবশ্যক।" শুনিয়া বিদ্যাসাগর সেই দিনেই ত্রিশ ক্রোশ পথ দূরে কালনায় তর্কবাচস্পতির চতুষ্পাঠি-অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পরদিনে তর্কবাচস্পতির সম্মতি ও তাঁহার প্রশংসাপত্রগুলি লইয়া, পুনরায় পদব্রজে যথাসময়ে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরের উপকার-কার্যে তিনি আপনার সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতেন। ইহার মধ্যেও তাঁহার আজন্মকালের একটা জিদ্ প্রকাশ পাইত। সাধারণত আমাদের দয়ার মধ্যে এই জিদ্ না থাকাতে, তাহা সঙ্কীর্ণ ও স্বল্পকাল-প্রসূ হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পৌরুষ-মহত্ত্ব লাভ করে না।

কারণ, দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নহে,—প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষের-ই ধর্ম। দয়ার বিধান পূর্ণ রূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ় বীর্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক। তাহাতে অনেক সময়ে সুদূরব্যাপী সুদীর্ঘ কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়, তাহা কেবল ক্ষণকালের আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাস-নিবৃত্তি এবং

হৃদয়ের ভার-লাঘব করা নহে—তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া দুরূহ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অপেক্ষা রাখে।

বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ, পুরুষোচিত; এই জন্য তাহা সরল এবং নির্বিকার; তাহা কোথাও সূক্ষ্ম তর্ক তুলিত না, নাসিকা-কুঞ্চন করিত না, বসন তুলিয়া ধরিত না; একেবারে দ্রুত পদে, ঋজু রেখায় নিঃশব্দে, নিঃসঙ্কোচে আপন কার্যে গিয়া প্রবৃত্ত হইত। রোগের বীভৎস মলিনতা তাঁহাকে কখনও রোগীর নিকট হইতে দূরে রাখে নাই। এমন কি (চণ্ডীচরণ-বাবুর[১৩] গ্রন্থে লিখিত আছে) "থর্মাটারে[১৪] এক মেথর-জাতীয় স্ত্রীলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইলে, বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার কুটীরে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে তাহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বর্ধমান-বাস কালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমানগণকে আত্মীয়-নির্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন।" শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার সহোদরের জীবন-চরিতে লিখিতেছেন, "অন্নসত্রে ভোজন-কারিণী স্ত্রীলোকদের মস্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত। অগ্রজ মহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রত্যেককে দুই পলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। যাহারা তৈল বিতরণ করিত, তাহারা পাছে, মুচি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীলোক স্পর্শ করে, এই আশঙ্কায় তফাৎ হইতে তৈল দিত; ইহা দেখিয়া অগ্রজ মহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট এবং অস্পৃশ্য-জাতীয় স্ত্রীলোকদের মাথায় তৈল মাখাইয়া দিতেন।"

এই ঘটনা শ্রবণে আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে, কিন্তু তাঁহার দয়ার মধ্য হইতে যে একটি নিঃসঙ্কোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে,

তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচ জাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণা-প্রবণ মন-ও আপন নিগূঢ় মানব-ধর্ম-বশত ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

গিরিশৃঙ্গের দেবদারু-দ্রুম যেমন শুষ্ক শিলাস্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া প্রাণ-ঘাতক হিমানী-বৃষ্টি শিরোধার্য করিয়া নিজের অভ্যন্তরীণ কঠিন শক্তির দ্বারা আপনাকে প্রচুর সরস শাখা-পল্লব-সম্পন্ন সরল মহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে, তেমনি এই ব্রাহ্মণ-তনয় জন্ম-দারিদ্র্য এবং সর্ব-প্রকার প্রতিকূলতার মধ্যে কেবল নিজের মজ্জাগত অপর্যাপ্ত বল-বুদ্ধির দ্বারা নিজেকে যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, এমন সর্বসম্পৎশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

নিজের অশন-বসনেও বিদ্যাসাগরের একটি অটল সরলতা ছিল, এবং সেই সরলতার মধ্যেও দৃঢ় বলের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বেই দৃষ্টান্ত দেখানো গিয়াছে, নিজের তিল-মাত্র সম্মান রক্ষার প্রতিও তাঁহার লেশ-মাত্র শৈথিল্য ছিল না। আমরা সাধারণত প্রবল সাহেবি অথবা প্রচুর নবাবি দেখাইয়া সম্মান-লাভের চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আড়ম্বরের চাপল্য বিদ্যাসাগরের উন্নত কঠোর আত্মসম্মানকে কখনো স্পর্শ করিতে পারিত না। ভূষণ-হীন সারল্যই তাঁহার রাজভূষণ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার দরিদ্রা "জননীদেবী চরখায় সূতা কাটিয়া পুত্রদ্বয়ের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন।" সেই মোটা কাপড়, সেই মাতৃস্নেহ-মণ্ডিত দারিদ্র্য তিনি চিরকাল সগৌরবে সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু, তদানীন্তন লেফটেনেণ্ট গভর্ণর হ্যালিডে সাহেব, তাঁহাকে রাজ-সাক্ষাতের উপযুক্ত সাজ করিয়া আসিতে অনুরোধ করেন। বন্ধুর অনুরোধে বিদ্যাসাগর কেবল দুই-এক দিন চোগা-চাপকান পরিয়া

সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সে লজ্জা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "আমাকে যদি এই বেশে আসিতে হয়, তবে এখানে আর আমি আসিতে পারিব না।" হ্যালিডে তাঁহাকে তাঁহার অভ্যস্ত বেশে আসিতে অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতি-চাদর পরিয়া সর্বত্র সম্মান-লাভ করেন, বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাঁহার নিজের সমাজে যখন ইহাই ভদ্রবেশ, তখন তিনি অন্য সমাজে অন্য বেশ পরিয়া আপন সমাজের ও সেই সঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। সাদা ধুতি ও সাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বর্তমান রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে সে গৌরব দিতে পারি না; বরঞ্চ এই কৃষ্ণচর্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি। আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মত এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়,—মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।

সেইজন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার সজাতি সোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন, চারিদিকের জন-মণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই।—তিনি

প্রতিদিন দেখিয়াছেন—আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না; ভূরি-পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল-পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স, নিজের বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তি-বিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়-হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ তিনি সর্ব বিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন। বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বন-জঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমশ শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে, বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধি-সহকারে বঙ্গ-সমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতা-জাল হইতে ক্রমশ-ই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন, কিন্তু আমাদের শত সহস্র ক্ষণজীবী সভা-সমিতির ঝিল্লী ঝঙ্কার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত, পীড়িত, অনাথ, অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্তমান নাই,—কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয় বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালী জাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া, সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া, সরল, সবল, অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব।

আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি; এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা পুরুষের মত দুর্গম বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য-বীর্য-মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিত-ভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে,—ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব; এবং যতই তাহা অনুভব করিব, ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালীর জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

১ গোপাল, রাখাল—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বর্ণপরিচয়" পুস্তকে গোপাল নামে নিরীহ প্রকৃতির একটি ভাল ছেলের এবং রাখাল নামে দুরন্ত প্রকৃতির একটি দুষ্ট ছেলের কথা আছে।

২ শম্ভুচন্দ্র—বিদ্যাসাগরের অন্যতম কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

৩ শচী-মাতার ছেলে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (বা চৈতন্যদেব) বাল্যে বিশেষ দুরন্ত ছিলেন। তিনি বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইয়াছিলেন।

৪ একগুঁয়ে—'এক + গোঁ (= জিদ্, আগ্রহ, দৃঢ় সংকল্প) + ইয়া' হইতে—'এক গোঁ যাহার'।

৫ যশুরে—'যশোহর' বা 'যশোর' + 'ইয়া' = 'যশোরিয়া', তাহা হইতে 'যশুরে' (উচ্চারণে 'জোশুরে')। বড় বড় কই-মাছের জন্য কলিকাতা অঞ্চলে যশোহর প্রভৃতি দক্ষিণ-বঙ্গের প্রসিদ্ধি আছে।

৬ আর্মানী গির্জা—১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ইংরেজদের অধিষ্ঠানের পূর্বে ব্যবসায়-সূত্রে আর্মানী-জাতীয় বণিকেরা এইস্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। ইঁহারা ছিলেন ধর্মে খ্রীষ্টান, পারস্য-রাজের প্রজা ছিলেন, পারস্য হইতে স্থল-পথে ভারতে ও বাঙ্গালায় আসিতেন। পুরাতন কলিকাতার মধ্যে বড়-বাজার অঞ্চলে ইঁহাদের এক প্রাচীন গির্জা বা ধর্ম-মন্দির আছে।

৭ শিরোপা—ফারসী 'সর্‌-ও-পা' (=শির ও পা) হইতে—অর্থ, 'মাথা ও পা'—আপাদমস্তক আবৃত হয় যাহাতে এমন পরিচ্ছদ, রাজানুগ্রহের নিদর্শন-স্বরূপ তুর্কী, পাঠান ও মোগল আমলে অনুগৃহীত ব্যক্তিকে এইরূপ দেওয়া হইত, ইহাকে 'সর্‌-ও-পা' বা 'খেলাৎ' বলা হইত। তাহা হইতে 'রাজানুগ্রহ, রাজপ্রসাদ, সম্মাননা'।

৮ বুট-বেষ্টিত—বিদেশী ও সংস্কৃত শব্দের সমাস। এইরূপ বহু মিশ্র-সমাস বাঙ্গালায় পাওয়া যায়—যথা, 'খ্রীষ্টাব্দ, গ্যাস-আলোকিত, প্রিন্সিপাল-পদ, ইংলণ্ডেশ্বর' ইত্যাদি।

৯ সিভিলিয়ান (Civilian)—যে-সমস্ত ইংরেজ কর্মচারী অসামরিক কার্যের জন্য (যথা—রাজস্ব-আদায়, বিচার, পরিদর্শন প্রভৃতি) ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া ('এত বেতনে এত দিন কাজ করিব') ভারতবর্ষ শাসন করিতে আসিতেন, ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় হইতে তাঁহাদিগকে Civilian বলা হইত। এখন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়া যে-সকল ইংরেজ ও ভারতীয় Indian Civil Service (I. C. S.) নামক শাসক-সম্প্রদায়ে প্রবেশ-লাভ করেন, তাঁহারাও অনেক সময়ে Civilian নামে অভিহিত হন্।

১০ বেথুন সাহেব—John Elliot Drinkwater Bethune (১৮০১—১৮৫১) ভারত-সরকারের পরামর্শ-সভার আইন-বিভাগের অধিকারী সদস্য ছিলেন। ইনি ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন, এবং বিশেষ উদার-হৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। ভারতের আইন-সংক্রান্ত বহু সংস্কার-সাধন ইঁহার চেষ্টায় হয়। ইঁহার নামে কলিকাতার Bethune College। (Bethune এই নামটি মূলে ফরাসী দেশের একটি ক্ষুদ্র নগরের নাম হইতে, ফরাসী উচ্চারণে 'বেত্যুন', তাহা হইতে পুরাতন ইংরেজীতে ইহা 'বেটান' বা 'বেট্যুন', পরে আধুনিক ইংরেজীতে ইহার বিকার দাঁড়ায় 'বীটন্'; অতএব, নামটির শুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ 'বীটন্', কিন্তু ইংরেজীতে 'বেথুন' রূপও অপরিচিত নহে।)

১১ মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিট্যুশন (অর্থাৎ রাজধানীস্থ প্রতিষ্ঠান')—এই কলেজ বাঙ্গালীর স্থাপিত প্রথম উচ্চ-শিক্ষার কেন্দ্র। অধুনা ইহার প্রতিষ্ঠাতার নামে ইহা 'বিদ্যাসাগর কলেজ' নামে পরিচিত। Calcutta Training School (১৮৫৯

খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত) নামক বিদ্যালয়কে অবলম্বন করিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নাম হয়—Hindu Metropolitan Institution.

১২ মার্শেল সাহেব—Captain G. T. Marshall—ইনি প্রথম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মন্ত্রী বা সম্পাদক ছিলেন। ময়েট্ সাহেব—Frederick John Mouat (১৮১৬-১৮৯৭); 'মৌঅট্, মোঅট্' (এখন 'মাউআট্' হইতে বাঙ্গালায় 'ময়েট্'।

১৩ ৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রচিত 'বিদ্যাসাগর-জীবনী' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে একখানি প্রামাণিক বই।

১৪ খর্মাটাড় বা খর্মাটাঁড়—সাঁওতাল-পরগণার একটি সুপরিচিত স্থান. বিদ্যাসাগর মহাশয় এখানে শারীরিক উন্নতির জন্য অবস্থান করিতেন।

বাল্য-স্মৃতি

[বিপিনচন্দ্র পাল]

বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ জন-নেতা লেখক এবং বক্তা বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ) বিগত যুগের বাঙ্গালা মনীষীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। শ্রীহট্ট ইঁহার জন্মস্থান। বঙ্গ-ভঙ্গের আন্দোলনে ইনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন, এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেশ-নেতাদের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনে পূর্ণ-রূপে যোগ দেন। ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে ভারতের দর্শন ও চিন্তা-সম্বন্ধে অনেক পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রবন্ধ ইংরেজী ও বাঙ্গালায় লিখেন। ইঁহার আত্মজীবন-চরিত "সত্তর বৎসর" নাম দিয়া ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই আত্মজীবনী বিশেষ চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে লেখা। ইহা হইতে, যেখানে শৈশব ও বাংলা দেশে শ্রীহট্টে কিরূপ আবেষ্টনীর মধ্যে বিপিনচন্দ্র পালিত হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা দিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

আমাদের বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব হইত—গ্রামে। পূজার সময় আমরা সকলেই বাড়ী যাইতাম। আমি একটু বড় হইলেই পূজার ফুল তুলিয়া, বিল্ব-পত্র বাছিয়া, তাহার অংশীদার হইয়াছিলাম।

সন্ধ্যাকালের আরতির সময়ে ধুপ-ধুনা[১] জ্বালাইতাম। মণ্ডপে ঢুকিবার অধিকার ছিল না, কিন্তু বারাণ্ডায় উঠিয়া বড় বড় ধুমুচিতে ধুপ দিয়া মণ্ডপ-ঘর প্রায় অন্ধকার করিয়া তুলিতাম। খড়-মাটি দিয়া প্রতিমা নির্মিত হয়, স্বচক্ষে দেখিতাম, ইহা সত্য। কিন্তু বিল্ব-ষষ্ঠীর[২] রাত্রি পর্যন্ত এই প্রতিমাতে পুত্তলিকা-বুদ্ধি থাকিলে-ও সপ্তমীর দিন প্রত্যূষে পুরোহিত যখন 'কলা-বধূ'কে[৩] স্নান করাইয়া মন্ত্র-পূত করিয়া দুর্গা-প্রতিমার পাশে আনিয়া রাখিতেন, তখন হইতে প্রতিমাতে আর প্রতিমা-বুদ্ধি থাকিত না; পূজার কয় দিন এ যে মাটির পুতুল, কিছুতেই ইহা ভাবিতাম না। নবমীর দিন সন্ধ্যা-আরতির সময়ে মনে হইত, যেন বিজয়ার আসন্ন বিরহ ভাবিয়া দেবী বাস্তবিক কাঁদিতেছেন। বিজয়ার সন্ধ্যার পরে প্রতিমা বিসর্জন দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলে, প্রাণে ঘোর অবসাদ আসিত। এখন মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া এ অবসাদ কেন হয় তাহা বুঝি। তিন দিনের নিরবচ্ছিন্ন উল্লাস ও উৎসাহের পরে উৎসবের অবসাদে, এ প্রতিক্রিয়া অপরিহার্য। কিন্তু বাল্যে এ জ্ঞান হয় নাই, হওয়ার কথাও ছিল না। সুতরাং বিজয়ার অবসাদ যে দেবতার বিরহ হইতে হয় নাই, ইহা বুঝিতাম না। তখন-ও দেবতায় বিশ্বাস ছিল—তবে এ দেবতা যে কি বস্তু, এ প্রশ্ন-ই মনে কখন-ও উঠে নাই। দেবতা মানুষের মত-ই, অথচ মানুষ নহেন, এতটুকু ধারণা হইয়াছিল।

এই সকল পারিবারিক পূজা-পার্বণের ভিতর দিয়া যাহা কিছু ধর্ম-শিক্ষা লাভ হইয়াছিল। এ শিক্ষা, মতের শিক্ষা[৪] ছিল না, ভাবের শিক্ষা এবং অনুভূতির শিক্ষাই ছিল। প্রথম যৌবন পর্যন্ত ধর্ম সম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা বেশী কিছু বোধ জন্মে নাই; তাহার পরে-ও জন্মিয়াছে কি না, সাহস করিয়া এ কথা বলিতে পারি না। এই সকল পূজা-

পার্ব্বণের ভিতর দিয়া অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাস-সাধন করিয়াছিলাম। এই সাধন-ই ধর্ম্ম-সাধনের গোড়ার কথা। আমরা চোখে যাহা দেখি, কানে যাহা শুনি, এ-সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা গ্রহণ করি, তাহার অতীতে-ও যে বস্তু আছে, তাহাই ধর্ম্ম-সাধনের বুনিয়াদ। প্রাচীন হিন্দু-সমাজে প্রচলিত পূজা-পার্বণের ভিতর দিয়া ধর্ম্ম-জীবনের এই ভিত্তি গাঁথা হইয়াছিল, একথা অস্বীকার করিতে পারি না। আর এই জন্যই নিজে যে সকল পূজা-পার্বণ বর্জন করিয়াও, আমার মা-বাবা যে-সকল পূজা করিতেন, তাহা যে পাপ-কার্য—এ অপরাধের কথা কখন কল্পনাও করি নাই। আমার পক্ষে এখন এ-সকল পূজার অনুষ্ঠান পাপ হইতে পারে; পাপ হইবে, মিথ্যা আচরণ বলিয়া, যাহা বিশ্বাস করি না তাহার ভাণ করিব বলিয়া; কিন্তু আমার পিতৃ-মাতৃকুলের গুরুজনেরা ঐ সকল প্রতিমা-পূজাতে যে পাপাচরণ করিতেন, ইহা কিছুতেই মনে করিতে পারি না।

আমাদের শ্রীহট্টের বাসায়-ও প্রায় সর্বদাই ব্রত-পূজা প্রভৃতি হইত। প্রতি শনিবারে শনির সেবা হইত। মা প্রতি মঙ্গলবারে মঙ্গল-চণ্ডীর ব্রত করিতেন। এ-ছাড়া জ্যৈষ্ঠ মাসে মা সাবিত্রীর ব্রত করিতেন। মায়েরা মাঘ মাসে প্রতি রবিবারে সূর্যের ব্রত করিতেন। এ সকল ব্রতের 'কথা' মায়ের কাছে বসিয়া আমিও শুনিতাম, আর ব্রত-শেষে প্রসাদের ভাগ তো পাইতাম-ই।

শ্রীহট্ট শহরে মাঝে-মাঝে যাত্রা-গান হইত। আমাদের বাসাতে-ও হইত, প্রতিবাসীদের বাড়ীতে-ও হইত। আমি প্রায় সর্বত্র-ই এ-সকল যাত্রা শুনিতে যাইতাম। আমার বাল্য-কালে রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক-যাত্রা ব্যতীত রাম-বনবাস, নিমাই-সন্ন্যাস প্রভৃতি যাত্রাও হইত। কিন্তু আমাদের বাসায় মা কিছুতেই নিমাই-সন্ন্যাস বা রাম-বনবাসের পালা

হইতে দিতেন না। আমি মায়ের একমাত্র পুত্র, বোধ হয় এই জন্যই রামের বনবাস বা নিমায়ের সন্ন্যাসের কথা শুনিলে তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিত। কৃষ্ণ-যাত্রার মধ্যে ঢাকার ৺কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের 'স্বপ্ন-বিলাস', 'রাই-উন্মাদিনী' এবং 'বিচিত্র-বিলাস'—এই তিনটী পালার কথা-ই বিশেষ মনে আছে। এ-সকল পালা মহাজন-পদাবলীর[৭] অনুকরণে রচিত। অনেক সময়ে গোস্বামী মহাশয়, বোধ হয়, তাঁহার সঙ্গীতে প্রাচীন পদ যোজনা করিয়া দিতেন। রসের অনুভূতিতে এ-সকল পদ মহাজন-পদাবলীর অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না।

শ্রীহট্ট শহরে সেকালে মাঝে-মাঝে ভদ্রলোকদিগের বাসায় 'পুরাণ-পাঠ'-ও হইত। কিন্তু এই পুরাণ-পাঠে কোন প্রকারে লোক-শিক্ষা হইত না। অনেক স্থলে একখানা পুথি জলচৌকির উপরে রাখা হইত, আর তাহারই সম্মুখে থালা বা রেকাবী থাকিত। আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া ঐ বাঁধা পুঁথিকে প্রণাম করিয়া ঐ থালার উপরে নিজেদের প্রণামী রাখিয়া দিতেন। এই পুরাণ-পাঠটা অনেক সময় গৃহস্থের পুরোহিত বা গুরু-ঠাকুরের জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ-সংগ্রহের একটা উপায়-মাত্র ছিল।

আমাদের বাড়ীর পুরোহিত-ঠাকুর যখন নিজে আসিতেন, তখন তিনি পুরাণ-পাঠ উপলক্ষ্যে "অধ্যাত্ম-রামায়ণ" কিছু কিছু পড়িতেন; অন্য সময়ে তাঁহার পুঁথিখানা বাঁধিয়া জলচৌকির উপরে সাজাইয়া রাখিতেন। তাঁহার অবর্তমানে আমাদের বাসায় যখন এইরূপ পুরাণ-পাঠ হইত, তখন কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পর্যন্ত এই রূপে বাঁধা থাকিত না। আমার মনে পড়ে, দুই-একবার আমার জেঠতুত ভাই—ইনি বাবার মুহুরী ছিলেন এবং বাবার সংসারের কাজ কর্মের তত্ত্বাবধান করিতেন—বাঙ্গালা নজীর খাতা[৮] দিয়া মুড়িয়া পুরাণ বলিয়া এই পাঠের সময়

রাখিতেন। এই প্রচ্ছন্ন নজীরকেই লোকে প্রণাম করিয়া প্রণামী দিয়া যাইতেন। কখনও আমাদের পরিবারে হয় নাই—কিন্তু অন্যত্র এমনও শুনা গিয়াছে যে, বালকেরা ছেঁড়া চটি এইরূপে মুড়িয়া পুরাণের আসনে স্থাপন করিত। লোকের ধর্ম-বিশ্বাস কতকটা যে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এই সকল ঘটনা এবং কাহিনীতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এইরূপ 'পুরাণ-পাঠ'-এর উদ্দেশ্য ছিল অর্থ-সংগ্রহ করা।

শহরে যখন যেখানে পূজা-পার্বণ হইত অথবা যাত্রা-গানাদি হইত, সেখানেই নিমন্ত্রিতদিগকে নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী প্রণামী দিতে হইত। যাঁহারা নিজেদের বাড়ীতে পুজা-পার্বণ বা যাত্রা-গানাদির ব্যবস্থা করিতেন, তাঁহারা এই সূত্রে তাঁহাদের প্রণামীর টাকা ফেরৎ পাইতেন। যাঁহাদের বাড়ীতে যে বৎসর পুজা-পার্বণ বা যাত্রা-গানাদি হইত না, তাঁহারা এই পুরাণ-পাঠের উপলক্ষে, এই টাকা ফেরৎ পাইতেন না। কেহ-কেহ পুরাণ-পাঠের প্রণামী নিজেরাই আত্মসাৎ করিতেন, কিন্তু অধিকাংশ সম্পন্ন গৃহস্থ এই প্রণামীর টাকা নিজেদের গুরু-পুরোহিতকেই দান করিতেন।

বলিয়াছি যে, আমার বাল্য-শিক্ষায় বাবা চাণক্য-নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন। এইজন্য আমার পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত তাঁহার নিকটে সুস্থ অবস্থায় কখনও কঠোর শাসন ব্যতীত আর কিছু পাই নাই। এই সময়ে কোন দিন আমার হাতে এক কপর্দক পর্যন্ত পড়ে নাই। কাগজ কলম বই খাতা যখন যাহা প্রয়োজন হইত, বাবা তাহা বাজার হইতে আনাইয়া দিতেন। বছরে একজোড়া জুতা বরাদ্দ ছিল। কেবল এই জুতা কিনিবার সময়ে কোনও বয়োজ্যেষ্ঠের সঙ্গে বাজারে যাইতে পাইতাম। নতুবা অন্য সময়ে কখনো বাজার-মুখো হইতে পর্যন্ত পারিতাম না। ইংরেজী ১৮৭২ সালে পূজার সময়ে

আমি ষোলো বছরে পা দিয়াছি, আর এই সময়েই সর্বপ্রথম বাবা আমার হাতে পূজার বাজারের কোন-কোন সাজ-সজ্জা কিনিবার জন্ত কিছু টাকা দেন। আমাদের গ্রামের বাড়ীতে এতাবৎকাল পর্যন্ত বেলোয়ারী লণ্ঠন ও দেয়ালগিরি ও শামাদান-ই যৎসামান্ত ছিল[১০]। পূজার সময়ে মোমবাতির আলো দিয়াই যথাসম্ভব রোশনাই[১১] করা হইত। চণ্ডী-মণ্ডপের সম্মুখে কলাগাছ পুঁতিয়া, তাহার সঙ্গে চেরা বাঁশ বিঁধিয়া সারি-সারি মাটির প্রদীপ দিয়া সন্ধ্যা-আরতির সময় আলোক-মালা রচিত হইত। তখন কেরোসিন তেলের আমদানী আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু বহুল ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই। এই বৎসরই (১৮৭২ সালে) প্রথমে আমার হাতে টাকা পড়াতে আমাদের বাড়ীতে হিন্‌কস্-এর ডবল-উইক ওয়াল ল্যাম্প (Hinks' Double-wick Wall-lamp) যায়, সেই আনন্দের স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে।

কিছুদিন পূর্বে "বঙ্গদর্শন"-এ আমার দুর্গোৎসবের স্মৃতি লিখিয়াছিলাম। এই দীর্ঘ জীবনে নানা প্রকারের বহু আনন্দ-উৎসব দেখিয়াছি ও ভোগ করিয়াছি; কিন্তু আমাদের যে দুর্গোৎসব হইত, তাহার মতন আনন্দ-উৎসব জীবনে কখনো দেখি নাই। এখনো তার আমেজ প্রাণে লাগিয়া আছে। শরতের প্রাতঃসূর্যের আলোকে এখনও প্রাণে সে আনন্দের সাড়া জাগে। দুর্গোৎসবের পূর্বের পক্ষকে 'পিতৃপক্ষ' কহে। আজিকালিকার বালকেরা বোধ হয় পিতৃপক্ষের কোন পরিচয়-ই পায় না। আমার বাল্যে আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত প্রতিদিন প্রত্যূষে প্রায় সকল ভদ্র গৃহস্থই প্রাতঃস্নান করিয়া আবক্ষ জলে দাঁড়াইয়া পিতৃলোকের তর্পণ করিতেন। সেই তর্পণের মন্ত্রে পল্লীর সমস্ত জলাশয়ের তীর মুখরিত হইয়া উঠিত। সে দৃশ্য ও সে মন্ত্রের ধ্বনি এখনও যেন চোখে

ভাসিতেছে ও মনে জাগিতেছে। পিতৃপক্ষ আসিলেই আমরা বুঝিতাম, পুজার আর দেরী নাই। মহালয়ার দিন হইতেই দেওয়ানী আদালত বন্ধ হইত, সেই সঙ্গেই স্কুলের-ও ছুটী হইত। বাবা নিয়মিত-রূপে মহালয়ার পার্বণ-শ্রাদ্ধ করিতেন। কোন বৎসর বা শহরেই এই শ্রাদ্ধ করিয়া পরে পুজার জন্য বাড়ী যাইতেন, কোন-কোন বৎসর বা বাড়ীতে যাইয়াই এই শ্রাদ্ধ করিতেন। সেই বাড়ী যাওয়ার আনন্দ জীবনে ভুলিব না। বৎসরান্তে আমাদিগকে পাইয়া গ্রাম-বাসীর কি আনন্দ! আর পুজার আনন্দ! তাহার তুলনা দিতে পারি পর-জীবনে এমন কিছু পাই নাই। 'পৌত্তলিকতা' কাহাকে বলে, তখনও তাহা জানি নাই। কিন্তু ওই প্রতিমা দেখিয়াই অপূর্ব আনন্দ লাভ করিতাম। তাহার পর, পুজার সময়ের অতিথি-অভ্যাগতের আনন্দ। বোধন[১২] হইতে প্রতিদিনের চণ্ডী-পাঠ—অর্থ-গ্রহণ করিতে পারিতাম না, কিন্তু সেই পাঠের ধ্বনি-ই যে 'হৃৎকর্ণ-রসায়ন' ছিল। পুজার পূর্ব হইতেই গ্রামে গ্রামে গানের দল গড়িয়া উঠিত। সখের যাত্রার দল নহে। আমাদের দেশে এ-সকলকে 'সখী-সংবাদের দল' বলিত। ইহারা একরূপ পদাবলী-ই গান করিত। তখন জানি নাই, এখন বুঝিয়াছি যে, এই সকল সখের কীর্তনের দল কখনও বা মান, কখনও বা বিরহ, কখনও বা কুঞ্জভঙ্গ পালা-ই[১৩] গান করিত। দুই তিন দল মিলিয়া এক আসরে পরস্পরের প্রতিযোগিতা করিত। কলিকাতা-অঞ্চলেও এক সময়ে এইরূপ গান হইত। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের "একাল ও সেকাল"-এ ইহার বর্ণনা আছে। মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলের সর্দারেরা একে অন্যের সঙ্গে 'কবির লড়াই' করিতেন। পুজার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া বাবা আমাদের বাড়ীতে নবমীর দিন রাত্রির পূর্বে কখনও এই কবি-গান হইতে দিতেন না।

দশমীর দিন-ই আমাদের বাড়ীতে পূজা-উপলক্ষ্যে 'গ্রাম-নিমন্ত্রণ' হইত। সে-কথা স্মরণ করিয়া, আমাদের প্রাচীন গ্রাম্য সমাজে জাতি-বর্ণের বিচার সত্ত্বেও কতকটা সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহা বুঝিতে পারিতেছি। জাতি-কুলের মর্যাদা ছিল, কিন্তু জাত্যভিমান ছিল না। এক-ই জাতির বা শ্রেণীর মধ্যে কুল-মর্যাদা লইয়া রেষারেষি হইত বটে, কিন্তু ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণীর বা জাতির মধ্যে কোনও প্রকারের প্রতিযোগিতা ছিল না। আর অতি নিম্ন জাতির লোকের মধ্যেও একটা অপূর্ব আত্মসম্মান-বোধ ছিল। গ্রামের যে সকল অসহায় গরীবেরা বার মাস প্রয়োজন-মত অকুণ্ঠা-সহকারে আমাদের বাড়ী হইতে চা'ল-ডাল-নূন-তেল চাহিয়া লইয়া যাইত-- পূজার সময়ে অথবা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষ্যে যে ভাবে ও যে লোকের মারফতে গ্রামের ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক-দিগের নিমন্ত্রণ হইত, সেই ভাবে ও সেই লোকের মারফতে গ্রামের নিম্নতম শ্রেণীর লোকদিগের নিমন্ত্রণ না হইলে, তাহারা কখনও আমাদের বাড়ীতে পাত পাতিতে আসিত না। আর বাবা যেমন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকদিগের ভোজনের সময়ে একরূপ গললগ্নীকৃত-বাসে[১৪] যাইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন, সেইমত যাহাদিগকে অস্পৃশ্য কহে তাহারা যখন আপন-আপন জাতির পংক্তি করিয়া উঠানে খাইতে বসিত, তখন বাবাকে তাহাদের-ও অভ্যর্থনা করিতে হইত। আমি বড় হইলে, পরিবেষণের ভার আমার উপরেও পড়িয়াছিল। আর সে সময়ে, মনে আছে, মা আমাকে সর্বদা কহিয়া দিতেন—এ সকল গরীব লোকদের বিশেষ-ভাবে অভ্যর্থনা করিবে। তাঁহার সে কথাগুলি পর্যন্ত মনে আছে। তিনি কহিতেন, "তোমার বাড়ীতে ভদ্রলোকেরা যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন, তাঁহারা খাইতে আসেন না। তাঁহারা নিজেদের বাড়ীতে যাহা খাইতে পান না এমন কিছু তুমি তাঁহাদিগকে

দিতে পার না। আর তাঁহারা কি খাইলেন, না খাইলেন, সে কথা লইয়া কখনও জটলা করিবেন না। গরীবেরা নিমন্ত্রণ-বাড়ীতেই ভাল জিনিস খাইতে পায়। আর তাহাদের মুখেই ভদ্র-পরিবারের সুনাম-দুর্নাম রটে। তাহারা তোমার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলে, তাহাদের-ই বেশী করিয়া যত্ন ও আদর করিবে।"

প্রাচীন গ্রাম্য জীবনের সাম্য সম্বন্ধে আরেকটা কথা মনে পড়িল। আমাদের গ্রামের নিকটেই একজন খুব বড় জমিদার ছিলেন, জাতিতে তেলী বা কলু। আমাদের অঞ্চলের তেলীদিগের মধ্যে সামাজিক পংক্তি-ভোজনে এই প্রথা ছিল যে, তাহারা এক-একটা মোটা মূলী বাঁশের উপরে দশ পনের জন করিয়া সার দিয়া খাইতে বসিত। কলা-পাতায় খাদ্যাদির পরিবেষণ হইত, আর কাঁসার বা পিতলের ঘটীতে পানীয় জল থাকিত, এক এক ঘটী হইতে চারি পাঁচ জন মিলিয়া পান করিত। একবার এই জমিদার জ্ঞাতিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া, প্রত্যেকের জন্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পিঁড়ি পাতিয়া, গ্লাস সাজাইয়া কর-জোড়ে যাইয়া তাঁহাদিগকে আহার-স্থলে ডাকিয়া আনিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠদিগের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ জ্ঞাতিবর্গ খাইতে চলিলেন। খাবার-ঘরের দরজায় যাইয়া ইঁহারা দাঁড়াইয়া রহিলেন। গৃহস্বামী কর-জোড়ে গললগ্নীকৃত-বাসে বসিতে অনুরোধ করিলেও ইঁহারা নড়িলেন না। তখন তাঁহার কি অপরাধ হইয়াছে ইহা জানিবার জন্ত তিনি অনুনয় করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠদের মধ্যে একজন সকলের মুখপাত্র হইয়া কহিলেন যে, "তুমি আমাদিগের অপমান করিবার জন্ত এই নিমন্ত্রণ করিয়াছ? তুমি ধনী, তোমার ঘরে বিস্তর থালা গ্লাস আছে; আমরা গরীব, তোমাকে যখন আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিব, তখন তো এইরূপ পিঁড়ি সাজাইয়া খাইতে দিতে পারিব না। এ অবস্থায়

তোমার সঙ্গে আমাদের আর সামাজিকতা চলে না; আমরা তোমাদের বাড়ীতে আর জল-গ্রহণ করিতে পারি না।" জমিদার মহাশয়ের তখন চৈতন্য হইল। টাকার জোরে যে তিনি স্বজন-বর্গের চাইতে উঁচু হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বিফল হইল। পরে প্রাচীন রীতি অনুসারে মূলী বাঁশ ও কলা-পাতা আনিয়া খাওয়াইবার আয়োজন করিতে হইল।

১ আরতির সময়ে ধূপ-ধুনা—দীপ, জ্বলন্ত কর্পূরখণ্ড ও অন্য পূজোপচার লইয়া দেবমূর্তির সমক্ষে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেব-পূজার যে অনুষ্ঠান করা হয়। বাঙ্গালা 'আরতি' শব্দ সংস্কৃত 'আরাত্রিক' শব্দ হইতে আসিয়াছে—ইহা মুখ্যতঃ রাত্রির ব সন্ধ্যার অনুষ্ঠান বলিয়া (সংস্কৃত শব্দটী প্রাকৃতে 'আরত্তিঅ' হয়, তাহা হইতে বাঙ্গালা 'আরতী, আরতি'; 'ধুনা' শব্দ 'ধূপন'—হইতে—'ধূপন—ধূয়ন—ধূমন—ধুনা')।

২ বিল্ব-ষষ্ঠী (বা ষষ্ঠী)—দুর্গা-পূজা শারদীয় শুক্লপক্ষের তিন দিন বা তিথি ধরিয়া হয়—সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী। ষষ্ঠীর রাত্রে বিল্ব-বৃক্ষের তলায় দুর্গাদেবীর বরণ করা হয়; তৎপরদিন মন্ত্রপূত করিয়া দেবীমূর্তিকে ও মূর্তির সম্মুখে রক্ষিত ঘটকে দেবতার অধিষ্ঠান-ভূমি-রূপে কল্পনা করা হয়।

৩ কলাবধূ—শরৎকালে পত্রে পল্লবে ফলে ফুলে শস্যে প্রকৃতিদেবীর জাগরণের উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া দুর্গা-পূজার অনুষ্ঠান হয়। তখন জগন্মাতা বা বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতীক-রূপে নয়টী বিভিন্ন বৃক্ষের পত্রাদি লইয়া 'নবপত্রিকা' গঠিত হয় (কলা, কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, দাড়িম, অশোক, মান এবং ধান)। এই নয়টীর মধ্যে কলা-গাছটীই সবচেয়ে বড়; দেবীর প্রতীক-স্বরূপ নবপত্রিকাকে সাড়ী দিয়া সজ্জিত করা হয়, তখন তাহার নাম হয় 'কলা-বউ'; অজ্ঞ লোকে উহাকে গণেশের বধূ বলিয়া মনে করে।

৪ মতের শিক্ষা—যুক্তি-তর্ক ও বিচার সাহায্যে কোনও বিশেষ ধর্ম-বিশ্বাসের শিক্ষা।

৫ শনির সেবা—আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের সহিত মানুষের জীবনের সংযোগ আছে, এগুলি মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, এই বিশ্বাস সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রায় সব জাতির মধ্যে আছে। শনিগ্রহ নানা দিক্ দিয়া মানুষের ক্ষতি করে,

শনিকে সেইজন্য প্রীত রাখা উচিত, এই বিশ্বাসে এদেশে হিন্দু জন-সাধারণের মধ্যে শনির পূজার রীতি আছে।

৬ নিমাই-সন্ন্যাস—চৈতন্যদেবের সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাওয়ার করুণ কাহিনী। চৈতন্যদেবের ভাল নাম ছিল 'বিশ্বম্ভর', ডাক-নাম ছিল 'নিমাঞি' বা 'নিমাই' (অর্থাৎ 'নিমের মত তিক্তা', অথবা 'মাতৃহীন'—অশুভ হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছায় এইরূপ অপনাম দেওয়া হইত), এবং সন্ন্যাসী হইয়া তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' নামে পরিচিত হন।

৭ মহাজন-পদাবলী—ভক্তপ্রাণ প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগকে বাঙ্গালা দেশে 'মহাজন' বলে, ইঁহাদের রচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলা বা চৈতন্যদেব-বিষয়ক গান 'পদ', এইরূপ পদ বা গানের সংগ্রহ 'পদাবলী'।

৮ খারুয়া—চলিত ভাষায় 'খেরো'—মোটা লাল রঙ্গের কাপড়, ইহা দিয়া পুঁথি বাঁধা হইত ও এখনও হইয়া থাকে।

৯ চাণক্য-শ্লোকে আছে, পাঁচ বৎসর পর্যন্ত শিশুকে আদর দিবে, পাঁচ হইতে পনোরো পর্যন্ত এই দশ বৎসর প্রহার দিবে, পরে ষোল বৎসর হইলে পুত্রের সহিত বন্ধু-ভাবে ব্যবহার করিবে।

১০ বেলোয়ারী—কাচের তৈয়ারী (ফারসী বিলৌর); লণ্ঠন—পুরাতন ইংরেজী lanthorn হইতে (আধুনিক lantern); দেওয়ালগিরি—দেওয়ালে যাহা আটকানো থাকে এমন বাতীদান; শামাদান—মাটীতে রাখা যায় এমন কাচের বাতীদান।

১১ রোশনাই—আলোক-সজ্জা। ফারসী 'রৌশন' বা 'রোশন'—আলোক (ইহা সংস্কৃত 'রোচন' শব্দের ফারসী প্রতিরূপ; তাহাতে বাঙ্গালা 'আই'-প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে (যেমন,—বাচাই, বাছাই, বড়াই ইত্যাদি)।

১২ বোধন—অর্থ, 'জাগরিত করানো,' 'আবাহন করা'। দুর্গাপূজার কয় দিন পূর্বে শুক্লপক্ষের আরম্ভ হইতে দেবীর আবাহনের জন্য যে চণ্ডী-পাঠ হয়। ('মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-এর অন্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্যকে 'চণ্ডী' বলে: ইহাতে সাত শত শ্লোক আছে বলিয়া ইহার আর এক নাম 'সপ্তশতী')।

১৩ মান, বিরহ, কুঞ্জভঙ্গ—রাধাকৃষ্ণ-লীলার গানে এই বিভিন্ন বিষয়গুলি অবলম্বন করিয়া গান গাওয়া হয়।

১৪ গললগ্নীকৃত-বাসে—গলায় কাপড় বা চাদর জড়াইয়া। চাদর বা উত্তরীয় গলায় দিয়া তবে ভব্য ভদ্র পোশাক হইত, সম্মাননীয় ব্যক্তির সমক্ষে উত্তরীয়-বিহীন অবস্থায় দাঁড়ানো বেয়াদবী বলিয়া বিবেচিত হইত। বিনয় জানাইবার জন্য এইভাবে সভায় সকলের সামনে গলায় চাদর দিয়া দাঁড়াইয়া নিবেদন করার রীতি আগে ছিল।

ভূদেব-চরিত

[মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়]

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫—১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) বাঙ্গালীর শিক্ষার প্রবর্ধন ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ বিষয়ে আধুনিক কালের একজন যুগ-নেতা ছিলেন। তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ একজন উদার-হৃদয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন। ভূদেববাবুর জন্মস্থান কলিকাতা, মৃত্যু হয় চুঁচুড়ায়। তিনি শিক্ষকতা-কার্য গ্রহণ করেন, এবং কার্যদক্ষতা ও চরিত্র-গুণে সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া, সরকারী শিক্ষা-বিভাগে অতি উচ্চ পদ লাভ করেন। ইতিহাস, শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে বহু চিন্তা ও সুযুক্তি-পূর্ণ পুস্তক লিখিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন।

ভূদেব-বাবুর পুত্র মুকুন্দদেব পিতার একখানি নাতিক্ষুদ্র জীবন-চরিত প্রণয়ন করেন। নিম্নে এই পুস্তক হইতে ভূদেবের নিজের কথায় লেখা তাঁহার ছাত্র-জীবনের একটি ঘটনা এবং তৎসম্বন্ধে মুকুন্দদেবের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ভূদেব-বাবু হিন্দু-কলেজে আসিয়া সপ্তম শ্রেণীতে ভরতি হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম চৌদ্দ বৎসর।

সংস্কৃত-কলেজ ছাড়ার পর কিঞ্চিন্ন্যূন তিন বৎসর কালের মধ্যে যে তিনটি স্কুলে তাঁহার কিছু-কিছু ইংরেজী পড়া হইয়াছিল, সেই সেই স্কুলে তিনি-ই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন।

হিন্দু-কলেজে ভরতি হওয়ার অব্যবহিত পর হইতেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহিত তাঁহার আলাপ হয়, এবং ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ বন্ধুত্ব জন্মে। মধুসূদনের জীবন-চরিত-লেখক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে ভূদেব-বাবু প্রাচীন বয়সে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা মধুসূদনের জীবন-চরিতের পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পত্র হইতে ভূদেব-বাবুর নিজের জীবনের কতকগুলি ঘটনা তাঁহার নিজের কথাতে অতি সুন্দর-রূপে জানা যায় বলিয়া, উহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে।

'মধুসূদনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দু-কলেজে। সংস্কৃত-কলেজ ছাড়িবার পরে আমি যখন হিন্দু-কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে আসিয়া ভরতি হই, তখন মধুও ঐ শ্রেণীতে পড়িত। মধুর তখন যৌবনের প্রাক্কাল, কিশোর অবস্থা অতিক্রান্ত-প্রায় হইয়াছে।

'রামচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক শিক্ষক আমাদিগকে পড়াইতেন। আমি যেদিন প্রথম ভরতি হইলাম, সেই দিন রামচন্দ্র-বাবু পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ইংরেজীওয়ালা মাত্রেই, বিশেষতঃ ইংরেজী-শিক্ষকেরা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্লেষ-বাক্য প্রয়োগ করিতে বড়ই ভালবাসেন। আমার পিতা যে একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন, রামচন্দ্র-বাবু তাহা জানিতেন, এবং সেই কারণেই পড়াইতে-পড়াইতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন— "পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল; কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বীকার করিবেন না।" আমি কোন কথা কহিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। স্কুলের ছুটীর পর বাড়ী আসিলাম। কাপড়-চোপড় ছাড়িতে দেরী সহিল না, একেবারে বাবার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাবা, পৃথিবীর আকার কি রকম?" তিনি বলিলেন, "কেন

বাবা, পৃথিবীর আকার গোল।" এই কথা বলিয়াই আমাকে একখানি পুঁথি দেখাইয়া দিলেন, বলিলেন, "ঐ 'গোলাধ্যায়' পুঁথিখানির অমুক স্থানটী দেখ দেখি।" আমি সেই স্থানটী বাহির করিয়া দেখিলাম, তথায় লেখা রহিয়াছে—"করতল-কলিতামলকবদমলং বিদন্তি যে গোলম্।"১ রচনাটী পাঠ করিয়া মনে একটু বলের সঞ্চার হইল। একখানি কাগজে ঐটী টুকিয়া লইলাম। পরদিন স্কুলে আসিয়া রামচন্দ্র-বাবুকে বলিলাম, "আপনি বলিয়াছিলেন, আমার বাবা পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিবেন না। কেন, বাবা তো পৃথিবী গোল-ই বলিয়াছেন; এই দেখুন, তিনি বরং এই শ্লোকটী পুঁথির মধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন।" রামচন্দ্র-বাবু সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া বলিলেন, "কথাটা বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল; তা তোমার বাবা ব'ল্‌বেন বৈ কি, তবে অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ।"

'রামচন্দ্র-বাবুতে ও আমাতে যখন এই সকল কথা হয়, তখন ক্লাসের একটী ছেলের চক্ষু আমাতে বিশেষ-রূপ আকৃষ্ট দেখিতে পাইলাম। বর্ণ কাল হইলেও ছেলেটী দেখিতে বেশ সুশ্রী, শরীর সতেজ, ললাট প্রশস্ত, চক্ষু দুইটী বড় বড় ও অতিশয় উজ্জ্বল, দেখিলে অতিশয় বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়শীল বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ স্কুলে ছিলাম, ততক্ষণই মধ্যে মধ্যে অতি তীব্র দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাহিতেছিল। ছুটীর পরে একেবারে আমার নিকটে আসিয়া শেক্-হ্যাণ্ড করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তোমার নাম কি, কোথায় ঘর তোমার?" ইত্যাদি। আমি তাহার এই অতি মিষ্ট সম্ভাষণে ও সৌজন্যে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া, একে একে তৎকৃত সকল প্রশ্ন-গুলিরই উত্তর দিলাম।

'ইনিই মধু। এই দিন হইতে ইহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হইল, এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই উভয়ে বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিল। মধু মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আমাদের বাটীতে আসিতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য সমপাঠীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ আমাদের বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করিল। আমার মা সকলকেই অতিশয় যত্ন করিতেন, আমাদের সকলকেই খাবার খাইতে দিতেন, গায়ে মাথায় ধুলা লাগিলে চুল আঁচড়াইয়া ও গা ঝাড়িয়া দিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া দিতেন। সেই হইতেই আমার মায়ের উপর মধুর যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। মধু আমাদিগের বাড়ীতে আসিত, কিন্তু আমি কোনদিন মধুর বাড়ীতে যাই নাই; মধু আমার তজ্জন্য অনুরোধ-ও করে নাই। বোধ হয়, আমাদের বাড়ীর ধরণ ও মধুর বাবার বাসা-বাড়ীর ধরণ স্বতন্ত্র ছিল; সুতরাং তথায় লইয়া গেলে পাছে আমার প্রীতি না হয়, এই জন্যই সম্ভবতঃ মধু আমাকে ওরূপ অনুরোধ কোন দিন করে নাই। ক্লাসে মধু ও আমি একসঙ্গে বসিতাম। মধু যে পুস্তকখানি পড়িত, সেখানি আমাকে না পড়াইলে তাহার তৃপ্তি হইত না। ফল কথা, উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব খুব প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল।'

রামচন্দ্র-বাবু ভূদেব বাবুর পিতা তর্কভূষণ মহাশয়কে জানিতেন। তর্কভূষণ মহাশয় যে একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। তবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে কাহার-কাহার যে প্রকৃত ভৌগোলিক তথ্যজ্ঞান আছে, এটা তাঁহার মনেই হয় নাই। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর গোলত্বের বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তাঁহারা উহাকে ত্রিকোণাকার-ই বলিয়া থাকেন; ছাত্রগণকে এই কথা বলিয়া একটু আমোদ করিবেন, সম্ভবতঃ এইরূপ কতকটা ইচ্ছা রামচন্দ্র-বাবুর হইয়াছিল, এবং সেই জন্যই, যেন সংস্কৃত-শাস্ত্র-ব্যবসায়ী-দলের

প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয়ের উদ্দেশে ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার তৎকালে মনে হইয়াছিল যে, এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পুত্র আজ ইংরেজী স্কুলে ইংরেজী শিখিতে আসিয়াছেন বলিয়াই প্রকৃত তথ্যটুকু শিখিবার সুযোগ পাইলেন।

ভূদেব-বাবু স্বীয় পিতার প্রতি যেরূপ অপরিসীম ভক্তিমান্ ছিলেন তাহাতে "তোমার বাবা এ কথা বলিবেন না,"—অর্থাৎ তোমার বাবা এ কথা জানেন না, শিক্ষক রামচন্দ্র-বাবুর এইরূপ উক্তি তাঁহার নিতান্তই অপ্রীতিকর ও অসহ্য হইয়াছিল। তিনি বাড়ী যাইয়া পিতার নিকট হইতে সমস্ত অবগত হইয়া পরদিন স্কুলে যতক্ষণ না সেই কথার খণ্ডন করতঃ রামচন্দ্র-বাবুকে নিরস্ত করিতে পারিয়াছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার চিত্ত সুস্থাবস্থ হয় নাই।

এই ঘটনাটী একটু বিশেষ মনোনিবেশ করিয়া বুঝিতে গেলে, আরও অনেক কথা সুস্পষ্ট হয়। ভূদেব-বাবুর সমস্ত জীবনের শিক্ষা কি? তাঁহার আচার-ব্যবহার এবং গ্রন্থ-রচনা প্রভৃতি সকলেতেই তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা, জড়-বিজ্ঞানের গর্বে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন ও আমাদের সভ্যতার প্রতি বিদ্রূপ করিতেছে; কিন্তু একটু ভাল করিয়া বুঝিলেই ভক্তি-ভাবে পিতৃতুল্য শাস্ত্রের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যায় যে, আমাদের অতুলনীয় শাস্ত্রাদির প্রতি অবজ্ঞা—ধৃষ্টতা এবং মূর্খতার-ই প্রকাশক। আর্য শাস্ত্রানুশীলনে আমাদের আত্মগৌরব, কার্যপ্রবণতা, জাতীয়তা—সমস্তই বজায় থাকে; বৈদেশিক শিক্ষা মাথার উপর বসে না, মুঠার মধ্যেই থাকিয়া যায়।

ঐদিনের ঘটনাটীকে সমস্ত হিন্দুজাতির বর্তমান অবস্থার প্রতিরূপও মনে করা যায়। স্কুল-কলেজে সযত্নে প্রচারিত পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা

আমাদের প্রায় সমস্ত প্রাচীন বিষয়েরই প্রতি উপেক্ষা, এবং স্থূল-বিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছে। আর সেই গণ্ডূষ-জল-বিহারী সফরীই২ সর্বদা আমাদের বালকদিগের নয়নপথে থাকায়, উহাকেই তাহাদের অপেক্ষাকৃত বড় এবং প্রোজ্জ্বল বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু পিতৃপিতা-মহাদির প্রতি যাঁহাদের অচলা ভক্তি, ভারতভূমির সেই সকল সুসন্তান বৈদেশিক বিদ্যাকেই সারাৎসার মনে করিতে না পারিয়া, এবং আর্য ঋষির বৈদিক স্তোত্রকে কেহ 'মেষপালকের গীত'৩ বলিলে তাহাতে মর্মাহত হইয়া শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এবং তাহার পুরস্কার-স্বরূপ অমূল্য ধন—অতুল্য শান্তি এবং প্রকৃত দৃষ্টি—পাইতেছেন। তরল-মতি যাঁহাদের সেরূপ আত্মাভিমান এবং আভিজাত্য-গৌরব নাই, তাঁহারা সযত্নে সদ্গুরু-সমীপে শাস্ত্র না পড়িয়াই তাহার উপর সাহেবী সুরে টিপ্পনী কাটিতেছেন, এবং পুরা মেজাজে সাহেব হইতেছেন।৪

পিতার সমব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের প্রতি কটাক্ষে ব্যথিত হইয়া বালক ভূদেব যে মনে ও যে পথে রামচন্দ্র-বাবুর বিদ্রূপ-বাক্যটীর প্রতিবাদ-চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই মনে এবং সেই পথে তিনি উত্তর-কালে আর্যশাস্ত্রের প্রকৃত তথ্যসমূহ অবগত হইয়াছিলেন, এবং শাস্ত্রে নির্দিষ্ট পারিবারিক, সামাজিক ও আচারাদি-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা-সকলের প্রতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের আক্রমণ যে অসঙ্গত ও অমূলক, তাহা স্বরচিত প্রবন্ধগুলিতে স্বদেশবাসীর নিকট পরিস্ফুট-রূপে প্রতিপাদন-পূর্বক স্বধর্মের সজ্ঞান সভক্তিক অনুশীলনের এবং স্বদেশহিতকর উদ্যমের দিকে স্রোত ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

১ সংস্কৃত শ্লোকার্ধটীর অর্থ—"যাঁহারা হাতের মধ্যে আগত আমলা-ফলের মত এই পৃথিবীকে গোলাকার বলিয়া জানেন।" পৃথিবীর আকার গোল, এবং তাহা

সূর্যের চারিদিকে ঘুরে, এই তথ্য প্রাচীন ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পৃথিবীর আহ্নিক গতির আবিষ্কর্তা আর্যভট্ট খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-শতকের শেষ-পাদে জন্মগ্রহণ করেন।

২ 'গণ্ডুষ-জল-বিহারী সফরী ফরফরায়তে'—এই শ্লোকার্ধ হইতে।

৩ 'মেষ-পালকের গীত'—ঋগ্বেদ ভারতের সভ্যতার প্রাচীনতম পুস্তক। ঋগ্বেদ-রচনার কাল লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে—কাহারও মতে ইহা অতি প্রাচীন, (খ্রীঃ-পূঃ ৮০০০।১০,০০০ বৎসর) কাহারও মতে খ্রীঃ-পূঃ ৪০০০, কাহারও মতে ২০০০, কেহ কেহ বলেন ১৮০০।১৫০০।১২০০।১০০০ খ্রীঃ-পূঃ। ঋগ্বেদের যুগের সভ্যতার প্রকৃতি লইয়াও তেমনি মতভেদ দেখা যায়। একটি মত অনুসারে, তখন আর্যেরা কতকটা যাযাবর বা ভবঘুরে জাতীয় লোক ছিলেন, এবং পশু-পালনই ছিল তাঁহাদের মুখ্য বৃত্তি : সেইজন্য তাঁহাদের রচিত স্তোত্র বা কবিতার ঐ বর্ণনা কেহ-কেহ দিয়াছেন।

৪ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা এবং জীবন-যাত্রা-বিষয়ক ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্যক্ পর্যালোচনা না করিয়া, দেশ-কাল-পাত্র লইয়া তাহার উপযোগিতা না বুঝিয়া, তাহার অজ্ঞতা-প্রসূত অযথা নিন্দা করার বিরুদ্ধে এই কথাগুলি বলা হইতেছে।

মুহ্‌সিনের দেশ-ভ্রমণ

[জনাব মোহম্মদ ওয়াজেদ আলি]

দানবীর হাজী মোহম্মদ মুহ্‌সিন (বা মোহ্‌সিন) (খ্রীঃ ১৭৩২-১৮১২) বাঙ্গালা দেশের এক মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার পূর্বপুরুষগণ পারস্য-দেশীয় ছিলেন, বাণিজ্য-সূত্রে ইঁহারা ভারতে ও বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হন। মুহ্‌সিন আরবী ফারসীতে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে পর, ইনি ভগিনীর বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন। এই অর্থ ইনি ধর্মার্থে ও শিক্ষা-বিস্তারের জন্য দান করিয়া যান। বার্ষিক দেড় লাখ টাকার উপর আয়ের সম্পত্তি ইনি মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে দেশের শিক্ষার উন্নতির জন্য দান করেন। হুগলীর ইমামবাড়া, হুগলী কলেজ (অধুনা তাঁহার স্মারক-স্বরূপ 'মুহ্‌সিন কলেজ' নামে পরিচিত), হুগলীর মাদ্রাসা, মুসলমান ছাত্রদের সাহায্যের জন্য 'মুহ্‌সিন বৃত্তি'—এই-সমস্ত ইঁহার-ই দানের ফল।

জনাব ওয়াজেদ আলি সাহেব রচিত মুহ্‌সিনের জীবন-চরিতে এই মহাত্মার

জীবনকথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে (১৩৪১ সালে প্রকাশিত)। নিম্নোদ্ধৃত অংশে মুহ্‌সিনের বিদেশ-ভ্রমণের কথার মধ্যে তাঁহার সময়ের ভারতের ও ভারতের বাহিরের অংশের মুসলমান-জগতের একটু দিগ্‌দর্শন হইবে।

মুহ্‌সিন শৈশব হইতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত হইলেও নিতান্তই ননীর পুতুলটী ছিলেন না ; ব্যায়ামপুষ্ট সুগঠিত দেহ, বিদ্যা, জ্ঞান ও সাধনায় পরিপুষ্ট মন, সাধু-সংসর্গের ফলে দৃঢ়ীভূত চরিত্র— এ সমস্তই তাঁহার ছিল। গুরু আগা শিরাজীর১ মুখে বাল্যে তিনি ভ্রমণ-কাহিনী শুনিয়াছেন ; কই, তেমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার তো সে নয়! পথে বিপদ আছে ; কিন্তু আনন্দ আছে তার চেয়ে ঢের বেশী। খোদার২ মহিমা যাহারা উপলব্ধি করিতে চায়, খোদার সৃষ্টির অন্ততঃ খানিকটা না দেখিলে তাহাদের আশা পূর্ণ হইবার নয়। অনন্ত-প্রসারিত জলরাশি, অভ্রভেদী উত্তুঙ্গ পর্বতমালা, ঘন-সন্নিবিষ্ট গহন অরণ্য, সীমাহীন শ্যামল প্রান্তর, প্রাণহীন নিঃসীম বালুকারাশি—এইরূপ অসংখ্য বস্তু জগতে দেখিবার আছে ; অগণিত বরেণ্য নর-নারীকে আমাদের জানিবার আছে ; সংখ্যাহীন জ্ঞান-সাধকের কাছে সৃষ্টির গূঢ় তত্ত্ব আমাদের বুঝিবার আছে ; খোদার সম্বন্ধে কত রহস্য আমাদের শিখিবার আছে। এই সবের সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ানো কি কম আনন্দের ? মুহ্‌সিনের চিত্ত কোন বাধা মানিল না, তিনি মক্কা-মদিনা জিয়ারত৩ করিবেন, নজফ-কারবালা৪ দর্শন করিবেন, ঐ সব দেশের মাটিতে যে পুণ্য স্মৃতি জড়াইয়া আছে; তাহার সৌরভে মন প্রাণ স্নিগ্ধ শীতল করিবেন। এ দেশে তো তাঁহার থাকা চলে না ; চির-কুমার সন্ন্যাসীর জীবন তাঁহার—তিনি তীর্থ-ভ্রমণে অন্তরের সকল জ্বালা জুড়াইবেন। তাই মুহ্‌সিন কোন বাধা মানিলেন না ; প্রাণের অসীম আবেগে ছুটিয়া চলিলেন। বত্রিশ বৎসর তাঁহার

বয়স; তাঁহার দেহের হাড় এখন আর নিতান্ত কাঁচা নয়—তিনি সাহসে ভর করিয়া, উদাসী মনের খোরাক জোগাড় করিতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

তখনকার দিনের দেশ-ভ্রমণ কিরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল, এ যুগে তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারা একটু কঠিন। মোটর নাই, রেল নাই, অন্যরূপ যান-বাহন পাওয়াও সহজসাধ্য নয়। তা ছাড়া, পথ তখন অত্যন্ত বিপৎ-সঙ্কুল—কোথায় কখন চোর-দস্যুর হাতে পড়িতে হয়, কখন হিংস্র পশুর উদ্যত গ্রাস পথিকের জীবন বিপন্ন করে, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। বিশ্রামের স্থান সরাইখানা সকল জায়গায় মিলে না; অনেক পথ চলিবার পর হয় তো কোথাও একটা আড্ডা মিলিয়া গেল, নয় তো গাছের তলায় কিংবা গাছের উপরে রাত কাটাইতে হইল। তখনকার দিনের ভ্রমণকারীকে এই সমস্ত বিপদ্ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া পথে বাহির হইতে হইত। মুহ্‌সিন তাহাই করিলেন। চিত্তে তাঁহার জ্ঞানের জ্যোতি, বুকে তাঁহার পুণ্যের আশা, মুখে আল্লার নাম, দেহে তাঁহার বিপুল শক্তি সহিষ্ণুতা। তিনি দুর্ভাগ্য স্বদেশকে ছাড়িয়া শান্তির আশায় পুণ্যতীর্থে চলিলেন।

প্রথমে চলিলেন তিনি আরবের দিকে। হজরত মোহম্মদ যে দেশে জন্মিয়াছিলেন, যে দেশের মাটি তাঁহার চরণের স্পর্শ পাইয়াছে, যে দেশের জল হাওয়ায় তাঁহার-ই সুরভি স্মৃতি ছড়াইয়া আছে, যে দেশের মাটিতে তাঁহার পুণ্য দেহ মিশিয়া রহিয়াছে, সেইখানেই মুহ্‌সিনের চিত্ত ছুটিয়া যাইতে চাহিল। তিনি ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া আপনার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

মোগল রাজশক্তি তখনো একেবারে নিঃশেষ হয় নাই; তাহাদের কৃতিত্বের শত-সহস্র চিহ্ন তখনো দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে উজ্জ্বল হইয়া

আছে। মুহ্‌সিন সেগুলি দেখিতে লাগিলেন, আর হৃদয় তাঁহার বেদনার ঘায়ে জর্জরিত হইতে লাগিল;—মোগলের শক্তি-মূল তখন ছিন্ন হইয়াছে; তাহার পতন অত্যন্ত আসন্ন। কিন্তু তিনি সকল সহিয়া শান্তিনিকেতনের দিকে ছুটিলেন। প্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখিয়া তিনি বিস্মিত মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু গতি তাঁহার বন্ধ হইল না। তিনি সম্মুখেই চলিতে লাগিলেন; কত নদ নদী, গিরি কান্তার তিনি ছাড়িয়া চলিলেন; কত নগর নগরী ও বিস্তীর্ণ জনপদ দেখিতে দেখিতে তিনি অগ্রসর হইলেন।

অবশেষে তিনি তাঁহার চিরপ্রিয় আরব দেশে পৌঁছিলেন, সেখানকার মাটি তুলিয়া চোখে-মুখে মাখিলেন, কা'বার[৬] পার্শ্বে বসিয়া প্রার্থনা করিতে করিতে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন। ইব্রাহীম নবীর[৭] কথা তাঁহার মনে পড়িল; তিনি ছিলেন দলের সর্দার, গোষ্ঠীর রাজা; তাঁহার পুত্র ইস্‌মাইল এইখানে আল্লার নামে কোরবান্[৮] হইতে আসিয়াছিলেন; তাঁহারা আজ কোথায়? মুসা, দাউদ্, সোলয়মান্[৯] —কোথায় গেলেন ইঁহারা? হজরত মোহম্মদ, তাঁহার অমিতপ্রতাপ খলীফাগণ[১০]—তাঁহারাই বা আজ কোথায়? মুস্‌লিম একদিন জগতে যে মহিমা অর্জন করিয়াছিল, তাহাই বা আজ কি করিয়া এত হীন হইয়া পড়িল? মাতৃভূমি বাঙ্‌লার আজ বিদেশীর অধিকার, ভারতে আজ মোগল-শক্তির পতন; মুহ্‌সিনের চক্ষু ভরিয়া অশ্রুর বান ডাকিল; সংসারের অনিত্যতার কথা ভাবিয়া তিনি প্রভুর চরণে শরণ মাগিলেন।

মক্কা হইতে হজ সম্পন্ন করিয়া মুহ্‌সিন মদীনা চলিলেন। হজরতের রওজা মোবারকে[১১] পড়িয়া তিনি আবার কাঁদিলেন,—মোহম্মদ মোস্তাফার[১২] প্রচারিত বাণীর বাহক মুসলিম আজ আল্লার কোপানলে

ভস্মীভূত হইতে চলিয়াছে। এর হজরত![১৩] আজ যদি তুমি বাঁচিয়া থাকিতে! মুহ্‌সিনের আত্মা যেন সাড়া দিয়া উঠিল। আজ যদি পয়গম্বর-এ-খোদা[১৪] ফিরিয়া আসিতেন, মুসলিমের এখনও দুর্দশা হইত না—সে আবার গৌরবের আসনে বসিতে পারিত, তাহার শির আবার মহিমায় সমুন্নত হইত, তাহার সম্ভ্রম আবার সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত।

হাজী[১৫] মুহ্‌সিন মদীনা হইতে নজফ শহরের দিকে চলিলেন। কারবালা শিয়া-সম্প্রদায়ের তীর্থভূমি; মক্কা-মদীনার তীর্থরেণু মাখিয়া তিনি প্রথমে নজফে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নজফের পথে মুহ্‌সিন সর্বস্বান্ত হইলেন। শ্রান্ত হইয়া একদিন তিনি পথিপার্শ্বে শয়ন করিয়া আছেন, এক সময় এক চোর আসিয়া তাঁহার পুঁটুলিটি লইয়া গেল। হাজী জাগিয়া দেখেন—তাঁহার সমস্ত টাকাকড়ি চুরি হইয়াছে। এখন কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তিনি এক মসজিদে গিয়া আশ্রয় লইলেন। সেখানে দৈবক্রমে স্ববংশীয় নজফবাসী একটী লোকের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তিনি তাঁহাকে লইয়া পরম আদরে ও যত্নে আপনার গৃহে রাখিলেন। নজফে অনেক শিয়া আলেম-ওলামায়[১৬] বাস। মুহ্‌সিন একদিন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া, আপনার জ্ঞানপিপাসা মিটাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। তিনি মুহ্‌সিনের সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ছাত্র অসাধারণ ব্যক্তি, তাঁহাকে জ্ঞান দান করিবার জন্য তিনি তখনই সাগ্রহ সম্মতি জানাইলেন।

এইখানে একদিন এক মজার কাণ্ড ঘটিল। একদিন হাজী মোহম্মদ মুহ্‌সিন একটী বাগানে শুইয়া আরাম করিতেছেন; স্নিগ্ধ বাতাসে তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময়ে একটী চোর

প্রহরীর তাড়া খাইয়া সেই বাগানে আসিয়া ঢুকিল, এবং হাজী মুহ্‌সিনকে নিদ্রিত দেখিয়া চোরাই মাল তাঁহার শিয়রে রাখিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে চোরের খোঁজ করিতে-করিতে প্রহরীরা বাগানে ঢুকিয়া দেখিল, একটী লোক ঘুমাইয়া আছে, তাহার শিথানে[১৭] চোরাই মাল! ইহা দেখিয়া তাহারা মনে করিল, চোর নিদ্রার ভাণ করিয়া তাহাদের হাত হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছে। আর কথা কি? তাহারা তখনই হাজীকে পাকড়াও করিয়া হাজতে লইয়া গেল। মুহ্‌সিন অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না; তিনি যখন ব্যাপারটি বুঝিতে পারিলেন, তখনও চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বিচারের জন্য তিনি কাজীর[১৮] দরবারে নীত হইলে, বিচারক অবাক্ বিস্ময়ে হাজীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মুহ্‌সিন তখন আনুপূর্বিক সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। কাজী হাসিতে-হাসিতে তাঁহাকে মুক্তি দিলেন।

নজফ হইতে মুহ্‌সিন শিয়ার মাতম্-গাহ[১৯] কারবালায় গমন করিলেন। যে ফোরাত[২০] একদিন ইমাম হোসেন[২১] ও তাঁহার পরিবারবর্গের উষ্ণ রুধির-স্রোতে রঞ্জিত হইয়াছিল, যাহার তীরে ইমাম-পরিবারের দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর বক্ষে বিপক্ষের বাণ আসিয়া বিদ্ধ হইয়াছিল, যাহার স্রোতে একদিন শিমরের[২২] হস্তে ইমাম হোসেনের শির দেহচ্যুত হইতে দেখিয়া কাতর ক্রন্দনে ছুটিয়া চলিয়াছিল, সেই ফোরাতের কূলে মুহ্‌সিন উপবেশন করিলেন। অতীত ইতিহাসের কত স্মৃতি তাঁহার মনের মধ্যে আসিয়া ভীড় জমাইতে লাগিল। ইমাম হোসেনের শোচনীয় পরিণতির কথা স্মরণ করিয়া তিনি চোখের জলে বুক ভাসাইলেন। কাঁদিয়া খোদার দরবারে তাঁহার অন্তরের কত না আকুল আবেদন জানাইলেন!

তাহার পর প্রার্থনাপূত অন্তর লইয়া তিনি সেখান হইতে দেশান্তরে চলিলেন।

মিসরে জামে 'অল্-অজহার'* বিখ্যাত শিক্ষা-কেন্দ্র। মুহ্‌সিন এইবার সেই দেশের পথ ধরিলেন। কত দিন গেল, মাস গেল; শেষে তিনি অল-কাহিরায়—কাহিরো নগরীতে—আসিয়া পৌঁছিলেন। জামে অল্-অজ্‌হার তাঁহার মত ছাত্র পাইয়া একেবারে লুফিয়া লইল। এখানে তিনি ধর্মাচার্যদের সঙ্গে থাকিয়া বহু নূতন নূতন জ্ঞানের অধিকারী হইলেন।

মিসরে কয়েক বৎসর কাটাইয়া তিনি তাঁহার পিতৃপুরুষের জন্মভূমি ইরান বা পারস্যের দিকে ফিরিলেন। পথের ক্লেশ তাঁহাকে দমাইতে পারিল না; মুহ্‌সিন যেন তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষ। দেশ হইতে দেশান্তরে যাইতে তাঁহার দ্বিধা নাই, ক্লান্তি নাই, শঙ্কা নাই। ছোট-বড় কত না বিপদ্ তাঁহার উপরে আসিয়া পড়িতেছে, কত না বেদনার আঘাতে তিনি জর্জরিত হইতেছেন,—কিন্তু যোগী মহামানব নির্বিকার, অচঞ্চল, তাই সুদূর মিশর হইতে ইরানে আসিতে তিনি ভয় পাইলেন না। বহুদিন পথে কাটাইয়া, তিনি পিতৃপুরুষের দেশে আসিলেন। ইস্পাহান তাঁহার দর্শনীয় স্থান। মন্নু-জানের পিতা আগা মোতাহার এইখান হইতেই ভারতে গিয়াছিলেন; তাঁহার পিতা হাজী ফয়জুল্লাও মাতুলের সন্ধানে এই শহর হইতেই ভারতের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি প্রাণ ভরিয়া পিতৃপুরুষের জন্মভূমি দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অনেক দিন ইরানে কাটিয়া গেল।

অবশেষে নীড়-পলাতক পাখী আবার নীড়ে ফিরিয়া আসিতে চাহিল। হাজী মোহম্মদ মুহ্‌সিনের মন স্বদেশের জন্য আবার কেমন-

কেমন করিতে লাগিল। যৌবনে তিনি আশা-আকাঙ্ক্ষার এক মুঠা ভস্ম সঙ্গে লইয়া খোদার দুনিয়া দেখিয়া প্রাণের অপরিসীম জ্বালা জুড়াইবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। আজ এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার প্রাণে শান্তি আসিয়াছে কি? তবে তাঁহার মন আজ স্বদেশের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল কেন? মদীনায় প্রভুর আদেশ তাঁহার মনে পড়িল; কী সে মহৎ কার্য, মহা সাধনা করিবার গুরুভার তাঁহাকে বহন করিতে হইবে? তিনি নূতন সাধনার সন্ধানে স্বদেশের পথে আসিতে লাগিলেন।

হাজী মুহ্‌সিন যখন লখ্‌নৌ[২৪] পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর। বিভিন্ন দেশ হইতে শাস্ত্র-জ্ঞান ও হিকমৎ[২৫] কুড়াইয়া লইয়া, বৃদ্ধ মুহ্‌সিন ভারতে মুসলিম জ্ঞান ও সভ্যতার শেষ আশ্রয় লখ্‌নৌয়ে গিয়া উঠিলেন। নবাব আসফুদ্দৌলা নিজে পরম পণ্ডিত ছিলেন, মুহ্‌সিনের বিদ্যা ও গভীর জ্ঞানের কথা তাঁহার কানে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। তিনি হাজী মুহ্‌সিনকে সাদরে তাঁহার দরবারে আহ্বান করিলেন। কিন্তু হাজী তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিলেন না; অগত্যা নবাব নিজেই তাঁহার কাছে আসিলেন। হাজী মুহ্‌সিন তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনায় সেখানে কিছুদিন কাটাইয়া দিলেন। নবাব তাঁহাকে স্থায়ী ভাবে লখ্‌নৌয়ে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কোলাহলময় নগরীর অশান্তি ভাল লাগে না; পল্লীর নিভৃত কোণে গিয়া জ্ঞান-চর্চা করিলে কি তিনি শান্তি পাইবেন? অসম্ভব কি?

মুহ্‌সিন পুনরায় মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। পূর্বের গৌরবময়ী নগরী আজ শ্রীহীন; নগরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রভাবও আজ চলিয়া গিয়াছে। সাতাশ বৎসর আগে তিনি স্বদেশ

ত্যাগ করিয়াছিলেন; ইহার মধ্যে কত না পরিবর্তন দেখা গিয়াছে। মুর্শিদাবাদের সে রাজ্যশ্রী আর নাই, নবাবের সে দরবার নাই; সেনা-সৈন্যের সে সমারোহ আর নাই; বাঙ্গালার রাষ্ট্রকেন্দ্রের আগেকার সে জীবন-ই এখন আর নাই। তথাপি বৃদ্ধ-বয়সে ষাট বৎসরে মুহ্‌সিন আবার এখানেই ফিরিলেন। কিছুদিন এখানে কাটাইয়াও তিনি শান্তি পাইলেন না; অগণিত তীক্ষ্ণ কণ্টক যেন তাঁহার হৃদয়ে বিঁধিতে লাগিল। মুর্শিদাবাদে আসিবার পর, তাঁহার জ্ঞান-গরিমা ও বিদ্যাবত্তার কথা শুনিয়া নবাব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন; একবার নয়, দুইবার নয়—অনেকবার আসিলেন। কিন্তু মুহ্‌সিন একদিনের জন্য-ও নবাবের প্রাসাদে গমন করিলেন না; কণ্টকের ঘায়ে জর্জরিত মন লইয়া কি করিয়া তিনি নবাবের প্রাসাদে যাইতে পারেন? নবাব মুহ্‌সিনকে ভাল করিয়া জানিতেন; তিনিও কোনো দিন মুহ্‌সিনকে তাঁহার প্রাসাদে যাইবার জন্য আহ্বান করেন নাই। এই সময়ে মুর্শিদাবাদে তিনি দরবেশের জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার অর্থ নাই; প্রত্যূষে ফজরের নমাজ[২৬] পড়িয়া তিনি কোর্‌'আন[২৭] পাঠ করিতেন; তারপর নিজের হাতে রান্না করিয়া সমাগত ভিক্ষুকদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া আহার করিতেন। কেহ সাহায্যপ্রার্থী হইলে, তিনি যথাসাধ্য তাহার অভাব মোচন করিতেন। হাজী মোহম্মদ মুহ্‌সিনের হস্তলিপি অতি সুন্দর ছিল; তিনি কোর্‌'আন লিখিতেন তাহা অনেক মূল্যে বিক্রীত হইত; এই অর্থ হইতে তিনি প্রার্থীদের সাহায্য করিতেন। ইহা ছাড়া, সেলাই ও লৌহকারের কাজও তিনি করিতেন। যৌবনের শিক্ষা আজ দরিদ্রের অভাব-মোচনের জন্য কাজে আসিল। দর্জী ও লৌহকারের কাজ করিয়া রাত্রিতে যতটুকু অবসর পাইতেন, কোর্‌'আন লিখিতেন। ইহাতে তাঁহার যে কত কষ্ট

হইত, তাহা অনুমান করা শক্ত নয়, তথাপি মুহ্সিন বৃদ্ধ বয়সে এই কষ্ট হাসিমুখে বরণ করিলেন ॥

১ আগা শিরাজী—মুহ্সিনের ধর্মগুরু। 'আগা' বা 'আকা' অর্থে 'প্রভু', সাধারণতঃ উপাধি-রূপে এই শব্দ বা হৃত হয়। শিরাজ শহরে জাত, বা শিরাজ হইতে আগত বলিয়া উপনাম 'শিরাজী'।

২ খোদা—'ঈশ্বর'। ফারসী শব্দ। অর্থ—'যিনি স্বয়ং (অপরের দ্বারা চালিত না হইয়া) কার্য করেন'। প্রাচীন-পারসীক ভাষায় 'খ্-দা' হইতে, ইহার সংস্কৃত রূপ হইবে 'স্ব-ধা'। (সংস্কৃত ও প্রাচীন-পারসীক ভাষা পরস্পর ভগিনী-সম্পর্কে সম্পর্কিত।) 'আল্লা' শব্দটী আরবী ভাষায় 'অল্-ইলাহ্', অর্থাৎ 'পূজনীয়' হইতে—সংক্ষেপে 'আল্লাহ্', বাঙ্গালায় 'আল্লা'।

৩ মক্কা-মদীনা জিয়ারত—মক্কা-মদীনা দর্শন। 'জিয়ারৎ'—আরবী শব্দ, অর্থ, 'দর্শন করা', 'তীর্থযাত্রা করা'। মক্কা ও মদীনা আরব-দেশের পশ্চিমে Hijaz হিজাজ প্রদেশে অবস্থিত। এই দুইটী আরব দেশের প্রাচীন নগর। মক্কা নবী মোহম্মদের জন্মস্থান, এবং মদীনাতে তাঁহার মৃত্যু হয় ও সেখানে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান।

৪ নজফ কারবালা—মেসোপোতামিয়া বা ইরাক্ দেশে সুবিখ্যাত কুফা-নগরের সন্নিকটে নজফ্ শহর। নবী মোহম্মদের জামাতা, আরব সাম্রাজ্যের চতুর্থ খলীফা বা রাষ্ট্রনেতা আলী নজফে নিহত হন। তাঁহার হত্যাস্থানে একটী বিরাট মসজিদ স্থাপিত হইয়াছে। কারবালা বগ্দাদ শহরের দক্ষিণে, শহর হইতে ৫৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এইখানে খ্রীষ্টীয় ৬৮০ বর্ষে ১০ অক্টোবর তারিখে হজরৎ মোহম্মদের দৌহিত্র, আলীর পুত্র হোসেন, ওময়্যর-বংশীয় রাজা য়জীদ কর্তৃক প্রেরিত সেনাদলের দ্বারা আক্রান্ত ও সদলে নিহত হন। আলী ও তৎপুত্রদ্বয় হাসান ও হোসেন 'শি'আ' বা শিয়া-সম্প্রদায়ের মুসলমানদের নিকট বিশেষ-ভাবে সম্মানিত, সেই জন্য এই দুই স্থান বিশেষ করিয়া শিয়াদের তীর্থস্থান হইয়াছে।

৫ হজরত মোহম্মদ—'হজরৎ' শব্দ আরবী হইতে (আরবী 'হ, য, রৎ')—ইহার অর্থ, 'উপস্থিতি', তাহা হইতে 'মাননীয়', 'পূজনীয়'; এই অর্থে, অশেষ-সম্মান-ভাজন ব্যক্তির নামের পূর্বে এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৬ কা'বা—মক্কা নগরের প্রাচীন মন্দির—মুসলমান জগৎ এবং মুসলমান ধর্মের কেন্দ্র-স্থল।

৭ ইব্রাহীম নবী—ভাববাদী বা ঈশ্বরের বাণী-বাহী ইব্রাহীম। য়িহুদীদের পুরাণ Old Testament-এ এই নাম Abraham 'আব্রাহাম' রূপে আছে।

৮ কোর্‌বান্‌—দেবোদ্দেশে বলিদান। আরব ইতিকথা বা প্রাচীন কাহিনী অনুসারে, ইব্রাহীমের ভক্তির পরীক্ষার জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে নিজ পুত্র ইস্‌মাইলকে কোরবানী করিতে বা বলিদান দিতে আদেশ করেন। তাহাতে কোনও প্রশ্ন না করিয়া, ইব্রাহীম স্বীয় পুত্রের কোরবানীর ব্যবস্থা করেন। কোরবানীর সময়ে দেখেন, ঈশ্বরের দূত কোরবানীর জন্য একটী দুম্বা আনিয়াছেন। এই ব্যাপারের স্মারক হিসাবে 'বকর্‌-ঈদ' বা 'ঈদু-জ্‌-জোহা' পর্বের প্রতিষ্ঠা।

৯ মুসা, দাউদ, সোলয়্‌মান—য়িহুদীদের Old Testament-এ এই নাম কয়টী Mosheh 'মোশেহ্‌' (বা Moses মোসেস্‌), David (দাবীদ্‌) ও Solomon (সোলোমোন) রূপে মিলে।

১০ খলীফাগণ—নবী মোহম্মদের পরে, পর-পর যে কয়জন ব্যক্তি আরব জাতির নেতা বা পরিচালক হন, তাঁহাদের 'খলীফা' বলে। 'খলীফা' শব্দের মূল অর্থ successor বা 'অনুবর্তী'। মোহম্মদের পরে যে চারিজন খলীফা হন, তাঁহাদের নাম আবু-বকর, ওমর, ওসমান ও আলী। সুন্নী-সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ ইঁহাদের চারি-জনকেই স্বীকার করেন, ও শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু শিয়া-সম্প্রদায়ে কেবল আলীকেই স্বীকার করা হয়—আর তিনজনকে শিয়ারা 'খলীফা' বলিয়া মানেন না। (ভারতবর্ষে 'খলীফা' শব্দের অবনতি ঘটিয়াছে—কারীগর-শ্রেণীর লোককেও অনেক সময়ে 'খলীফা' বলে)।

১১ হজরতের রওজা মোবারক—'রওজা'—উদ্যান, সমাধিস্থান, এবং 'মোবারক' —'পবিত্র'।

১২ মোহম্মদ মোস্তাফা—'মোস্তাফা' শব্দ নবী মোহম্মদের বিরুদ বা প্রশস্তি রূপে ব্যবহৃত হয়—আরবী 'মুস্‌তফা' অর্থে 'নির্বাচিত, শ্রেষ্ঠ'।

১৩ এয়্‌ হজরত!—'এয়্‌' বা 'অয়্‌'—ফারসী সম্বোধন-বাচক অব্যয়—'হে, ওহে, ওগো'। অনুরূপ আরবী শব্দ—'য়া' বা 'ইয়া'।

১৪ পয়গম্বর্‌-এ-খোদা—ঈশ্বরের বাণী-বাহ। ফারসী 'পয়গম্‌—বাণী, 'আজ্ঞা' (প্রাচীন-পারসীক 'পতিগম', সংস্কৃত 'প্রতিগম')+'বর্‌' (—সংস্কৃত 'ভর')—বাহক।

১৫ হাজী—যিনি—'হজ্জ' বা মক্কা-মদীনা দর্শন করিয়া তীর্থ-যাত্রা পুরা করিয়াছেন।

১৬ শিয়া আলিমা-ওলামা—শিয়া সম্প্রদায়ের পণ্ডিতবর্গ। 'আলীম'—জ্ঞানী, 'উলমা'—আলিম-শব্দের বহুবচন।

১৭ শিথান—মাথার দিক্‌, বালিশ (শিরঃস্থান—শিরথান হইতে; তদ্রূপ, পদস্থান—পয়থান—পৈথান—পায়ের দিক্‌)।

১৮ কাজী—বিচারক (আরবী 'ক্বাদী' হইতে)।

১৯ মাতম্‌-গাহ—আরবী 'মা'তম্‌'=দুঃখ+ফারসী 'গাহ্‌'—স্থান; বিলাপস্থান, বিষাদস্থান।

২০ ফোরাত—ইরাক্‌ দেশের Euphrates 'এউফ্রাতেস' নদীর আরবী নাম (Tigris, প্রাচীন নাম Diklat- আরবী নাম Diglah বা Dijlah দিজ্‌লাহ্‌)।

২১ ইমাম হোসেন—নবী মোহম্মদের অন্যতম দৌহিত্র। ইঁহার শোচনীয় ইতিহাস মুসলমান জগতের মোহরম-পর্বে প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত হয়। 'ইমাম' অর্থে 'ধর্ম-নেতা'।

২২ শিমর—হোসেনের হত্যাকারী।

২৩ জামে' অল্‌ অজ্‌হার—আরবী 'জামে' বা 'জামি'—'বিরাট মস্‌জিদ্‌'; জামে' অল্‌-অজ্‌হার—Al-Azher অল্‌-অজ্‌হার-এর বিরাট মস্‌জিদ—কাইরো নগরের বিখ্যাত স্থান। এই মস্‌জিদকে আশ্রয় করিয়া মুসলমান-জগতের সর্ব-প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান।

২৪ লখ্‌নৌ—উত্তর ভারতের বিখ্যাত নগর—সাধারণতঃ বাঙ্গালায় 'লক্ষ্ণৌ' রূপে বানান করা হয়। হিন্দী বা হিন্দুস্থানী 'লখনউ', সংস্কৃত 'লক্ষ্মণাবতী'। লখ্‌নৌ শিয়াদের এক প্রধান কেন্দ্র।

২৫ হিক্‌মৎ—জ্ঞান, বিদ্যা, দর্শন-শাস্ত্র, বিজ্ঞান। (যাঁহার 'হিক্‌মৎ' আছে তিনি 'হকীম'—চিকিৎসক)।

২৬ ফজরের নমাজ—প্রাতঃকালের উপাসনা। ('নমাজ—namaz শব্দটি ফারসী, ইহা সংস্কৃত 'নমঃ' বা 'নমস' শব্দের-ই ইরানীয় প্রতিরূপ)।

২৭ কোর্‌'আন—মুসলমানদের প্রধান-ধর্মশাস্ত্র, নবী মোহম্মদের দ্বারা প্রচারিত হয়। মূল গ্রন্থ আরবী ভাষায় লিখা। ('কোর্‌'আন'—এই বানান দ্রষ্টব্য; সাধারণতঃ আমরা 'কোরান' বা 'কোরাণ' লিখিয়া থাকি; মূল শব্দটীর মধ্যে 'হামজা' নামে একটী অক্ষর আছে, সেইটীর যথাযথ উচ্চারণ দেখাইবার চেষ্টায় এই বানান—qur-'an 'কুর্‌ (বা কোর্‌)-আন্‌'।

রাণী ভবানী

[শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়]

ভারতবর্ষে ইদানীন্তন কালে যে সকল মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করিয়া এই পুণ্যভূমিকে ধন্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালার রাণী ভবানী ও মহারাষ্ট্রের রাণী অহল্যা বাঈয়ের নাম সর্বপ্রথম করিতে হয়। উভয়েই খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে উদ্ভূত হন, এবং উভয়ের জীবন-কথা অনেকটা এক ধরণের। পুণ্যশ্লোক রাণী ভবানী বিশেষ করিয়া যেন বঙ্গনারীর পালয়িত্রী ও কল্যাণময়ী মূর্তির জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন। তাঁহার পূত চরিত্র শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার লেখা হইতে তাহা আংশিক ভাবে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

উত্তর-বঙ্গের নাটোর-রাজ্যের রাজ্ঞী, অর্ধবঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানীর পুণ্য নাম বাঙ্গালার শোকান্ধকারময় যুগকে পরিপূর্ণ জ্যোতিতে আজিও আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ ও ষড়্‌যন্ত্রের যুগে রাণী ভবানী বাঙ্গালী বিধবা রমণী হইয়া প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল সগৌরবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে এই বঙ্গের প্রায় অর্ধেক ভূমি শাসন করিয়া গিয়াছেন। রাণী ভবানীর বার্ষিক আয় সেই সময়ে ১২ কোটী ৫০ লক্ষ ছিল, এবং তিনি স্বয়ং নবাব-রাজ্যের সরকারে ৭০ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতেন।

বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদ-কুলি খাঁর আমলে নাটোর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। রঘুনন্দন মৈত্রের নিজ কার্যদক্ষতা ও প্রভু-পরায়ণতার জন্য নবাবের বিশেষ প্রীতি-ভাজন হন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ রামজীবন নাটোর-বংশের স্থাপয়িতা। নবাবের কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ মহারাজ রামজীবন ও তাঁহার ভ্রাতার জমিদারী বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে সহসা মহারাজ রামজীবনের একমাত্র পুত্র মহারাজ-কুমার কালিকাপ্রসাদ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাহার পর কিছুকাল যাইতে না যাইতে রঘুনন্দন-ও দেহত্যাগ করিলেন। সহসা এই দুই ভীষণ শোকে মহারাজ রামজীবন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। সমস্যা হইল যে, তাঁহার মৃত্যুর পর বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হইবে। যদিও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুরামের পুত্র দেবকীপ্রসাদ বর্তমান ছিল, তথাপি তিনি দত্তক-পুত্র১ গ্রহণ করাই স্থির করিলেন, এবং রাজসাহী জেলার রসিকরায় খাঁ ভাদুড়ীর কনিষ্ঠ পুত্র রামকান্তকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। ইহাতে দেবকীপ্রসাদ অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন, এবং মনে-মনে নানারকম চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। মহারাজ রামজীবন তাঁহাকে ছয় আনা অংশ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দেববীপ্রসাদ তাহা গ্রহণ করেন নাই। মহারাজ রামজীবনের দত্তক-পুত্র এবং নাটোর-রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী রামকান্তই রাণী ভবানীর স্বামী।

১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছাতিম গ্রামে রাণী ভবানী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম চৌধুরী। তিনি একজন বিশিষ্ট জমিদার ছিলেন। রাণী ভবানীর যখন আট বৎসর মাত্র বয়স, তখন নাটোরের ভবিষ্যৎ মহারাজ রামকান্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বলা বাহুল্য, মহা সমারোহে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়।

রাণী ভবানী পিতৃ-গৃহে সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন ধারাপাতের অঙ্ক শিখিবার সময় তিনি হয়তো ভাবেন নাই যে, এক দিন তাঁহাকে কোটি-কোটি টাকার হিসাব নিজ হাতে দেখিতে হইবে। স্বামি-গৃহে আসিয়া রাণী ভবানীর শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়, এবং উচ্চ-শিক্ষিতা ব্রাহ্মণ-মহিলার সাহায্যে তিনি ধীরে-ধীরে সংস্কৃত ব্যাকরণ, পুরাণ, এবং সংস্কৃত রাজনীতি-গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। সেই সঙ্গে তিনি স্বামীর নিকট বাল্যকাল হইতেই জমিদারী-বিষয়ে শিক্ষা লইতেন। অতি অল্পকালের মধ্যে জমিদারী-বিষয়ে বালিকা বধু এতদূর পারদর্শী হইয়া উঠিলেন যে, প্রবীণ দেওয়ান দয়ারাম অনেক সময় নানা জটিল বিষয়ে রাজ-বধুর সিদ্ধান্ত শুনিয়া বিস্মিত হইয়া যাইতেন।

রামকান্তের বিবাহের বৎসর-ই মহারাজ রামজীবন পরলোক-গমন করেন। যুবক মহারাজ রামকান্ত প্রভুভক্ত বিচক্ষণ দেওয়ান দয়ারামের সাহায্যে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

দেবকীপ্রসাদ আপনাকে নাটোর-রাজ্যের ন্যায্য উত্তরাধিকারী ভাবিতেন, এবং তিনি সর্বদাই চেষ্টায় ছিলেন, কি উপায়ে মহারাজ রামকান্তকে রাজ্য-চ্যুত করা যায়। মহারাজ রামকান্তের নাটোর-রাজ্যের অধিকারী হওয়া যে অন্যায্য ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি নবাব মুর্শিদ-কুলি খাঁর মৃত্যুর পর নবাব শুজা খাঁ এবং শুজা খাঁর পরবর্তী নবাব সরফরাজ খাঁর দরবারে বহু চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

সরফরাজ খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে আলীবর্দী খাঁ যখন নূতন নবাব হইয়া আসিলেন, তখন দেবকী-প্রসাদের চক্রান্ত সফল হইল। দেবকীপ্রসাদ আলীবর্দী খাঁর সহিত

দেখা করিয়া জানাইলেন যে, তিনি-ই নাটোর-রাজ্যের ন্যায্য উত্তরাধিকারী, কারণ অপুত্রক মহারাজ রামজীবনের তিনিই একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র; রামকান্তকে শাস্ত্রবিধি-অনুযায়ী দত্তক-রূপে গ্রহণ করা হয় নাই। ইহা ব্যতীত, তাঁহাকে পুনরায় নাটোরের গদিতে বসানো হইলে, তিনি বর্তমান রাজস্বের দ্বিগুণ রাজস্ব দিতে পারিবেন। রামকান্ত গরীবের ছেলে, এত বড় জমিদারী শাসনের সে অযোগ্য। আলীবর্দী খাঁ তখন বাঙ্গালার অভ্যন্তরীণ গূঢ় রাজনীতি জানিতেন না, অথবা কোন ব্যক্তিকেই চিনিতেন না; তখন তাঁহার টাকার-ও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সেইজন্য তিনি দেবকীপ্রসাদকে সনদ্‌ দিয়া নাটোর পাঠাইলেন।

নবাবের সনদ পাইয়া বীর-দর্পে দেবকীপ্রসাদ নাটোরে প্রবেশ করিয়া, রামকান্ত ও তাঁহার স্ত্রী রাণী ভবানীকে নাটোরের রাজপ্রাসাদ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া, রামকান্ত স্ত্রীকে লইয়া মুর্শিদাবাদে ধন-কুবের জগৎশেঠের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ দেওয়ান দয়ারাম রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দীঘাপাতিয়ায় এক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া সেইখানে দিনপাত করিতেছিলেন। মহারাজ রামকান্তের দুর্গতির কথা শুনিয়া, তিনিও মুর্শিদাবাদে আসিলেন, এবং স্থির হইল যে, তিনি এবং জগৎশেঠ মহারাজ রামকান্ত ও রাণী ভবানীকে লইয়া রাজ-দরবারে যাইবেন। রাজ-দরবারে উপঢৌকন দিবার জন্য রাণী ভবানী তাঁহার সমস্ত বহুমূল্য অলঙ্কার জগৎশেঠের নিকট বাঁধা রাখিয়া টাকা গ্রহণ করিলেন। উপঢৌকন-সহ নবাব-সমীপে উপস্থিত হইয়া, দয়ারাম নূতন নবাবকে রাজশাহীর জমিদারীর প্রকৃত অবস্থা ও তাহার প্রকৃত স্বত্বাধিকারী কে, তাহা প্রমাণ-প্রয়োগের সহিত বুঝাইয়া দিলেন। নবাব আলীবর্দী খাঁ

নিজের ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া, নাটোর-রাজের খাতা-পত্র সমস্ত পরীক্ষা করিয়া, পুনরায় রামকান্তকেই নাটোরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নাটোরের প্রজারাও বাঁচিল, কারণ রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই দেবকী-প্রসাদ নানা-প্রকারের অনাচার ও অত্যাচারে সমস্ত রাজসাহী-অঞ্চল ভরিয়া তুলিয়াছিল।

রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির পর, রাণী ভবানীর পরামর্শ অনুসারে সর্বপ্রথম দেবকীপ্রসাদের আমলে প্রজাদের যে-সমস্ত সর্বনাশ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিকারের চেষ্টা হইল। প্রজাদের যে সমস্ত ঘর-বাড়ী জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, রাজকোষের অর্থে তাহা পুনর্নির্মিত হইল; খাজনা অনাদায়ের জন্য জমিদারী হইতে যাহাদিগকে নির্বাসিত করা হইয়াছিল তাহাদিগকে পুনরায় আহ্বান করিয়া আনা হইল। রাজ্যাভিষেকের দিন নাটোর, ক্রমাগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আত্মীয়-স্বজন ও বহু বরেণ্য ব্যক্তির আনন্দ-ধ্বনিতে আবার ভরিয়া উঠিল। প্রজারা বুঝিতে পারিল, রাজ-সিংহাসনের পাশে যিনি বসিয়া থাকেন, তিনি শুধু রাজমহিষী নন, তিনি লোক-মাতাও বটে[৩]।

সেই সময়ে বঙ্গে বর্গীর উৎপাত[৪] আরম্ভ হয়। সমগ্র বঙ্গদেশ এই বর্গীর আতঙ্কে চঞ্চল হইয়া উঠে। চারিদিকে অশান্তি দাবাগ্নিশিখার মত জ্বলিয়া উঠিল। বর্গীর হাঙ্গামার সুবিধা লইয়া ক্ষুদ্র জমিদারগণও বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে লাগিল। এই অরাজকতা ও রাষ্ট্র-বিপ্লবের মধ্যে অকস্মাৎ মহারাজ রামকান্ত ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক-গমন করিলেন। রাণী ভবানীর তখন মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়স। সমস্ত বিপদ মাথায় করিয়া, সেই মহাদুর্যোগের মধ্যে রাণী ভবানী শুদ্ধচারিণী হিন্দু-বিধবা হইয়াও বিপ্লব-বিক্ষুব্ধ অর্ধবঙ্গের শাসনের ভার লইলেন। এরূপ দক্ষতার সহিত তিনি রাজ্য-পরিচালনা করেন যে বর্গীর

হাঙ্গামার সময় স্বয়ং নবাব আলীবর্দী খাঁ স্বীয় পরিবারবর্গ নিরাপদে রাখিতে, নাটোরের নিকট রামপুর-বোয়ালিয়ায় তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দেন। বর্গীর উৎপাত হইতে তাঁহার জমিদারী রক্ষা করিবার জন্য রাণী ভবানী পশ্চিম হইতে আনীত লোকদের লইয়া একটি সৈন্য-বাহিনী সংগঠন করেন।

সেই বিরাট জমিদারী রাণী ভবানীর নখ-দর্পণে ছিল। তিনি শাসন-ব্যাপারে বিন্দু-মাত্র শৈথিল্য দেখিতে পারিতেন না। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরকাল তিনি এমন ভাবে সমস্ত জমিদারীর পরিচালনা করেন যে, এত বড় বর্গীর হাঙ্গামার পর, নবাব-সরকারে তাঁহার দেয় খাজনা কখন বাকি পড়ে নাই, অথচ প্রজারাও নিপীড়িত হয় নাই। একদিকে তিনি ছিলেন স্থির, ধীর শাসনকর্ত্রী; অপরদিকে তিনি ছিলেন একান্ত কোমলা বাঙ্গালীর মেয়ে—দানে যাঁহার আনন্দ, তপস্যার যাঁহার শান্তি, স্নেহে যাঁহার পরিসমাপ্তি।

রাণী ভবানীর এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ শৈশবেই পুত্রটি মারা যায়। কন্যাটির নাম তারাদেবী। খাজুরা-গ্রাম-নিবাসী রঘুনাথ লাহিড়ীর সহিত তারাদেবীর বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু বিবাহের পর-বৎসর-ই তারাদেবী বিধবা হন। রাণী ভবানী কন্যাকে জমিদারী-বিষয়ে সমস্ত শিক্ষা নিজ হস্তে দিয়াছিলেন, সেইজন্য সেই বিরাট রাজস্ব-পরিচালন-কার্যে তিনি বিধবা কন্যাকে তাঁহার প্রধান সহায়ক করিয়া লইয়াছিলেন।

বিধবা হইবার পর তিনি শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পালন করিয়া ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করেন। কুড়ি লক্ষ প্রজার শাসন-কার্যের অবসরে তিনি প্রতিদিন স্বীয় হস্তে হবিষ্যান্ন পাক করিতেন। রাত্রি চারি দণ্ডের সময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া, প্রাতঃস্নান ও পূজার পর "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা"

পাঠ করিয়া রাজপুরীর সকল মহিলাকে শুনাইতেন; তাহার পর রাজকার্যে মনোযোগ দিতেন। বিধবা হইবার পর তিনি ভূমিশয্যাতেই শয়ন করিতেন।

আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র বিলাসী সিরাজুদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হইলেন। আলীবর্দী খাঁর আমলে রাজ্যের যেটুকু অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল, সিরাজুদ্দৌলার আমলে তাহা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। নানাপ্রকারের অত্যাচারে বঙ্গদেশে তখন একটা মহা অশান্তির যুগ উপস্থিত হয়। রাণী ভবানী মুর্শিদাবাদে গঙ্গার ধারে বড়নগর রাজবাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে সিরাজের সৈন্য আসিয়া বড়নগর আক্রমণ করে। রাণী ভবানী তারাদেবীকে লইয়া খিড়কীর দ্বার দিয়া পলাইয়া, মন্তরাম বাবাজী নামক এক সন্ন্যাসীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সন্ন্যাসী পরে রাণী ভবানী ও তারাদেবীকে নির্বিঘ্নে নাটোরে পৌছাইয়া দেন।

সেই সময় সুদূর ইংলাণ্ড হইতে ঈস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানি নাম লইয়া যে-সমস্ত ইংরেজ ব্যবসায়ী ভারতের উপকূলে ব্যবসায় করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ক্লাইভ নামে একজন সৈনিক ভারতের চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া অন্তরে এক প্রবল বাসনা পোষণ করে যে, এই স্বর্ণপ্রসূ দেশে সে ইংলাণ্ডের রাজপতাকা উড়াইবে।

ক্লাইভ সিরাজুদ্দৌলাকে সিংহাসন-চ্যুত করিবার জন্য সেই সময়কার সমস্ত শক্তিশালী লোকদের সঙ্গে গোপনে ষড়্‌যন্ত্র করিতেছিলেন। মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের ঐতিহাসিক গৃহে অবশেষে বাঙ্গালার বিভিন্ন শক্তিশালী ব্যক্তিদের পরামর্শ-সভা বসিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা নন্দকুমার, রাজা রাজবল্লভ, সেনাপতি দুর্লভরাম, সেনাপতি মীর-জাফর সকলেই সেই সভায় যোগদান করেন। রাণী ভবানী চিকের আড়ালে

থাকিয়া সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ক্লাইভ রাজ্যলোভী মীর-জাফরকে বুঝাইয়া দিল, সে নিঃস্বার্থ কল্যাণের জন্য এই কার্যে নামিয়াছে, রাজ্যগ্রহণে তাহার কোন আসক্তি নাই। সভার সকলেই তাহা বিশ্বাস করিল। কিন্তু সেদিন চিকের আড়ালে থাকিয়া রাণী ভবানী সভার এই সিদ্ধান্তে প্রমাদ গণিয়াছিলেন। তিনি-ই একমাত্র সিরাজের বিরুদ্ধে ক্লাইভের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিতে সকলকে নিষেধ করেন। তাঁহার মতে সিরাজকে সিংহাসন-চ্যুত করিতে হইলে, অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁহারাই সে কার্য করিতে পারেন।

কিন্তু সেদিন রমণীর কথা কেহ গ্রাহ্য করিল না। তাহার ফলে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে জুন পলাশীর আম্রক্ষেত্রের আড়ালে হতভাগ্য সিরাজের ভাগ্যের সহিত ভারতের ভাগ্য-রবি চিরতরে অস্তাচলে গেল। ২৯শে জুন মাত্র সাত শত সৈন্য লইয়া বিজয়ী ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিলেন।

এইরূপে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের মারফৎ ইংরেজ জাতি বাজালা দেশের রাজা হইয়া বসিল। কিন্তু শীঘ্রই ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির কর্মচারীদের অসাধুতা ও ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার ফলে বাজালার শিল্প-বাণিজ্য মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছিল। রাণী ভবানীর রাজ্য তখন বাণিজ্য-শিল্পে বঙ্গের শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইংরেজ কুঠিয়ালগণও রাণীর রাজ্যে তাহাদের বাণিজ্যালয় স্থাপন করিতে লাগিল, এবং নানা ব্যাপারে রাণীর সহিত তাহাদের কলহ হইতে লাগিল। কিন্তু এই সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্যে স্থির ভাবে রাণী আপনার কার্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। দরিদ্রের সেবায় তিনি তাঁহার সমগ্র মন নিয়োজিত করিলেন। জলাভাব দূর করিবার জন্য উত্তর-বঙ্গের শত শত স্থানে রাণী ভবানী বৃহৎ পুষ্করিণী

খনন করাইলেন। প্রজাদের মধ্যে অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য বার্ষিক একলক্ষ টাকা সংস্কৃতশিক্ষা-প্রচারের জন্য ব্যয় করিতেন। কিন্তু ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগমনের সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি বুঝিলেন যে, আর কাহাকেও স্বাধীন ভাবে মাথা উঁচু করিয়া জমিদারী করিতে হইবে না।

১১৭৪ সালে বঙ্গদেশে এক ভীষণ অজন্মা হয়। তাহার ফলে ১১৭৬ সালে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা সমগ্র দেশকে শ্মশানে পরিণত করিয়া দিয়া যায়। ইহাই ইতিহাসে বিখ্যাত 'ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর' বলিয়া খ্যাত। এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপে পড়িয়া বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়।

গ্রামের পর গ্রামে শ্মশান-শিবার দিবা-চীৎকারে অকল্যাণের জয়-যাত্রা ঘোষিত হইত, ঘরে-ঘরে শুধু গলিত শবদেহ পড়িয়া থাকিত। এই ভয়াবহ মৃত্যু ও ত্রাসের মধ্যে রাণী ভবানীর মাতৃ-হৃদয় পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠে। আর্তরক্ষার জন্য তিনি সেদিন অন্নপূর্ণার মত-ই বাঙ্গালার দরিদ্র প্রজাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হন। তিনি গ্রামে-গ্রামে রাজবৈদ্য নিযুক্ত করিলেন, রাজকোষের অর্থে দীর্ঘকাল-স্থায়ী শত শত অন্নসত্র খোলা হইল। প্রজাদের দেয় খাজনা মাফ করিয়া দেওয়া হইল। এইরূপে সেদিন অন্নপূর্ণা-স্বরূপিণী সেই বৈধব্য-ব্রতচারিণী নারী, লক্ষ লক্ষ নর-নারীর জীবন-রক্ষা করেন।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই এপ্রিল ওয়ারেন হেস্টিংস্ ভারতের সর্বপ্রথম গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসেন।

ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ রাজস্বআদায়ের নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। চারিজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীকে লইয়া বিখ্যাত 'সার্কিট-কমিটি' (Circuit Committee)-র প্রতিষ্ঠা হয়। এই কমিটির কাজ হইল,

বাঙ্গালার জমিদারদের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া, সেই অনুযায়ী রাজস্ব নিরূপণ করা। যাহারা নির্ধারিত কর দিতে পারিবে না, তাহাদের জমিদারী বাজেয়াপ্ত[৯] হইবে, এবং নূতন জমিদার সৃষ্টি করা হইবে।

সার্কিট-কমিটি রাণী ভবানীর রাজ্যে গিয়া সেখানে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেন, ও বাহার-বন্দর নামক একটি সুবিস্তৃত ও বিশেষ লাভজনক জমিদারী রাণী ভবানীর জমিদারী হইতে বাহির করিয়া লইলেন। এই ভাবে রাণী ভবানী অধিকার-চ্যুত হইয়া আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন, এবং আপনার-দত্তক-পুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণের হাতে রাজ্য-ভার দিয়া, তিনি পুণ্যধাম কাশীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, রাণী ভবানী রাজশাহী জেলার আমরুল-পরগণার আটগ্রামের রায় বংশের রামকৃষ্ণ রায়কে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করেন।

কাশীতে গমন করিয়া, রাণী ভবানী অন্তরের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বিশ্বেশ্বরের[১০] করুণা গ্রহণ করিলেন। রাণী ভবানীর দানে ও স্নেহে মুক্তিদাত্রী কাশী এক নব-কলেবর ধারণ করিল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান-সমাপনান্তে তিনি একটি করিয়া প্রস্তর-নির্মিত বাটী কোন সাত্ত্বিক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিতেন। তিনি যে কয় বৎসর কাশীতে ছিলেন, কথিত আছে, প্রতিদিন-ই এইরূপে দান-কার্য করেন। তাই মনে হয়, কাশীতে প্রত্যেক শিলাখণ্ডে এই বাঙ্গালী রমণীর অন্তরের পরিচয় অক্ষয় হইয়া জাগিয়া আছে।

বাঙ্গালার অন্নপূর্ণা কাশীতে গিয়া কাশীর অন্নপূর্ণার[১০] মন্দির নির্মাণ করেন, এবং সেই মন্দিরের ব্যয় নির্বাহার্থ প্রচুর ভূ-সম্পত্তি দান করেন। কাশীর বর্তমান দুর্গাবাড়ী, তৎসংলগ্ন দুর্গাকুণ্ড নামক সরোবর, কাশীর গোপাল-মন্দির, তারামন্দির, দণ্ডিভোজন-ছত্র[১১], মহঃখু-সত্র, সমস্ত

রাণী ভবানীর স্মৃতি ইহা ব্যতীত, তিনি বহু দেবালয়, বহু অবতরণিকা[১২] কাশীতে ও বঙ্গদেশে নির্মাণ করাইয়া দেন। কাশীর পঞ্চক্রোশী-তীর্থের সমস্ত পথ[১৩] রাণী ভবানীর পুণ্যময় কীর্তি। পথের দুইধারে পুণ্যকাম যাত্রীদের সূর্য-কর হইতে রক্ষা করিবার জন্ম বৃক্ষবীথির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই-সমস্ত বৃক্ষ আজ আকাশে মাথা তুলিয়া উর্ধ্বলোকে সেই মহীয়সী নারীর নিকট তীর্থযাত্রীদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা পৌঁছাইয়া দিতেছে। বাঙ্গালীর অন্তরের সহিত কাশীর অন্তরকে তিনি এক অপূর্ব বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন[১৪]।

কিন্তু এ-ধারে রাজ্য-শাসনের ভার দিয়া যাঁহাকে তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন, ভগবান্ তাঁহাকে রাজ্য-শাসন করিবার জন্ম পাঠান নাই। মহারাজ রামকৃষ্ণ একজন সাধক পুরুষ ছিলেন। অন্তরে বাহিরে চিন্তায় ধ্যানে তিনি ছিলেন একজন পরম বৈরাগী[১৫]। রাজস্ব-অনাদায়ে একে-একে জমিদারী নীলামে[১৬] উঠিতে লাগিল। তাঁহার কর্মচারীরা নীলামে সেই সমস্ত জমিদারী কিনিয়া লইতে লাগিল, আর তিনি যেই শোনেন যে, একটি জমিদারী নীলামে উঠিতেছে, অমনি কালীর সম্মুখে আনন্দে ছাগবলি দিতে থাকেন, আর বলেন, "আঃ বাঁচিলাম, আর একটি বন্ধন খুলিয়া গেল।" সে এক অপরূপ দৃশ্য। জমিদারীর পর জমিদারী নীলামে উঠিতে থাকে, আর দেবীর পূজার ধুম তত-ই বাড়িয়া যায়। বাহিরের বন্ধন যতই খসিয়া যাইতে লাগিল, মহারাজ রামকৃষ্ণের অন্তরে ততই বৈরাগ্য প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল। রাণী ভবানী কাশী হইতে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া শুধু বলিলেন, "তুমি সূর্য-বংশের রাজাদের মত[১৭] হও—আর কিছু চাহি না।"

সর্বস্পৃহা-বিগত অর্ধবঙ্গেশ্বরী মুর্শিদাবাদে গঙ্গার ধারে বড়নগরে

পূজা-ধ্যানে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে মহারাজ রামকৃষ্ণ গঙ্গাজলে আবক্ষ নিমজ্জিত থাকিয়া, পুণ্যমন্ত্র জপ করিতে-করিতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। তারপর একদিন মহাকালের অমোঘ নিয়মে, নানা শোক-তাপ অম্লান-বদনে সহ্য করিয়া, অর্ধবঙ্গেশ্বরী ৭৯ বৎসর বয়সে পুণ্যতোয়া গঙ্গার পবিত্র জলধারার দিকে চাহিয়া জীবন-লীলা সাঙ্গ করেন। অর্ধবঙ্গের প্রজারা সেদিন সত্য-ই মাতৃহারা হয়॥

১ দত্তক-পুত্র গ্রহণ—অপরের পুত্রকে নিজের পুত্র-রূপে গ্রহণ। দত্তক-পুত্রের আর একটী নাম 'পোষ্য-পুত্র' ; ইংরেজীতে দত্তক-পুত্রকে adopted son বলে। হিন্দু সমাজে এই রীতি প্রচলিত আছে—অন্য সমাজেও আছে। একটী বিশেষ ধর্মানুষ্ঠান করিয়া, অপরের পুত্রকে দত্তক লওয়া হয়। একবার দত্তক গৃহীত হইলে সত্যকার পুত্রের মত সম্পত্তি প্রভৃতিতে তাহার সমস্ত অধিকার হয়।

২ সনদ—আরবী শব্দ, লিখিত প্রমাণ-পত্র বা অনুমতি, এই অর্থে ভারতে এই শব্দ প্রযুক্ত হয়। বাঙ্গালায় অনেক সময়ে 'সনন্দ'-রূপে লেখা হয় (সংস্কৃত 'ননন্দ' হইতে বাঙ্গালা 'ননদ'—এই পরিবর্তন ধরিয়া 'সনন্দ' বানান করিয়া, 'সনদ' শব্দটীকে যেন পূর্ণতর বা 'শুদ্ধ' রূপ দিবার চেষ্টা হইয়াছে)।

৩ বটে—'বট্' ধাতু, 'হয়' বা 'আছে' অর্থে, বাঙ্গালায় এখন অপ্রচল হইয়া পড়িতেছে। 'বটে' আজকাল কেবল সম্মতি-সূচক অব্যয়-রূপে ব্যবহৃত হয় ; ক্রিয়া-রূপে বর্তমান কালে উহার প্রয়োগ-ও আছে—'আমি বটি, তুমি বট, তুই বটিস, সে বটে, তিনি বটেন।' এখানে 'লোকমাতা-ও বটেন' বলিলে ভুল হইত না, পুরাতন বাঙ্গালার প্রয়োগের মতই হইত।

৪ বর্গীর উৎপাত—'ভোঁসলে'-পদবী-ধারী মারহাট্টা রাজা নাগপুর দখল করেন, তাহার পরে তাঁহার সেনা পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া উড়িষ্যা জয় করিয়া, অষ্টাদশ শতকের চতুর্থ দশকে বাঙ্গালা আক্রমণ করে। মারহাট্টা সেনাপতি আক্রান্ত দেশের রাজার নিকট 'চৌথ' বা রাজস্বের চারভাগের এক ভাগ চাহিত, সেই টাকা পাইলে তাহারা চলিয়া যাইত ; কিন্তু মারহাট্টা সৈনিকেরা যতদিন দেশে থাকিত, লুঠ-তরাজ করিয়া ও প্রজার

উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া রাজ্য-নাশ করিত। এই সব লুঠেরা বিদেশী সৈন্যের হাত হইতে প্রজাকে বাঁচাইবার জন্য অনেক সময়ে দেশের শাসকবর্গ টাকা দিয়া দিতেন। বাঙ্গালা-দেশে আলীবর্দী খাঁ ইহাদের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু তিনি ইহাদিগকে রোধ করিতে সমর্থ হন নাই। মারহাট্টা সৈনিকদিগকে 'বার্‌গীর' বলিত (এটী ফারসী শব্দ—অর্থ, 'ভারবাহী', যাহারা নিজের অস্ত্র-শস্ত্র খোরাক লুঠের মাল সব বহিয়া বেড়ায়)। বাঙ্গালা দেশে এই শব্দ 'বর্গী' রূপ ধারণ করে। 'বর্গীর হাঙ্গামা' ও 'বর্গী'র অত্যাচার'-এর কথা পশ্চিম-বঙ্গের প্রজাদের এখনও মনে আছে।

৫ পশ্চিম হইতে আনীত লোকদের সৈন্য-বাহিনী—সংযুক্ত-প্রদেশ ও বিহারের ভোজপুরিয়া-ভাষী ব্রাহ্মণ ছত্রী ও অন্য জাতির লোকেরা দৃঢ়কায়, সাহসী, দুর্ধর্ষ ও বিশেষ প্রভুভক্ত বলিয়া, বাঙ্গালা দেশে বহুকাল হইতে দেহরক্ষী, দ্বারবান্ ও সৈনিকের কাজের জন্য নিযুক্ত হইয়া আসিতেছে। কলিকাতার ও বাঙ্গালা দেশের দরোয়ান, লাঠিয়াল ও পাহারাওয়ালা অধিকাংশ এখনও এই শ্রেণীর লোক।

৬ হবিষ্যান্ন—নিরামিষ আতপ চাউলের ভাত ও তৎসঙ্গে দা'ল সিদ্ধ, কাঁচকলা সিদ্ধ প্রভৃতি সিদ্ধ-তরকারী এবং ঘৃত-মিশ্রিত আহার (হবিঃ বা হবিষ্—ঘৃত ; হবিষ্য—ঘৃতময় + অন্ন)।

৭ রাত্রি চারি দণ্ড—২৪ মিনিটে এক দণ্ড, আড়াই দণ্ডে এক ঘণ্টা ; রাত্রি প্রভাত হইতে যখন চারি দণ্ড অর্থাৎ প্রায় দেড়-ঘণ্টা পৌনে-দুই ঘণ্টা বাকী।

৮ কুঠিয়াল—ইংরাজেরা এ দেশে প্রথম বাণিজ্য করিতে আসে। এ দেশের পণ্য (উহার মধ্যে তাঁতে বোনা রকমারি কাপড় ছিল প্রধান) বিলাতে রপ্তানী করিবার জন্য ক্রয় করিয়া এক-একটী বাড়ীতে জমা করিত, সেই-সব বাড়ীকে factory বা 'কুঠী' বলিত। কুঠিয়াল ইংরেজ—ব্যবসায়ী ইংরেজ।

৯ বাজেয়াপ্ত—ফারসী 'বাজ্' (প্রাচীন-পারসীক 'অবাজ', 'অপাশ্', সংস্কৃত 'অপাক্') = পুনরায় + ফারসী 'য়াফ্‌ৎ' (= প্রাচীন-পারসীক ও সংস্কৃত 'আ + আপ্ত') = প্রাপ্ত—যে সম্পত্তি বা বস্তু পুনরায় রাজ-সরকারে গৃহীত হয়।

১০ বিশ্বেশ্বর—কাশীতে মহাদেব এই নামে পূজিত হন। সেখানে যে দেবী আছেন, তাঁহার নাম 'অন্নপূর্ণা'।

১১ দণ্ডি-ভোজন-ছত্র—'দণ্ডী'—এক সম্প্রদায়ের শৈব সন্ন্যাসী, ইঁহারা গেরুয়া

পরেন ও হাতে গেরুয়া-কাপড়-জড়ানো ছোট দণ্ড ধারণ করেন—কাশীতে এইরূপ দণ্ডী অনেক বাস করেন। 'ছত্র'—যেখানে বিদ্যার্থী, সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুককে আহার্য দান করা হয় ; শব্দটী সংস্কৃত 'সত্র' শব্দের বিকারে জাত।

১২ অবতরণিকা—সিঁড়ি।

১৩ কাশীর পঞ্চক্রোশী-তীর্থ—কাশী নগরের চারিদিকে পাঁচ ক্রোশ ধরিয়া পথ অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি তীর্থস্থান আছে। যাত্রীরা এই পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বা গাড়ীতে করিয়া গিয়া সেই সমস্ত তীর্থ দর্শন করে। তাহাদের জন্য পাকা রাস্তা রাণী ভবানী করিয়া দিয়াছিলেন।

১৪ কাশীর সহিত বাঙ্গালীর এক বিশেষ মানসিক ও আধ্যাত্মিক যোগ আছে, বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনে, বাঙ্গালার বাহিরে হইলেও, কাশী অনেকখানি স্থান আছে—অনেকটা রাণী ভবানীর জন্যই তাহা ঘটিয়াছে।

১৫ বৈরাগী—যিনি সংসার-বিষয়ে বীতরাগ।

১৬ নীলাম—পোর্তুগীজ শব্দ leilaom হইতে।

১৭ পুরাণ-বর্ণিত সূর্য-বংশের রাজারা ত্যাগী ও বিষয়-নিস্পৃহ ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

[শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার]

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২) আধুনিক ভারতের একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। ইনি তীব্র স্বজাতিপ্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, এবং স্বীয় গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করিয়া ভারতের বিশিষ্ট ধর্ম ও সংস্কৃতির বাণী আধুনিক জগতে প্রচার করিবার জন্য আমেরিকা যাত্রা করেন। পরে ইউরোপেও এই বাণী প্রচার করিতে গমন করেন। তদনন্তর দেশে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতার নিকটবর্তী বেলুড়-গ্রামে 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামক সন্ন্যাস-সঙ্ঘ স্থাপিত করেন এবং এই সঙ্ঘের মারফৎ দেশের 'দরিদ্র-নারায়ণ'-এর সেবায় অবহিত হন। উদার-হৃদয় বিবেকানন্দ, ভারতের জনগণের দুঃখ ও অজ্ঞান দূর করিবার কার্যে আত্মনিয়োজিত

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করিবার চেষ্টা করেন, এবং বেলুড়-মঠের সংস্থাপন দ্বারা সেই কার্য আরম্ভ করেন।

বিখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত বিবেকানন্দ-জীবনী এই মহাপুরুষের সম্বন্ধে এক প্রামাণিক এবং অনুভবময় গ্রন্থ। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রে চিকাগো নগরে আহূত এক আন্তর্জাতিক সর্ব-ধর্ম-বিচার-সভায় হিন্দু-ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া জগৎ-সমক্ষে ভারতের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতার ঘোষণা করেন, সঙ্গে-সঙ্গে নিজেও জনসমাজে বিখ্যাত হন। নিম্নোদ্ধৃত অংশে সেই ধর্ম-সভায় বিবেকানন্দের কৃতিত্বের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

বোস্টনে গ্রীক-ভাষার প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জে·এইচ্ রাইট্ মহোদয়ের সহিত স্বামীজীর পরিচয় হয়। ইনি কিয়ৎকাল কথোপকথনের পর স্বামীজীর উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বলিলেন, "আপনি চিকাগো মহাসভায় হিন্দু-ধর্মের প্রতিনিধি-স্বরূপে গমন করুন, তাহা হইলে বেদান্ত-প্রচার১ কার্যে অধিকতর সাহায্য লাভ করিবেন।" তদুত্তরে স্বামীজী তাঁহার চিরাভ্যস্ত সরলতার সহিত প্রকৃত অসুবিধা-গুলি খুলিয়া বলিলেন। অধ্যাপক আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—"To ask you, Swami, for your credentials, is asking the Sun to state its right to shine"। রাইট্-সাহেব তৎক্ষণাৎ উক্ত মহাসভা-সংশ্লিষ্ট তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত বনি সাহেবকে একখানি পত্র লিখিয়া স্বামীজীর হস্তে প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে অন্যান্য কথার সহিত এই কয়েকটী কথাও লেখা ছিল যে—"দেখিলাম, এই অজ্ঞাত-নামা হিন্দু সন্ন্যাসী আমাদের সকল পণ্ডিতকে একত্র করিলে যাহা হয়, তদপেক্ষাও অধিক পণ্ডিত।" এই পত্রখানি, এবং অধ্যাপক-প্রদত্ত একখানি রেলওয়ে-টিকিট লইয়া স্বামীজী পুনরায় চিকাগো অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চিকাগোয় নিঃস্ব অবস্থায় অপূর্ব আশ্রয় লাভ

স্বামীজী যে উৎসাহ যে আনন্দ লইয়া বোস্টন হইতে রওনা হইয়াছিলেন, চিকাগো রেলওয়ে স্টেশনে অবতীর্ণ হইবা-মাত্র তাহা অন্তর্হিত হইল। এই বিরাট শহরে তিনি কেমন করিয়া ডাক্তার ব্যারোজ্‌ সাহেবের আপিস খুঁজিয়া বাহির করিবেন? পথিমধ্যে দুই চারিজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন বটে, কিন্তু তাহারা স্বামীজীকে নিগ্রো২ মনে করিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। এমন কি, রাত্রিতে থাকিবার স্থানের আশায় একটী হোটেলের সন্ধান লইতে গিয়াও তিনি বিফল-কাম হইলেন। অবশেষে কোনো স্থানে আশ্রয় না পাইয়া রেলওয়ে মাল-গুদামের সম্মুখে পতিত একটি প্রকাণ্ড 'প্যাকিং-কেস'-এর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাহিরে তখন তুষার-পাত আরম্ভ হইয়াছিল। শীতের প্রখর বায়ুর তীব্র স্পর্শ—পাকিং-কেস্‌-এর মধ্যে ঘনীভূত অন্ধকার। দুঃসহ শীতের হস্ত হইতে দেহ রক্ষা করিবার মত সামান্য একখানি শীতবস্ত্রও তাঁহার নাই। অসীম উৎকণ্ঠায় রজনী অতিবাহিত করিয়া, প্রভাতে আশা ও উদ্যমে বুক বাঁধিয়া রাজপথে বহির্গত হইলেন। সমস্ত রাত্রি অনাহারে যাপন করায়, প্রবল ক্ষুধার তাড়নায় তাঁহার সর্ব-শরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল—তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না। অনন্যোপায় হইয়া কিঞ্চিৎ খাদ্য-দ্রব্যের আশায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মলিন জীর্ণ বসন ও যাতনা-ক্লিষ্ট মুখ-মণ্ডল দেখিয়া কাহারও করুণার উদ্রেক হইল না। কেহ ভৎ'সনা করিল, কেহ দ্বারদেশ হইতে দূর করিবার জন্য বল-প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইল; কেহ প্রবল উপেক্ষা-মিশ্রিত ঘৃণায় দ্বার রুদ্ধ করিল। শ্রান্ত, ক্লান্তিজড়িত অবসন্ন দেহে

বিবেকানন্দ রাজপথ-পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন ; প্রশান্তচিত্তে পূর্ণ নির্ভরতা লইয়া শ্রীগুরু-স্মরণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার পুরোভাগে অবস্থিত সুবৃহৎ প্রাসাদের দ্বার উন্মুক্ত হইল। এক অপূর্ব-সুন্দরী রমণী ধীরে-ধীরে আসিয়া স্বামীজীকে মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি কি ধর্ম-মহাসভার একজন প্রতিনিধি?" স্বামীজী বিস্ময়াপ্লুত কণ্ঠে সংক্ষেপে স্বীয় দুরবস্থার কথা বলিলেন, এবং বলিলেন যে তিনি ব্যারোজ্ সাহেবের আপিসের ঠিকানা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। দয়ার্দ্রহৃদয়া মহিলা স্বামীজীকে স্বালয়ে আহ্বান করিয়া ভৃত্যবর্গকে তাঁহার সেবার জন্য আদেশ করিলেন। প্রাতর্ভোজন সমাপ্ত হইলে, তিনি স্বয়ং স্বামীজীকে ধর্মসভায় লইয়া যাইবেন বলিলেন।

ঔপন্যাসিকের শ্রেষ্ঠতম কল্পনার ন্যায় অভাবনীয় ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া স্বামী বিবেকানন্দের প্রবাস-জীবনের আর এক অধ্যায় সমাপ্ত হইল। ভগবান্ এইরূপে দুঃখের কষ্টি-পাথরে৩ করিয়া মহাপুরুষদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এই সহৃদয়া মহিলার নাম মিসেস্ জর্জ ডাব্লিউ হেল। অযাচিত-ভাবে ইনি স্বামীজীর মাতৃস্থানীয়া হইয়া, তাঁহাকে প্রচার-কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, স্বামীজী বিশ্রামান্তে তাঁহার সহিত গিয়া ধর্ম-মহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে পরিগৃহীত হইলেন, এবং প্রতিনিধি-বর্গের জন্য নির্দিষ্ট বাটীতে অতিথিরূপে বাস করিতে লাগিলেন।

চিকাগো ধর্ম-সভা—স্বামীজীর বর্ণনা

ধর্ম-সভার প্রথম অধিবেশনের বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া স্বামীজী স্বয়ং জনৈক শিষ্যকে লিখিয়াছেন :— "মহাসভা খুলিবার দি[ন] আমরা সকলে 'শিল্প-প্রাসাদ'* নামক বাটীতে সমবেত হইলাম,

সেখানে মহাসভার অধিবেশনের জন্য একটী বৃহৎ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থায়ী হল নির্মিত হইয়াছিল। এখানে সর্ব-জাতীয় লোক সমবেত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিলেন ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বোম্বাইয়ের নগরকার; বীরচাঁদ গান্ধী জৈন সমাজের প্রতিনিধি-রূপে, এবং আনি বেসাণ্ট ও চক্রবর্ত্তী থিওসফির প্রতিনিধি-রূপে আসিয়াছিলেন। মজুমদারের সহিত আমার পূর্ব-পরিচয় ছিল, আর চক্রবর্ত্তী আমার নাম জানিতেন। বাসা হইতে 'শিল্প-প্রাসাদ' পর্যন্ত খুব ধুম-ধামের সহিত যাওয়া হইল, এবং আমাদের সকলকেই প্লাটফর্মের উপর শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে বসানো হইল। কল্পনা করিয়া দেখ, নীচে একটী হল, তাহার পর প্রকাণ্ড গ্যালারী, তাহাতে আমেরিকার বাছা-বাছা ছয়-সাত হাজার সুশিক্ষিত নর-নারী ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া উপবিষ্ট, আর প্লাটফর্মের উপর পৃথিবীর সর্ব-জাতীয় পণ্ডিতের সমাবেশ। আর আমি, যে জন্মাবচ্ছিন্নে কখনো সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই, সে এই মহাসভায় বক্তৃতা করিবে! সঙ্গীতাদি, বক্তৃতা প্রভৃতি নিয়মিত রীতি-পূর্বক ধুম-ধামের সহিত সভা আরম্ভ হইল। তখন একজন একজন করিয়া প্রতিনিধিকে সভার সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল; তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু-কিছু বলিলেন। অবশ্য আমার বুক দুড়-দুড় করিতেছিল ও জিহ্বা শুষ্ক-প্রায় হইয়াছিল। আমি এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলাম যে পূর্বাহ্নে বক্তৃতা করিতে ভরসা করিলাম না। মজুমদার বেশ বলিলেন, চক্রবর্ত্তী আরো সুন্দর বলিলেন। খুব করতালি-ধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি নির্বোধ, আমি কিছুই প্রস্তুত করি নাই। আমি দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। ব্যারোজ মহোদয় আমার পরিচয়

করিয়া দিলেন। আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃবর্গের চিত্ত কিছু আকৃষ্ট হইয়াছিল।

"আমি আমেরিকা-বাসীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া ও আরও দুই-এক কথা বলিয়া, একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলাম। যখন আমি 'আমেরিকা-বাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ' বলিয়া সভাতে সম্বোধন করিলাম, তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালি-ধ্বনি হইতে লাগিল যে, কান যেন কালা করিয়া দেয়। তারপর আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম। যখন আমার বলা শেষ হইল, আমি তখন হৃদয়ের আবেগেই একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। পরদিন সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল—আমার বক্তৃতাই সেইদিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছে; সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল। সেই টীকাকার শ্রীধর-স্বামী[1] সত্যই বলিয়াছেন 'মূকং করোতি বাচালং'—হে ভগবান্, তুমি বোবাকেও মহাবক্তা করিয়া তোল। তাঁহার নাম জয়-যুক্ত হউক! সেইদিন হইতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম। আর যেদিন হিন্দুধর্ম-সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা পাঠ করিলাম সেই দিন হলে এত লোক হইয়াছিল যে আর কোনদিন সেইরূপ হয় নাই।"

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর জগতের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিবস। প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি-গণ একত্র সম্মিলিত—এই বিরাট সভায় সহস্র-সহস্র উন্মুখ নরনারীর সম্মুখে, স্বার অদ্বিতীয় আশীর্বাণী উচ্চারণ করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ দণ্ডায়মান হইলেন।

সার্বজনীন ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার-কল্পে অনুষ্ঠিত মহাসভায় পূর্ববর্তী বক্তৃগণ চিরাচরিত রীতির অনুসরণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে সম্বোধন করিয়াছিলেন; কিন্তু বিশ্বমানবের মিলন-মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া, "পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের মুখপাত্র" বিবেকানন্দই প্রথম মহতী সভাকে "ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে উত্থিত এই অকপট আহ্বান, নিখিল হৃদয়ের গোপন প্রীতি-উৎসের মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া দিল।

তাই ভ্রাতৃ-সম্বোধনে প্রীতি-উৎফুল্ল বিশ্ব ঊর্ধ্বগ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, আগতপ্রায় বিংশ শতাব্দীর নবযুগের প্রারম্ভেই, সমস্ত প্রকার ধর্ম-দ্বন্দ্ব, স্বাধীনতার নামে ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচার, জাতীয়তার নামে পরস্ব-লোলুপতা, ধর্মের নামে পরধর্মের প্রতি অযথা আক্রমণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রত্যেকেরই জাতিগত, ধর্মগত, সমাজগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া, পরস্পরের সহিত ভাব-বিনিময় করিতে হইবে; ঈর্ষ্যা, সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া, স্ব স্ব সামর্থ্যানুযায়ী অপরকে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সাহায্য করিতে হইবে।

শ্রীমতী আনি বেসান্টের বর্ণনা

থিওসফিস্ট সম্প্রদায়ের নেত্রী শ্রীমতী আনি বেসান্ট ১৯১৪ সালের মার্চ মাসের "ব্রহ্মবাদিন্" পত্রিকায় এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন—"মহিমময় মূর্তি, গৈরিক-বসন-ভূষিত, চিকাগো শহরের ধূলি-মলিন ধূসর বক্ষে ভারতীয় সূর্যের মত ভাস্বর, উন্নত-শির, মর্মভেদী-দৃষ্টি-পূর্ণ চক্ষু, চঞ্চল ওষ্ঠাধর, মনোহর অঙ্গ-ভঙ্গী—ধর্ম-মহাসভায় প্রতিনিধি-গণের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ আমার দৃষ্টিপথে প্রথম এই রূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। তিনি সন্ন্যাসী বলিয়া খ্যাত—কিন্তু তাহা

সমর্থনীয় নহে—কারণ প্রথম দৃষ্টিতে তিনি সন্ন্যাসী অপেক্ষা যোদ্ধা বলিয়াই অনুমিত হইতেন, এবং তিনি প্রকৃত-ই একজন যোদ্ধা সন্ন্যাসী ছিলেন। এই ভারত-গৌরব, জাতির মুখোজ্জ্বলকারী, সর্বাপেক্ষা পুরাতন ধর্মের প্রতিনিধি, উপস্থিত অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও, প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠতম সত্যের জীবন্ত ঘন-বিগ্রহ স্বরূপ স্বামীজী, অন্যান্য কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। দ্রুত-উন্নতিশীল উদ্ধত পাশ্চাত্ত্য জগতে ভারতমাতা তাঁহার যোগ্যতম সন্তানকে দৌত্যে নিযুক্ত করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। এই দূত তাঁহার পুণ্য জন্মভূমির গৌরবকাহিনী বিস্মৃত না হইয়া, ভারতের বার্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন। শক্তিমান্, দৃঢ়সঙ্কল্প, পুরুষকারসম্পন্ন স্বামীজীর স্বমত সমর্থন করিবার পক্ষে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল।

"অপর দৃশ্য আরম্ভ হইল—স্বামীজী সভামঞ্চে দণ্ডায়মান হইলেন। অপরাপর শক্তিমান্ প্রতিভাসম্পন্ন প্রতিনিধিগণ যদিও তাঁহাদের বার্তা সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—কিন্তু এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাচ্য প্রচারকের অতুলনীয় আধ্যাত্মিক বার্তার মহিমার সম্মুখে সেগুলি অবনত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। তাঁহার কণ্ঠোত্থিত প্রত্যেক ঝঙ্কারময় শব্দটি, আগ্রহান্বিত মন্ত্রমুগ্ধবৎ বিপুল জনসঙ্ঘের মানসপটে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।"

অবশেষে ২৭শে সেপ্টেম্বর ধর্মসভার শেষ অধিবেশনে, যুগ-ধর্ম-প্রবর্তক আচার্য পৃথিবীর সুসভ্য জাতিসমূহের নিকট বজ্র-রবে ঘোষণা করিলেন, "যাঁহারা এই সভার কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিয়াও, কোন ধর্মবিশেষ-ই কালে জগতের একমাত্র ধর্ম হইয়া যাইবে, অথবা কোন বিশেষ ধর্মই ঈশ্বর-লাভের একমাত্র পন্থা এবং অন্যান্য ধর্মগুলি ভ্রান্ত—এইরূপ ভাব অন্তরে পোষণ করিবেন, তাঁহারা বাস্তবিকই করুণার পাত্র।" স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সমন্বয়ের বার্তা ঘোষণা

করিয়া, তিনি ভবিষ্যতের সার্বভৌমিক আদর্শ সম্বন্ধে বলিলেন,—"প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ধর্ম, অন্য জাতি বা অন্য ধর্মের সহিত পরস্পর ভাব-বিনিময় করিবে—অথচ প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবে; আর প্রত্যেকেই পরস্পর অন্তর্নিহিত শক্তির অনুপাতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। আজ হইতে সমস্ত ধর্মের পতাকায় লিখিয়া দাও,—"যুদ্ধ নহে—সাহায্য; ধ্বংস নহে—আত্মস্থ করিয়া লওয়া; ভেদ-দ্বন্দ্ব নহে—সামঞ্জস্য ও শান্তি।"

১ বেদান্ত-প্রচার—বেদের অংশ-বিশেষ, উপনিষদ্, বেদান্ত-সূত্র ও মহাভারতান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে নির্ণীত দার্শনিক মত-বাদ। আধুনিক জগতে সর্বজাতির মানবের মধ্যে এই মতবাদের বিষয়ে উপদেশ দেওয়া।

২ নিগ্রো—আমেরিকা-মহাদেশে (বিশেষ করিয়া উত্তর-আমেরিকায়) ইউরোপ হইতে আগত ঔপনিবেশিকগণ কঠিন শ্রম হইতে আপনাদিগকে অব্যাহতি দিবার জন্য পশ্চিম-আফ্রিকা হইতে নিগ্রো বা কাফরি ক্রীতদাস ক্রয় করিয়া বা ধরিয়া জাহাজে করিয়া আমেরিকায় আনিত। এই-সব কৃষ্ণত্বক্ ক্রীতদাসের ক্রয়-বিক্রয় চলিত, এবং শ্বেতাঙ্গদের নিকটে ইহারা অত্যন্ত হেয় হইয়া থাকিত। ১৮৬০ সালের পরে আমেরিকার সংযুক্ত রাষ্ট্রে ইহাদিগকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানগণ এখনও নিগ্রোদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে—এক সঙ্গে অবস্থান, চলা-বলা, পান-ভোজন প্রভৃতি কিছুতেই করে না।

৩ কষ্টি পাথর—এক প্রকার কাল রঙের পাথর, ইহাতে সোনা ঘষিয়া সোনার বিশুদ্ধি নির্ণয় করা হয়। সংস্কৃত 'কর্ষ-পট্টিকা'—তাহা হইতে 'কস্‌সবট্টিআ'; বাঙ্গালা 'কষট্টি, কষ্টি', হিন্দী 'কসৌটি'।

৪ শিল্প-প্রাসাদ—Palace of Art নামে একটি ইমারত, এইখানেই চিকাগো শহরে আন্তর্জাতিক ধর্ম-সভার অনুষ্ঠান হয়।

৫ থিওসফি—Theosophy—গ্রীক শব্দ theosophia (অর্থ—'ব্রহ্মজ্ঞান') হইতে। আধুনিক জগতে কতকগুলি mystic বা রহস্যবাদী ইউরোপীয়—ইহাদের মধ্যে রুশ দেশীয়া Madam Blavatsky শ্রীযুক্তা ব্লাভাৎস্কি ও ইংরেজ Colonel

Olcott কর্ণেল অল্‌কট্‌ ছিলেন প্রধান—এই মতবাদ প্রচার করেন। ইঁহারা জগতের অন্তর্নিহিত পারমার্থিক সত্যের সহিত মানব-জীবনের প্রত্যক্ষ সংযোগে বিশ্বাস করেন, এবং ধ্যানধারণা প্রভৃতির দ্বারা ও যোগ-অনুষ্ঠানের দ্বারা মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎকার সাধনে চেষ্টা করেন। এইরূপ যোগ-সাধন দ্বারা ইহ-জগতে মানুষ বিভূতি অর্থাৎ অতি-প্রাকৃত শক্তি লাভ করিতে পারে। সমস্ত ধর্মকে ইঁহারা ঈশ্বর-লাভের বিভিন্ন পথ বলিয়া বিশ্বাস করেন, সমস্ত ধর্মের আধ্যাত্মিক চিন্তা ও সাধনা ইঁহারা শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করেন; হিন্দু দর্শন ও চিন্তাই হইতেছে ইঁহাদের মত-বাদের প্রধান ভিত্তি। ভারতবর্ষে শ্রীযুক্তা আনি বেসান্ট (১৮৪৭-১৯৩৩) থিওসফি মতের একজন প্রধান পরিপোষক ছিলেন। শ্রীযুক্তা বেসান্ট ভারত ও ভারতের ধর্মকে মনে-প্রাণে ভালবাসিতেন এবং তাঁহার নিকট হিন্দু দর্শন ও থিওসফি প্রায় অভিন্ন ছিল। ভারতের জনহিতকর কার্যে, ভারতে শিক্ষা-বিস্তারে ও ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে শ্রীযুক্তা বেসান্ট আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

৬ আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ—অন্যান্য বক্তারা 'ভদ্র-মহিলা ও ভদ্র-মহোদয়গণ' (Ladies and gentlemen) প্রভৃতি মামুলী সম্বোধন দ্বারা নিজ-নিজ বক্তৃতা আরম্ভ করেন। কিন্তু স্বামীজী Sisters and Brothers of America বলিয়া শ্রোতৃবর্গকে সম্বোধন করায়, তাঁহার এই সম্বোধনের (সেই সভার পক্ষে) অভিনবত্বে ও তাহার আন্তরিকতায় সকলেই অত্যন্ত খুশী হইয়াছিলেন। স্বামীজীর এই বক্তৃতা ও ইহার পরের বক্তৃতাগুলি প্রত্যেক ভারতীয়ের নিকট বিশেষ গৌরব-বোধের সহিত পাঠ্য হওয়া উচিত—মূল ইংরেজী বক্তৃতা ও বঙ্গানুবাদ সহজ-লভ্য।

৭ শ্রীধরস্বামী—গীতা ও ভাগবত-পুরাণের অতি সুন্দর ও সহজবোধ্য টীকা ইনি লিখিয়া গিয়াছেন। গুজরাট-প্রদেশে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার কৃত গীতার টীকার মঙ্গলাচরণে 'মূকং করোতি বাচালম্' প্রভৃতি ইঁহার রচিত বিখ্যাত শ্লোক আছে (পৃঃ ৮৩, ৬ সংখ্যক টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)।

আশুতোষ

[শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়]

রায় বাহাদুর ডাক্তার ৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তৎপ্রণীত আশুতোষের জীবনীতে এই সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর চরিত্র-আলোচনা প্রকাশ করেন। এই আলোচনা, আশুতোষের ব্যক্তিত্বের মহিমা প্রণিধানের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৩) বাঙ্গালা দেশে তথা ভারতবর্ষে উচ্চ শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে যতটা কার্য করিয়াছিলেন, এমন আর কেহ করেন নাই। শিক্ষাব্রত আশুতোষ একাধারে যেমন পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ ব্যবহারবিৎ ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে তিনি ছিলেন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন কর্মী এবং নেতা। তাঁহার কার্যক্ষেত্র মুখ্যতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অবলম্বন করিয়া ছিল। বাঙ্গালীর চিন্তা ও জীবন-স্রোত নিয়ন্তাদের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ছিলেন।

আশুতোষের সুযোগ্য পুত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাধ্যক্ষ ও অধুনাতন স্নাতকোত্তর-শিক্ষাবিভাগের মুখ্যাধিষ্ঠাতা, ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেব-সম্বন্ধে Representative Indians নামক পুস্তকে ইংরেজীতে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। স্বর্গীয় দীনেশ-বাবু এই প্রবন্ধের-ই বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া তাঁহার পুস্তকে প্রকাশিত করেন। প্রবন্ধটি হইতে কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আশুতোষের চরিত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল, সেগুলির উল্লেখ না করিলে তাঁহার চরিত-কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তিনি অতিশয় অনাড়ম্বর ভাবে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতেন। একখানি অতি সাধারণ ধুতি পরিয়া এবং একটা খাটো কোট পরিয়া স্যাড্‌লার কমিশনের সদস্য-রূপে তিনি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে

ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এমন কি হাইকোর্টেও তিনি দিনের কাজ সমাধা করিয়া কোর্টের পোশাক ছাড়িয়া ধুতি পরিতেন। একখানি ধুতি পরিয়া এবং বিশাল স্কন্ধের উপর অবহেলার সহিত একটা চাদর ঝুলাইয়া তিনি যখন হাই-কোর্টের মহামান্য বিচারপতিদের জন্য নির্দিষ্ট সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া খুব জোরে জোরে অবতরণ করিতেন, তখন উহা একটা দেখিবার বিষয় হইত। আশুতোষ যদিও তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল উচ্চ সরকারী কাজ করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি তিনি বাঙ্গালীর পরিচ্ছদকে সাহেবদের চক্ষে যতটা শ্রদ্ধেয় করিয়াছিলেন ততটা আর কেহ করিতে পারেন নাই।

তিনি কঠিন শয্যা পছন্দ করিতেন, এবং তদপেক্ষাও একটা কঠিন উপাধানের উপর শির রক্ষা করিয়া বেশ আরামে ঘুমাইতেন। স্যাড্‌লার কমিশনের সদস্য-রূপে তাঁহাকে বিভিন্ন প্রদেশের বড়লোকদের বাড়ীতে সম্মানিত অতিথি হইয়া থাকিতে হইত। তাঁহার জন্য বিলাসিতা-পূর্ণ শয্যা-সম্ভারের আয়োজন হইত—তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া মেঝের উপর সামান্য বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িতেন; ইহাতে সেই সকল প্রধান ব্যক্তি আশ্চর্যান্বিত হইয়া যাইতেন। তিনি কখনও ধূমপান বা মাদক-দ্রব্য-ব্যবহার করিতেন না, এমন কি পান পর্যন্ত খাইতেন না। একদা বিবাহ-উৎসবে কোন গৃহস্বামী পান খাওয়ার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিলে, আশুতোষ একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, —"আমরা তিন পুরুষ এ জিনিসটা স্পর্শ করি নাই। আমাদের সুচিরাগত এই পারিবারিক সংস্কার ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছেন কেন?"

সামাজিক জীবনে তাঁহার আড়ম্বরের লেশ-মাত্র ছিল না। তিনি গৃহস্থের নিমন্ত্রণ সর্বদা রক্ষা করিতেন; নিমন্ত্রণকারী যত ক্ষুদ্র ব্যক্তি হউক

না কেন, তিনি তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। তাঁহার মৃত্যু-রোগের প্রাক্কালে তিনি পাটনায় তাঁহার মোটর-চালকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়াছিলেন। এই সকল ছোট ছোট ব্যাপারে তিনি অহেতুক ভাবে কাহারও মনে ব্যথা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু যখন কর্তব্যের অনুরোধে সত্য এবং ন্যায়পরতার জন্য দরকার হইত, তখন দেশের সর্বপ্রধান ব্যক্তির ভ্রূকুটিতেও তিনি ভীত হইতেন না। সে সময়ে তিনি সিংহবিক্রান্ত হইতেন এবং কাহারও সাধ্য ছিল না যে তাঁহাকে দমন করে।

অতি শৈশব হইতেই আশুতোষ খুব ভোরে উঠিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার সমস্ত কার্যই নিয়মিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল এবং তিনি ঘড়ির কাঁটার মত ঠিকভাবে কার্য করিতেন। রাত্রি চারিটার সময়ে তিনি ঘুম হইতে উঠিতেন, এবং আর আধ ঘণ্টা পরেই কাজ করিতে বসিয়া যাইতেন। অন্ততঃ এক ঘণ্টাকাল শীতল প্রাতঃসমীরণের সংস্পর্শে থাকা দেহের পক্ষে ইষ্টজনক, এই হিতকর শিক্ষা তিনি তাঁহার দশম বৎসর হইতে পিতার নিকট পাইয়াছিলেন। তজ্জন্য মৃত্যুর মাত্র দুই দিন পূর্ব পর্যন্তও তিনি তাঁহার এই আজীবনের অভ্যাস নিয়মিতরূপে পালন করিয়া আসিয়াছিলেন।

তাঁহার পরিশ্রম করিবার শক্তি ছিল অদ্ভুত। প্রাতঃকালে তিনি হাইকোর্টের রায়, বিষয়ের বিবরণী, টীকা-টিপ্পনী এবং বহু পত্রের উত্তর কহিয়া লিখাইতেন। দুইজন টাইপিস্ট সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত—এই গুরুতর কার্যে তাহাদের অবকাশ মাত্র থাকিত না। হাই-কোর্ট হইতে তিনি প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতেন, এবং কোন দিন অপর কোন প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া তৎপরিচালনা সংক্রান্ত গুরুতর কার্যগুলি সমাধা করিতেন। বাড়ী ফিরিতে সন্ধ্যা

অতিক্রান্ত হইয়া যাইত। সন্ধ্যার পরে আহারাদি করিয়া তিনি পুনরায় কাজ লইয়া বসিতেন, এবং রাত্রি দশটা পর্যন্ত কাজ করিতেন। এই সময়টা তাঁহার অধ্যয়নের জন্য নিয়োজিত হইত। তিনি আলস্যকে দস্তুর-মত ঘৃণা করিতেন, এবং লোকে কি করিয়া সময় নষ্ট করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে তাহা বুঝিতেন না। যে-কোন কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহাই সুচারু-রূপে এবং সম্পূর্ণ-ভাবে সম্পন্ন করিতেন। তিনি কখনও কাজ অসমাপ্ত বা অর্ধ-সমাপ্ত করিয়া রাখিতেন না। আশুতোষ তাঁহার এরূপ বিচিত্র কার্যাবলী ও কর্তব্য-রাশি সম্পাদন করিতে কিরূপে সময় পাইতেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

অবিরত জল-স্রোতের মত দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণ তাঁহার দ্বারে ছুটিয়া আসিত—সেই দ্বার সর্বদা শ্রেণী-নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকিত। এই মহামান্য মনীষী ব্যক্তির উপদেশ ও সাহায্য পাওয়ার জন্য সর্ব-শ্রেণী এবং সর্ব অবস্থার লোক তাঁহার কাছে আনাগোনা করিত। যাঁহারা আসিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে কোন কায়দা বা বাহ্য ভদ্রতা দেখাইতে তিনি আদৌ ব্যস্ত হইতেন না, এবং ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি ব্যবহার-গত পার্থক্য বা পক্ষপাত তিনি দেখাইতেন না। তিনি সকলকে তাঁহার অত্যন্ত মিষ্ট হাসি এবং সেই চির-পরিচিত চোখের ভঙ্গী সহ গ্রহণ করিতেন; সেই হাসি এবং উৎসাহ-ব্যাপক চোখের ইশারায় তাহারা আশ্বস্ত হইত, ও তাহাদের মনের কথা খুলিয়া বলিত। মাঝে-মাঝে তাঁহার ব্যবহার বাহ্যতঃ একটু কঠোর ঠেকিলে-ও তাঁহার হৃদয় ছিল কোমল, সহানুভূতিপূর্ণ ও পরদুঃখ-কাতর। তিনি সর্বদাই মুক্ত-হৃদয় ও স্পষ্টবাদী ছিলেন, মিছামিছি আশা দিয়া কাহাকেও ঘুরাইতেন না।

যদি তাঁহার দ্বারা কাহারও উপকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত, তবে তিনি সর্বান্তঃকরণে সাধ্য-মত তাহা করিতেন।

আশুতোষ রহস্য-প্রিয় ছিলেন। তাঁহার হাসিটী যাহারা দেখিয়াছে, তাহারা তাহা ভুলিতে পারিবে না। একদিন রবিবার সায়াহ্নে দূর মফঃস্বল হইতে একটী ছাত্র তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল, এই ছাত্রটী আশুতোষকে কখন দেখে নাই। দৈব-ক্রমে সামান্য-পরিচ্ছদ-পরিহিত আশুতোষ স্বয়ং সেই বারান্দা দিয়া তখন আসিতেছিলেন; ইনি যে আশুতোষ হইতে পারেন, ইহা কিছু-মাত্র সন্দেহ না করিয়া বালকটী তাঁহাকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি আশুবাবুর সঙ্গে কখন দেখা করতে পারি?" আশু-বাবু বেশ আমোদ বোধ করিলেন, এবং ছেলেটীকে বেঞ্চের উপর নিজের কাছে বসাইয়া পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—সে কি জন্য আসিয়াছে, এবং বলিলেন যে, তিনি আশুবাবুকে খুব ভাল-রূপেই জানেন, এবং তাহার কি দরকার, তাহা শুনিলে তাঁহাকে দিয়া সেই কাজ উদ্ধার করাইবার চেষ্টা করিবেন। বালকটী এই 'অপরিচিত ব্যক্তি'র আগ্রহে বিশেষ কোন উৎসাহ বোধ করিল না, এবং মাথা নাড়িয়া ধীর-ভাবে বলিল—"আমি আশু-বাবুর কাছে আসিয়াছি—তাঁহার কাছে, শুধু তাঁহার-ই কাছে আমার কথা বলিব।" আশু-বাবু এই ব্যাপারে বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করিলেন, এবং নিজের কক্ষে ঢুকিয়া সেই বালকটিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বালকটী সেই কক্ষে ঢুকিয়া সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল যে, সেই ব্যক্তি-ই হাস্যোজ্জ্বল মূর্তিতে গৃহের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কেদারা-খানিতে বসিয়া আছেন। নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া, কিরূপে যে আশুতোষের কাছে ক্ষমা চাহিবে, তাহা সে স্থির করিতে না পারিয়া

দিশাহারা হইয়া গেল। বালকটী জানু পাতিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে উদ্যত হইলে, আশুতোষ তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন এবং মিষ্টবাক্যে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আশ্বস্ত করিলেন। সে যাহার জন্য আসিয়াছিল তাহা সিদ্ধ হইল। বস্তুতঃ তাহা ছাড়া আরও কিছু পাইল—এক থালা মিষ্টান্ন তখন-ই সেখানে আসিল, এবং সে স্বাচ্ছন্দ্য মনে তাহা খাইল।

বাস্তবিক, বঙ্গদেশে আশুতোষ অপেক্ষা ছাত্রগণের অন্তরঙ্গ বন্ধু কেহ ছিলেন না। তাহাদের প্রতি আশুতোষের প্রগাঢ় ভালবাসা এবং তাহাদের হিতার্থে তাঁহার পরম আগ্রহ ও যত্ন ছাত্রগণ বেশ উপলব্ধি করিত, এবং তাহাদের হৃদয় স্বভাবতঃ-ই তাঁহার প্রতি অনুরাগে আকৃষ্ট হইত। তাহারা তাঁহার নিকট শুধু পুস্তক ও অর্থ-সাহায্যের জন্য আসিত না—সেরূপ সাহায্য তো তাহারা সর্বদাই পাইত—অধিকন্তু তাহারা কি ভাবে কাজ করিবে, তাহার উপদেশের জন্য সর্বদা অপেক্ষা করিত। তাঁহার কর্মবহুল জীবনের বিচিত্র কর্তব্য-গুলির মধ্যেও তিনি তাহাদের কথা শুনিবার জন্য অবকাশ করিয়া লইতেন। দেশের যুবক-সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার বহু আশা ও আস্থা ছিল; তিনি অনেক সময়ে তাহাদিগকে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিতেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কথাগুলি দৃষ্টান্ত-স্থানীয়—"যদিও তোমরা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার স্রোতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া আছ, তথাপি ভারতের সমুন্নত চিন্তা, ভারতীয় শ্রেষ্ঠ ভাবগুলি, এবং এদেশের আচার-ব্যবহারের মধ্যে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, তাহার প্রতি বিরূপ হইও না; পাশ্চাত্ত্যের প্রখর আলোকে অন্ধ হইয়া, এতদ্দেশের যে অমূল্য সম্পদ্ তোমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছ, তৎপ্রতি উপেক্ষাশীল হইও না। তোমরা পাশ্চাত্ত্য জগতের যাহা-কিছু ভাল তৎপ্রতি শ্রদ্ধাশীল

অবশ্য-ই হইবে; কিন্তু তাই বলিয়া নিজের জাতীয়তা ত্যাগ করিও না, তোমরা খাঁটী ভারতীয় লোক, একথা সর্বদা স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করিও না; এবং পোশাক ও রুচির অভিমানের ক্ষুদ্রতা হইতে আপনাদিগকে সর্বদা রক্ষা করিও। সর্বাপেক্ষা বড় কথা তোমাদের দেশের ভাষা যত্নের সহিত অনুশীলন করিবে, কারণ দেশীয় ভাষার সাহায্যেই তোমরা এদেশের জনসাধারণের মন ছুঁইতে পারিবে এবং পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার রত্নরাজি তাহাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে।"

আশুতোষের স্মৃতি-শক্তি অতীব অসাধারণ ছিল। তিনি যে-সকল লোককে বহু বৎসর পূর্বে একবার-মাত্র দেখিয়াছেন, তাহাদেরও নাম ও ঠিকানা আশ্চর্যজনক-ভাবে মনে রাখিতেন। ইহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার, যেহেতু অসংখ্য শ্রেণীর অসংখ্য লোক নিত্য তাঁহার ঘরে ভিড় করিত। তাঁহার পাঠাগার নানা-বিষয়ক অসংখ্য পুস্তকে পূর্ণ ছিল। তিনি কখনও তাহাদের ক্যাটালগ প্রস্তুত করেন নাই। তাঁহাকে বাড়ীতে এই-সকল পুস্তকের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে দেখা যাইত—এই পুস্তক রক্ষার কোন শৃঙ্খলা ছিল না, কিন্তু তথাপি তাহাদের শ্রেণী-বিভাগ তাঁহার মনের ভিতরে ছিল। তিনি কেবল আড়ম্বর দেখাইবার জন্য সেগুলি সংগ্রহ করেন নাই, তিনি সর্বদা পুস্তকগুলির যথোচিত ব্যবহার করিতেন। তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে সে-সমস্ত পুস্তক সাজাইয়া রাখিতেন; অনেক সময়ে বইগুলি তাঁহার আবাস-গৃহের সম্ভবপর প্রত্যেক কক্ষে ও কোণে বিক্ষিপ্ত থাকিত, তথাপি তিনি নিজে জানিতেন, সেগুলির কোন্‌টী কোন্ স্থানে আছে।

আশুতোষের বন্ধুরা সর্বদা তাঁহার উপর নির্ভর করিতেন, তিনি তাঁহাদের অখণ্ড বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন, তাঁহাদের উপকারের জন্য

তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, এবং তাঁহাদের কেহ বিপদে পড়িলে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্ত কোন চেষ্টা বাকি রাখিতেন না। তবে এটাও বলা উচিত, প্রকৃত কারণে তাঁহার বিদ্বেষ জন্মিলে তাহা সহজে দূর হইত না। কিন্তু তিনি প্রতিহিংসা-পরায়ণ ছিলেন না। তাঁহার ঘোরতর শত্রুও যদি বিপদে পড়িয়া দ্বিধা-শূন্য-ভাবে তাঁহার সাহায্য চাহিতেন এবং অকপটে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতেন, তবে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। কেহ-কেহ বলিয়া থাকেন, তিনি স্বেচ্ছাতন্ত্রী ছিলেন। তিনি যে-রূপ অবস্থায় ছিলেন; তাঁহাকে অনেক সময়ে এমন ভাবে কাজ করিতে হইত, যাহাতে লোকে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে পারিত। কিন্তু যদি এ কথা কেহ বলেন যে তিনি লোকের স্বাধীনতা পছন্দ করিতেন না এবং আলোচনা-কালে স্বাধীন মত ব্যক্ত করার পক্ষে বিরোধী হইতেন, তবে তাহা ঘোরতর অন্যায় হইবে। সমস্ত গুরুতর বিষয়-ই খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে আলোচিত হইবার পর তাহা সভায় উপস্থিত করা হইত, এবং সভার পূর্বে এই যে আলোচনা হইত, তাহাতে সকলেই যে যাহার মত কোন কুণ্ঠা না রাখিয়া সম্পূর্ণ-রূপে প্রকাশিত করিতেন। এই আলোচনা-কালে আশুতোষ নিরপেক্ষ-ভাবে ধীরতার সহিত সকলের কথা শুনিতেন। কিন্তু এইভাবে একটা বিষয় সম্যক্-রূপে আলোচিত ও সুচিন্তিত হইবার পর তাঁহার যে মত হইত তাহা সুদৃঢ় হইত, এবং তিনি সহজে নড়চড় করিতে চাহিতেন না। কিন্তু যদি তৎসম্বন্ধে কোন নূতন ঘটনা বা অবস্থা উপস্থিত হইত, তবে তিনি তাহার পুনর্বিচারে সম্মত হইতেন। তিনি যে-সকল গুরুতর প্রস্তাবনা সম্পাদন করিবার ভার লইতেন, তাহা বাদ-প্রতিবাদ-মুখর সভায় ঘোর বিরুদ্ধতার মুখে সফল করিবার পক্ষে তাঁহার এইরূপ বিচার-বুদ্ধি ও মনোবৃত্তির একান্ত প্রয়োজন ছিল। তিনি তাঁহার

প্রস্তাবিত কোন অনুষ্ঠান-সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে সমস্ত বিষয়ে অবহিত থাকিতেন, এবং সভাগৃহে আর একটী দুর্লভ গুণের পরিচয় দিতেন, যাহা অতি অল্প লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়—তিনি নিজের মনোভাব সম্যক্-রূপে জানিতেন, এবং অপর সকলের নিকট তিনি কতটা প্রত্যাশা করিতে পারিতেন, তাহার সম্বন্ধে ধারণাও তাঁহার পূর্ণ-মাত্রায় ছিল। এই উচ্চ অভিজ্ঞতা তিনি অতি সুকঠোর কার্য-সম্পাদন কালে অর্জন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অপরাপর স্বাভাবিক গুণের সহযোগে ইহা তাঁহাকে মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব এবং নেতাদের মধ্যে তাঁহাদের দলপতির গৌরব দিয়াছিল।

আশুতোষ বিলাতে যান নাই। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেকোপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীর প্রতিনিধি-স্বরূপ বিলাত যাইবার জন্য তাঁহার নিকট লর্ড কার্জনের নিমন্ত্রণ আসিল। এ বিষয়ে তাঁহার মাতৃদেবী ঘোরতর আপত্তি করিলেন, সুতরাং মাতার আদেশ লঙ্ঘন করা আশুতোষের পক্ষে অসম্ভব হইল। লর্ড কার্জন আশুতোষকে সাক্ষাতে ডাকাইয়া আনিলেন। তিনি কেন তাঁহার আদেশ-পালন করিতে বিলাতে যাইতে পারিবেন না, তাহার হেতু দেখাইয়া যখন আশুতোষ সকল কথা বলিলেন, তখন লাট-সাহেব বলিলেন—"আপনি যান, আপনার মাতাকে যাইয়া বলুন যে, ভারত-সম্রাটের প্রতিনিধি সপরিষদ্ গভর্ণর-জেনেরাল তাঁহাকে যাইতে আদেশ করিয়াছেন।" আশুতোষ তিলার্ধ না ভাবিয়া উত্তর দিলেন—"তাহা হইলে আমি আমার মাতার পক্ষ হইতে জানাইব যে, তিনি তাঁহার পুত্রের উপর আদেশ করিবার অধি-কার, তিনি ভিন্ন আর কাহার-ও আছে, একথা কিছুতেই স্বীকার করেন না।"

যদিও তিনি গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং অপরাপর সম্ভ্রান্ত গৃহের ন্যায় তাঁহার বাড়ীতেও ধর্মের নানারূপ উৎসব রীতি-মত নির্বাহিত হইত, তথাপি তিনি সমাজ-সংস্কারে আগ্রহ-শীল ছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার বালবিধবা জ্যেষ্ঠা কন্যার দ্বিতীয় বার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই কার্যে আমরা তাঁহার দুর্জয় সাহসের পরিচয় পাই, এই কার্যের ফলে তাঁহাকে অনেক শত্রুতা ও সামাজিক নিপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল॥

১ স্যাড্‌লার কমিশন—১৯১৭ সালে ভারত গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা (শিক্ষাদান ও সমস্ত বিষয়ে) এবং ইহার ভবিষ্যৎ কার্যবিধি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। ইংলাণ্ডের লীড্‌স নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-Chancellor বা উপাধ্যক্ষ ডাক্তার (পরে স্যর) মাইকেল স্যাড্‌লার (M. E. Sadler) এই সমিতির সভাপতি, এবং ডাক্তার স্যাড্‌লার ছাড়া আর ছয়জন পণ্ডিত ও শিক্ষাজীবী ইহার সদস্য নিযুক্ত হন। সাতজন সদস্যের মধ্যে দুইজন ভারতীয় (স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এবং আলীগড়ের অধ্যাপক ডাক্তার জিয়াউদ্দীন আহ্‌মদ), বাকী পাঁচজন ইংরেজ ছিলেন। এই অনুসন্ধান-সমিতির নাম ইহার সভাপতির নাম হইতে Sadler Commission হয়। কমিশন সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়া বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কার্য দর্শন করেন, দেশের শিক্ষা-কার্যে নিযুক্ত ও অন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অভিমত গ্রহণ করেন, বিশেষজ্ঞগণের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন, এবং বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষে শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের কার্য-বিবরণী ও প্রস্তাবসমূহ, তের খণ্ডে বিরাট এক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত করেন। আশুতোষ এই কমিশনের সর্বাপেক্ষা প্রভাব-শালী সদস্য ছিলেন।

রোকেয়া-জীবনী

[বেগম শামসুন্-নাহার মাহ্মুদ]

বেগম রোকেয়া সখাওয়াৎ হোসেন (১৮৭৯-১৯৩২) এক মহীয়সী পুণ্য-চরিত নারী ছিলেন, ইনি স্ব-সমাজের কন্যাদের শিক্ষাদানকে নিজ জীবনের মুখ্য ব্রত-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তর-বঙ্গের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলমান জমিদার পরিবারে ইনি জন্ম-গ্রহণ করেন এবং বিহারে উচ্চ-বংশের এক ভদ্রলোকের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার স্বামী ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পরে রোকেয়া কলিকাতায় স্বামীর নামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া, তাহার মারফৎ কলিকাতার মুসলমান সমাজের মেয়েদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার যত্নে ও নিষ্ঠায় এই বিদ্যালয় অশেষ মঙ্গলের কারণ হয়। রোকেয়া একজন নীরব কর্মী ছিলেন। তাঁহার নিজ মহান্ জীবনের প্রভাবে তিনি তাঁহার ছাত্রীদের ও যাহারা তাঁহার পরার্থে উৎসর্গীকৃত জীবনের সংস্পর্শে আসিত তাহাদের অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রোকেয়ার একখানি সুন্দর জীবনী লিখিয়াছেন, তাঁহার অন্যতম ছাত্রী, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সুলেখিকা বিদুষী মুসলিম-মহিলা শামসুন্-নাহার মাহ্মুদ। নিম্নে রোকেয়া বেগমের জীবনের ও তাঁহার চিন্তাধারার একটু দিগ্দর্শন এই বই হইতে উদ্ধৃত হইল।

রোকেয়ার পিতৃপরিবারের মেয়েদের বাধা-নিষেধের অন্ত ছিল না, একথা বলিয়াছি। কিন্তু বিবাহের পরে শ্বশুর-পরিবারে আসিয়া, রোকেয়া দেখিলেন, সে অঞ্চলের মেয়েরা আরও কূপ-মণ্ডূক। শুধু তাহাই নয়—তাহাদের যে একটা জীবন্ত সত্তা আছে, সমাজ যেন তাহা স্বীকার করিতে নারাজ। রোকেয়ার স্ব-লিখিত গ্রন্থে স্থানে-স্থানে যে-সব বর্ণনা আছে, তাহাতে পর্দা প্রভৃতি প্রথার বিকট রূপ দেখিয়া মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে—নারী-জীবনের সৌন্দর্য ও মর্যাদার জন্যই পর্দা—না, দেহ মন, এমন কি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া পর্দার সম্মান রক্ষা করিবার জন্য নারীর সৃষ্টি ?

রোকেয়া বলিতেছেন—"প্রায় একুশ-বাইশ বৎসর পূর্বেকার ঘটনা। আমার দূর-সম্পর্কীয় এক মামী-শাশুড়ী ভাগলপুর হইতে পাটনা যাইতেছিলেন। সঙ্গে মাত্র একজন পরিচারিকা। কিউল স্টেশনে ট্রেন বদল করিতে হয়। মামানী সাহেবা অপর ট্রেনে উঠিবার সময় তাঁহার প্রকাণ্ড বোরকায় জড়াইয়া ট্রেন ও প্লাটফর্মের মাঝ-খানে পড়িয়া গেলেন। স্টেশনে সে সময়ে মামানীর চাকরানী ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোক ছিল না। কুলিরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিতে অগ্রসর হইলে, চাকরানী দোহাই দিয়া নিষেধ করিল—"খবরদার, কেহ বিবি-সাহেবার গায়ে হাত দিও না।" সে একা অনেক টানাটানি করিয়া কিছুতেই তাঁহাকে তুলিতে পারিল না। প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ট্রেনের সংঘর্ষে মামানী-সাহেবা পিষিয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেলেন—কোথায় তাঁহার বোরকা, আর কোথায় তিনি! স্টেশন-ভরা লোক সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিল, কেহ তাঁহার সাহায্য করিবার অনুমতি পাইল না। পরে তাঁহার চূর্ণ-প্রায় দেহ একটা ঘরে রাখা হইল। তাঁহার চাকরানী প্রাণপণে বিনাইয়া-বিনাইয়া কাঁদিল, আর তাঁহাকে বাতাস করিতে থাকিল। এই অবস্থায় এগার ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি দেহ-ত্যাগ করিলেন। কি ভীষণ মৃত্যু!"

শুধু শ্বশুর-পরিবারের কথাই নয়, দুর্ভাগ্য মুসলমান সমাজের দুর্ভাগ্যতর মেয়েদের দুর্গতি ও লাঞ্ছনার আরও বহু বহু কাহিনী রোকেয়ার মনে চিরদিনের জন্য শেলের মত গাঁথা হইয়া গিয়াছিল।

আঠার বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার স্বামী ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। কার্যোপলক্ষে তাঁহাকে দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। সেই কারণে রোকেয়া-ও নানা দেশ-বিদেশ

বেড়াইয়া অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের সুযোগ পান। নানা স্থানে বাস করিয়া, নানা জাতির সঙ্গে মিশিয়া, দিনে-দিনে তাঁহার মনের দুয়ার খুলিয়া যায়। শৈশব হইতে যে সকল নব-নব ভাব তাঁহার মনের মধ্যে শত পাকে জট বাঁধিতেছিল, এখন দিনে-দিনে যেন একটীর পর একটী করিয়া তাহাদের বন্ধন খুলিয়া যাইতে লাগিল।

রোকেয়া যেখানে গিয়াছেন, সর্বত্রই তাঁহার চোখের সম্মুখে তীব্র-ভাবে জাগিয়াছে—নারীর পরাধীনতার বীভৎস রূপ। অশিক্ষা ও কুশিক্ষা যেন ভীষণ ব্যাধির মত আগাগোড়া ছাইয়া ফেলিয়াছে; বড় নিষ্করুণ, বড় মমতাহীন সে কাল ব্যাধির আক্রমণ। তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহার কি করুণ ছবি তাঁহার লেখনী-মুখে স্থানে-স্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে! তিনি লিখিয়াছেন—"পাঠিকা, আপনি কখনও বিহারের কোনও ধনী মুসলমান ঘরের বউ-ঝি নামক জড় পদার্থ দেখিয়াছেন কি? একটী বধু বেগমের প্রতিকৃতি দেখাই। ইঁহাকে কোন প্রসিদ্ধ যাদু-ঘরে[৪] বসাইয়া রাখিলে, রমণী-জাতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইত! একটা অন্ধকার কক্ষে দুইটী মাত্র দ্বার আছে, তাহার একটী রুদ্ধ ও একটী মুক্ত থাকে। সুতরাং সেখানে,—বোধ হয় পর্দার অনুরোধেই—বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য-রশ্মির প্রবেশ নিষেধ। ঐ কুঠরীর পর্যঙ্কের পার্শ্বে যে রক্ত-বর্ণ বনাত-মণ্ডিত তক্তপোষ আছে, তাহার উপর বহুবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা, তাম্বুল-রাগে রঞ্জিতাধরা প্রসন্নাননা যে জড়-পুত্তলিকা দেখিতেছেন, উহাই বধু বেগম। ইঁহার সর্বাঙ্গে ১০২৪০৲ টাকার অলঙ্কার। মাথায় অর্ধ সের (৪০ ভরি), কর্ণে কিঞ্চিৎ-অধিক এক পোয়া (২৫ ভরি), কণ্ঠে দেড় সের (১২০ তোলা), সুকোমল বাহুলতায় প্রায় দুই সের (১৫০ ভরি), কটিদেশে প্রায় তিন পোয়া (৬৫ ভরি), ও চরণ-যুগলে ঠিক তিন সের (২৪০

ভরি) স্বর্ণের বোঝা। এরূপ আট সের স্বর্ণের বোঝা লইয়া নড়াচড়া অসম্ভব। সুতরাং হতভাগী বধূ বেগম, জড় পদার্থ না হইয়া কি করিবেন? কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে তাঁহার চরণদ্বয় শ্রান্ত ও ক্লান্ত ও ব্যথিত হয়—বাহুদ্বয় সম্পূর্ণ অকর্মণ্য। শরীর যেমন জড়পিণ্ড, মন ততোঽধিক জড়।" অন্তরের তীব্র ব্যথা ও অনুশোচনাকে তিনি এখানে হাস্য-রসের আড়ালে ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন—"বিহার-অঞ্চলে বিবাহের পূর্বে ছয়-সাত মাস পর্যন্ত নির্জন কারাবাসে মেয়েকে আধ-মরা করা হয়। ঐ সময়ে মেয়ে মাটিতে পা রাখে না—প্রয়োজন-মত তাহাকে কোলে করিয়া স্নানাগারে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার নড়াচড়া সম্পূর্ণ নিষেধ। সমস্ত দিন মাথা গুঁজিয়া একটা খাটিয়ার উপর বসিয়া থাকিতে হয়। রাত্রি-কালে সেখানেই শুইতে হয়। অপরে মুখে তুলিয়া ভাতের গ্রাস খাওয়ায়। ১৯২৪ সনে নাতিনীর বিবাহের নিমন্ত্রণে আরা গিয়াছিলাম। বেচারী তখন বন্দীখানায়! আমি সেই জেলখানায় গিয়া বেশীক্ষণ বসিতে পারি নাই—সে রুদ্ধ গৃহে আমার দম আটকাইয়া আসে। বেচারী ছয় মাস সেই রুদ্ধ কারাগারে ছিল। শেষে তাহার হিস্টিরিয়া রোগের উৎপত্তি হইল।"

"আর এক বেচারী ছয় মাস পর্যন্ত বন্দিনী ছিল। বিবাহ হইলে দেখা গেল— সর্বদা চক্ষু বুজিয়া থাকার ফলে তাহার চক্ষু দুইটী চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

শুধু অবরোধের অত্যাচার নয়, অবরোধের ভিতরে আরও নানা-বিধ উৎপীড়ন। রোকেয়া বলিতেছেন—"আমরা রমাসুন্দরীকে অনেক দিন হইতে জানি। তিনি বিধবা, সন্তান-সন্ততিও নাই। তাঁহার স্বামীর প্রভূত সম্পত্তি আছে। তাঁহার দেবর এখন সে-সকল সম্পত্তির

অধীশ্বর। দেবরটী কিন্তু রমাকে এক মুঠা অন্ন এবং আশ্রয় দানেও কুণ্ঠিত। রমা সব করিতে জানে, কেবল কোঁদল জানে না। রমা বেশ জানে, কি করিয়া পরকে আপন করিতে হয়, কেবল আপনাকে পর করিতে জানে না। এত গুণ সত্ত্বেও তিনি দেবরের গৃহে থাকিতে পান না কেন? কপালের দোষ! হায় অসহায়া অবলা! তোমার নিজের দোষকে বল কপালের দোষ? তোমাদের দোষ মূর্খতা, অক্ষমতা, দুর্বলতা ইত্যাদি। রমা বলিলেন—'আমাদের সেই সহমরণ-প্রথা-ই বেশ ছিল। গভর্ণমেণ্ট সহমরণ-প্রথা তুলিয়া দিয়া বিধবার যন্ত্রণা বৃদ্ধি করিয়াছেন।' ঈশ্বর কি রমার কথাগুলি শুনিতে পান না? তিনি কেমন দয়াময়? অন্তঃপুরের এ-সকল ক্ষতকে নালী-ঘা না বলিয়া কি বলিব? এ রোগের কি ঔষধ নাই? বিধবা তো সহমরণ আকাঙ্ক্ষা করে। উৎপীড়িত সধবারা কি করিবে?"

এই সকল কথার অন্তরালে রোকেয়ার দরদী মনের অসহ্য বেদনা লুকাইয়া রহিয়াছে।

তাঁহার কাছে সকলের চেয়ে বেশী করুণ মনে হইল একটী জিনিস; তিনি দেখিলেন—উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা নানাভাবে নানারূপে দিনে দিনে তিল তিল করিয়া ইহাদের পিষিয়া মারিতেছে, কিন্তু হতভাগিনীদের তাহা অনুভব করিবার-ও শক্তি নাই; তাহাদের সঙ্কীর্ণ মন অসাড়। অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—কোন দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া চাহিয়া দেখিবার সামর্থ্য নাই। বাস্তবিক-ই মানুষের যতক্ষণ জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ যে-কোন দুর্গতির প্রতিকার একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় না; কিন্তু দুর্ভাগ্য তখন-ই চরম সীমায় পৌঁছায়, যখন অনুভূতিটুকুও একেবারে লোপ পায়। Murder of Delisia বা "ডেলিসিয়া-হত্যা" নামক ইংরেজী উপন্যাসের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে গিয়া তিনি

বলিয়াছেন—"সভ্যতা ও স্বাধীনতার লীলাভূমি লণ্ডন নগরীতে-ও শত শত ডেলিসিয়া-বধ কাব্য নিত্য অভিনীত হয়। হায়, রমণী পৃথিবীর সর্বত্রই অবলা! ইংলণ্ডের নারী-সমাজের সহিত ভারত-ললনা-সমাজের কি চমৎকার সাদৃশ্য! কিন্তু তাঁহারা বিদুষী, এবং আমরা নিরক্ষর—এই একটা ভারী পার্থক্য আছে; ডেলিসিয়ার আত্মমর্যাদা-জ্ঞান আছে, আমাদের তাহা নাই। নির্যাতিত প্রপীড়িত হইলেও ডেলিসিয়ার কেমন এক-প্রকার মহীয়ান্ গরীয়ান্ ভাব আছে; অত্যাচারী কর্তৃক তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইতেছে, কিন্তু অবনত হইতেছে না! তিনি গর্বোন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া মরিবেন, কিন্তু নতশিরে যুক্ত-করে প্রাণ-ভিক্ষা চাহিবেন না। এই মহান্ ভাবটা আমাদের নাই। ইহার কারণ—এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার অভাব।" দেখিয়া শুনিয়া রোকেয়ার তরুণ মন এক অসহ্য বেদনায় নিশিদিন আলোড়িত হইতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার বেদনা-বিদগ্ধ মনে জন্মগ্রহণ করিল দেশের ও জাতির যে কল্যাণ-কামনা, তাহার-ই সঙ্গে সঙ্গে বুঝি বাঙ্গালার নারী-ইতিহাসের একটী নূতন ধারার বীজ দিনে-দিনে অলক্ষ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল।

এদিকে তাঁহার নিজের শিক্ষাও দিন-দিন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল। স্বামী সর্বপ্রকারে উৎসাহ, সাহায্য ও সহানুভূতি দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। বিবাহিত জীবন তাঁহাকে পরম স্নেহময় জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, সত্য—কিন্তু তাঁহার স্নেহচ্ছায়া তখনো পর্যন্ত একেবারে অপসারিত হয় নাই। ভাই-ভগিনীতে চিঠি-পত্র লেখা-লেখি সর্বদাই চলে। ইংরাজী-শিক্ষার উৎকর্ষের জন্য চিঠি-পত্র ইংরেজীতেই লেখেন। ইব্রাহিম ভগিনীর চিঠিপত্র পড়িয়া, তাহাতে ভাষার কোন খুঁত থাকিলে চিহ্নিত করিয়া পরবর্তী ডাকে আবার তাহা

তাঁহার কাছে ফেরৎ পাঠান—ভগিনী গভীর মনোযোগের সহিত সে-সকল ত্রুটি সংশোধন করিয়া লন। ভাইয়ের চিঠিতে আরো থাকে, কত উৎসাহের কথা, কত আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণী। রোকেয়া প্রত্যেকটি কথা সযত্নে মনের মধ্যে গাঁথিয়া লন। রোকেয়ার ভিতরকার মহৎ সম্ভাবনা যেন এ ভাবে দিনে-দিনে বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল—কতকটা নিজের অজ্ঞাত-সারেই যেন তিনি ভবিষ্যতের এক বিরাট কার্য সাধনের জন্য নিজেকে ক্রমশঃ প্রস্তুত করিয়া আনিতে লাগিলেন।

রোকেয়ার স্বামী অত্যন্ত উদার-ভাবাপন্ন, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন, একথা আগেই বলিয়াছি। রোকেয়ার গর্ভে তাঁহার দুইটী কন্যা-সন্তান হইয়া অল্প বয়সেই মারা যায়। কাজেই রোকেয়ার সংসারের বন্ধন তত দৃঢ় নয়। এদিকে মানুষের জীবন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। কাহার জীবনের মেয়াদ কখন ফুরাইবে, কিছুই বলা যায় না। দৃষ্টিমান্ স্বামী দেখিলেন, রোকেয়া নিঃসন্তান হইলেও তাঁহার বিবাহিত জীবনে আর কোন অপূর্ণতা নাই। আপনার অন্তরের স্নেহ-প্রীতি দিয়া তাহার সমস্ত অভাব যেন তিনি পূরণ করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তারপর? তাঁহার মৃত্যুর পর রোকেয়ার জীবনের অবলম্বন বলিতে তো কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। তাঁহার মনোভাব, মতিগতিও যেন তিনি ক্রমাগত সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছিলেন। দিনের পর দিন চিন্তা করিতে-করিতে পত্নীর ভবিষ্যৎ-জীবনের জন্য এক অভূত-পূর্ব পরিকল্পনা তাঁহার মাথায় খেলিয়া গেল—যাহাকে রূপ দিতে পারিলে তাঁহার অবর্তমানেও বুঝি তাহার জীবন সার্থকতায় ভরিয়া উঠিতে পারে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি পরামর্শ দিলেন—তাঁহার অবর্তমানে এক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্ত্রী-শিক্ষার জন্য জীবন-উৎসর্গ করাই রোকেয়ার উপযুক্ত হইবে। ইহাতে শুধু যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিবার

একটী উপলক্ষ্য পাওয়া যাইবে তাহা নয়—রোকেয়ার সমস্ত জীবনের স্বপ্ন-সাধ সফল হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেশ এবং জাতিরও অশেষ কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হইবে।

মিতব্যয়ী সখাওয়াৎ সত্তর হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাহা হইতে দশ হাজার টাকা কেবল-মাত্র কল্পিত স্কুল-পরিচালনার জন্যই তিনি পত্নীকে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া যান। এ ভাবে স্বামীর জীবদ্দশাতেই রোকেয়ার ভবিষ্যৎ-জীবনের গতি নির্ধারিত হইয়া যায়। সাবধানী সখাওয়াতের আকাঙ্ক্ষা মিথ্যা হইল না। প্রিয়তমা পত্নীর ভবিষ্যতের পথ-নির্দেশ করিতে পারিয়া, তিনি কিছুটা নিশ্চিন্ত হইলেন, এমন সময়ে একদিন পর-পারের পরওয়ানাও আসিয়া হাজির হইল। দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁহাকে শীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল, কিন্তু তাঁহার সেই সদানন্দ ভাব শেষ পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

স্বামীর সাহায্য ও সহানুভূতি রোকেয়ার শিক্ষার পথে সহায়তা করিয়াছিল। তাহার ফল ফলিতে বিলম্ব হয় নাই। সখাওয়াৎ সরকারী লেখাপড়ার কাজে রোকেয়ার নিকট হইতে প্রচুর সাহায্য পাইতেন। শুধু তাহাই নয়, সখাওয়াতের বাঙ্গালা শিখিবার-ও আগ্রহ ছিল, এ কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। রোকেয়া নিজে বিহারী স্বামীকে বাঙ্গালা শিখাইবার ভার লইয়াছিলেন। এভাবে তিনি নিজের ঋণ-ভার কিছুটা লাঘব করিবার চেষ্টা করেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে কাল ব্যাধির প্রকোপে সখাওয়াতের দুইটী চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। সখাওয়াৎ চক্ষু হারাইলেন, সেই হইতে লেখাপড়ার ব্যাপারে স্ত্রীই হইলেন তাঁহার চক্ষু। রোকেয়া গভীর অনুরাগে স্বামীর রোগ-শয্যার পাশে বসিয়া তাঁহাকে নানা বিষয় পড়িয়া শুনাইতেন।

অবশেষে কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য আসিয়া ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের

যে মাসে সখাওয়াৎ দেহত্যাগ করেন। একটী মহৎ অন্তর, মমতায় ভরা একটী অমূল্য হৃদয়, ভূলোক হইতে দ্যুলোকে মহাপ্রয়াণ করিল। কিন্তু তিনি সত্যই মরিলেন কি? না, তাহা নয়। তাঁহার নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া গেল—কিন্তু এখানেই সব শেষ হইল না। প্রেমময়ী পত্নীর জীবনে তিনি আবার নূতন করিয়া বাঁচিয়া উঠিলেন।

রোকেয়ার বিবাহ হইয়াছিল আঠার বৎসর বয়সে, বিধবা হইলেন তিনি আটাশ বৎসরে। মাত্র দশ বৎসরের বিবাহিত জীবন। এই সময়ের মধ্যে প্রিয়তম স্বামী তাঁহাকে অন্তরের উচ্ছলিত ভালবাসায় সিক্ত করিলেন; আবার ইহারই মধ্যে তাঁহার সকল দেনা-পাওনা কড়ায় গণ্ডায় মিটাইয়া দিয়া, একা পর-লোকের পথে যাত্রা করিলেন।

রোকেয়া আজ সংসারে একাকিনী। অভাব তাঁহার কিছুর-ই নাই। স্বামীর মৃত্যুর পর নগদ টাকা তিনি পাইলেন পঞ্চাশ হাজার। তাঁহার দাস-দাসী আছে, বিষয়-সম্পত্তি আছে, রূপ-যৌবন আছে—কিন্তু সংসারের কঠিনতম বন্ধনটী তাঁহার আজ ভাগলপুরের মাটীতে সমাহিত। তাঁহার শোকার্ত্ত উদাস মন বিহঙ্গের মত উড়িতে চাহিল, কিন্তু না, না—তাহা হইতে পারে না, তাঁহার সম্মুখে এক বিরাট কর্ত্তব্য পড়িয়া আছে। বিপুল-কর্ম্ম-ক্ষেত্র তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাক দেয়। স্বামী বাঁচিয়া থাকিতেই পথের দিশা স্থির হইয়াছিল। নারী-জাগরণের সে স্বপ্ন তিনি সঙ্গোপনে বহুদিন অন্তরে লুকাইয়া রাখিয়া-ছিলেন, সমস্ত প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়া আজ সেই স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিবার সময় উপস্থিত। আর স্বামী? দশ বৎসরের বিবাহিত জীবনে প্রাণপ্রিয় স্বামী যে পর্ব্বতপ্রমাণ ঋণে তাঁহাকে বাঁধিয়া গিয়াছেন তাহাও পরিশোধের এই উপযুক্ত অবসর। পতিব্রতা পত্নী পণ করিলেন—নিজের কর্ম্ম-সাধনার মধ্যে স্বামীকে বাঁচাইয়া রাখিবেন।

শাহ্-জাহান—প্রেমিক শাহ্-জাহান ছিলেন রাজরাজেশ্বর। মণি-মাণিক্য-খচিত ধবলিত পাষাণে তিনি মহাসমারোহে দয়িতার স্মৃতি অক্ষয় করিয়া রাখিলেন।৮ আর রোকেয়া অসহায় অবলা, আপনার বুকের রক্তেও কি তিনি কালের কপোলে স্বামীর স্মৃতিলেখা ভাস্বর করিয়া তুলিতে পারেন নাই? না, না আর বিলম্ব নয়। দুঃসহ শোকের মধ্যে-ও তিনি চোখ মুছিয়া দৃঢ় পায়ে দাঁড়াইলেন।

সখাওয়াতের মৃত্যুর মাত্র পাঁচ মাস পরে, পাঁচটী মাত্র ছাত্রী লইয়া ভাগলপুরে প্রথম 'সখাওয়াৎ-মেমোরিয়াল স্কুল'-এর ভিত্তি-পত্তন হইল। রোকেয়া বলিয়াছেন, "তখনও আমি শোকের প্রচণ্ড আঘাত সম্পূর্ণ সামলাইয়া উঠিতে পারি নাই।" জীবন-যৌবনের বাসন্তী ঊষায় ঐশ্বর্য-বিলাস পিছনে ফেলিয়া, কুসুম-কোমলা নারী স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইলেন—কঠোর ত্যাগ-সাধনা; সম্মুখে জাগিয়া রহিল—দারুণ বন্ধুর পথ, দিক্‌হীন, সীমাহীন। স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল: কিন্তু রোকেয়া সংসার-অনভিজ্ঞ, চিরকাল কঠোর অবরোধের মধ্যে মানুষ—স্কুল-পাঠশালার ভিতরে তিনি কখনো পা দেন নাই। এখন স্কুল-পরিচালনার কাজ হাতে লইয়া বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তিনি নিজে বলিয়াছেন—"প্রথম যখন পাঁচটি মেয়ে দিয়ে স্কুল আরম্ভ করি, তখন ভারী আশ্চর্য ঠেকেছিল এই কথা যে, এক-ই শিক্ষয়িত্রী কেমন ক'রে এক সঙ্গে এক-ই সময়ে পাঁচটী মেয়েকে পড়াতে পারেন।" এমন অনভিজ্ঞতা লইয়া সদ্যোবিধবা রোকেয়া প্রথম কাজে নামিয়াছিলেন।

এই সময় পরলোক-গত স্বামীর পারিবারিক বিশৃঙ্খলাও তাঁহাকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিল। সখাওয়াতের প্রথম পত্নীর গর্ভজাত একটী কন্যা ছিল, একথা আগে উল্লেখ করিয়াছি। সখাওয়াৎ জীবদ্দশায় সে

কন্যার সৎপাত্রে বিবাহ দেন। এখন পিতার মৃত্যুর পর সে সুযোগ দেখিল। সংসারের কর্তৃত্ব, টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পত্তি ইত্যাদি লইয়া কন্যা-জামাতা উভয়ে রোকেয়ার সঙ্গে নানা দুর্ব্যবহার করিতে লাগিল। রোকেয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী হোমেরা এই সময়ে তাঁহার কাছে ছিলেন। ভগ্নীর সাহায্যে তিনি সপত্নী-কন্যা ও জামাতার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া স্বামী-গৃহ ত্যাগ করিলেন।

পরলোকগত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব আবদুল মালেক তখন ভাগলপুরে। তাঁহার অজস্র সহানুভূতি এই সময়ে রোকেয়াকে যথেষ্ট শক্তি ও সাহস যোগাইয়াছিল। অতঃপর আরও কয়েক মাস তাঁহাকে ভাগলপুরে থাকিতে হয়। কয়েক মাস পরে, রোকেয়া তাঁহার বিবাহিত জীবনের পুণ্যতীর্থ ভাগলপুর চিরদিনের মত ছাড়িয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে সখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল-ও কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল।

১ কূপ-মণ্ডুক—কূয়ার বেঙ্। সামান্য প্রাণী বেঙ্—সে জগতের কতটুকু বা খবর রাখিতে পারে? তাহার উপর যদি খোলা পুকুরের বেঙ্ না হইয়া সীমাবদ্ধ কূপের মধ্যে বাস করে, কূপই যদি তাহার সমগ্র জগৎ হয়, তাহা হইলে তাহার ন্যায় সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি আর কাহার হইবে? অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, সঙ্কীর্ণ জগতের মধ্যে বিচরণশীল, 'কূনো', অথচ দম্ভে পূর্ণ ব্যক্তিকে এইজন্য 'কূপ-মণ্ডুক' বলে।

২ শাশুড়ী—সংস্কৃত 'শ্বশ্রূ'—প্রাকৃত 'শশ্‌সূ' বা 'সসসূ'—প্রাচীন বাঙ্গালা 'শাশু', আধুনিক বাঙ্গালা 'শাশ' (যেমন 'মাসী-শাশ', হইতে 'মাস-শাশ', 'পিস-শাশ')। 'শাশু' বা 'শাশ' শব্দে স্বার্থে ড়ী-প্রত্যয় যোগে 'শাশুড়ী' বা 'শাশড়ী' শব্দ। সংস্কৃত 'শ্বশ্রূ, শ্বশুর' শব্দদ্বয়ের প্রভাবে বাঙ্গালা শব্দটির বানানে ব-ফলা ('শ্বাশুড়ী') কখন কখন ব্যবহৃত হয়।

৩ বোরকা—(আরবী 'বুরক' হইতে)—প্রাথমিক অর্থ, 'মুখাবরণ' (মুখ ঢাকিবার লম্বা কাপড়ের ফালি, দুইটি চক্ষুর জন্য তাহাতে দুইটি ছিদ্র থাকিত)। পরে 'আপাদমস্তক আবৃত করিবার জন্য পরিচ্ছদ-বিশেষ'। ভারতের বাহিরে সম্ভ্রান্ত-বংশীয় মুসলমান রমণী লোক-সমক্ষে বাহির হইলে, এই পোশাক পরিধান করিয়া থাকেন।

৪ যাদুঘর—নানাবিধ অদ্ভুত বা দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের সংগ্রহ-শালা museum

'যাদু-ঘর' শব্দটি museum-এর প্রচলিত বাঙ্গালা প্রতিশব্দ, ইহা কিন্তু শিক্ষিত মনোভাবের পরিচায়ক নহে,—ইহার অর্থ 'জাদু' অর্থাৎ magic বা মায়া-বিস্তার ঘর (সংস্কৃত 'যাতু'=মায়াবী, রাক্ষস—'যাতু'-র ফারসী প্রতিশব্দ 'জাদু'=মায়া-বিদ্যা)। এইরূপ অশিক্ষিত মনোবৃত্তির প্রয়োগের ফলে automobile বা 'স্বয়ংগচ্ছ' গাড়ীর বাঙ্গালা দাঁড়াইয়াছে 'হাওয়া-গাড়ী'।

৫ সহমরণ-প্রথা—বা 'সতীদাহ-প্রথা',—হিন্দু জাতির মধ্যে প্রাচীন কালে (সহস্র বৎসর পূর্ব হইতেই) এক নিষ্ঠুর প্রথা দাঁড়াইয়া যায়—সম্ভ্রান্ত ঘরে স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় জীবন্ত দাহ করা হইত। বহু স্থলে স্বেচ্ছায় স্ত্রী স্বামীর সহিত সহমরণে যাইতেন (পুরাতন বাঙ্গালা কথায় 'আগুন খাইতেন'), আবার বহু স্থলে তাঁহাদের অনিচ্ছায়ও জীবন্ত দগ্ধ করা হইত। রাজা রামমোহন রায়-প্রমুখ সমাজ-সংস্কারকগণের চেষ্টায় লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে ১৮২৯ সালে এই বর্বর ও বীভৎস প্রথা ভারতে ইংরেজ-অধিকারের মধ্যে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

৬ পরওয়ানা—আজ্ঞাপত্র, হুকুম-নামা। শব্দটি সংস্কৃত 'প্রমাণ' হইতে। সংস্কৃত শব্দ হিন্দীতে বিকৃত উচ্চারিত হয় 'পরমানা', পরে মুসলমান আমলে ভারতের রাজ-ভাষা ফারসীতে ইহা গৃহীত হয়। সংস্কৃত 'প্রমাণ' শব্দের ইরানীয় প্রতিরূপ হইতেছে 'ফ্রামান', হইতে অনুরূপ অর্থে ফারসী 'ফুরমান' শব্দ।

৭ পঞ্চভূত—প্রাচীন ভারতীয় মতে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম (অর্থাৎ মাটি ও অন্য কোন পদার্থ, জল, অগ্নি, বায়ু ও শূন্য), এই পাঁচটি মূল পদার্থ মিলিয়া বিশ্ব-প্রকৃতির উদ্ভব করিয়াছে। মানুষের দেহও এই পঞ্চ ভূতের বা পদার্থের সমবায়ে গঠিত, এবং মানুষের মৃত্যু ঘটিলে দেহের ধ্বংস হয়, ইহার ভৌতিক অংশ পৃথিবীর ভৌতিক অংশের সহিত মিলিত হইয়া যায়।

৮ দয়িতার স্মৃতি অক্ষয় করিয়া রাখিলেন—শাহ্‌জাহান বাদশাহের পত্নী মমতাজ্‌ মহল (Mamtaz-Mahal) বা তাজ-বিবি (Taj-Bibi) পরলোক গমন করিলে বাদশাহ তাঁহার দাম্পত্য-প্রেমের অপূর্ব নিদর্শন, মমতাজের সমাধির উপরে বিখ্যাত ইমারত 'তাজ-মহল' প্রস্তুত করেন।

সমাপ্ত